কাজ প্রেম দেশ

অর্জন করুন—নিজের কাজ সবচেয়ে ভালোভাবে করার সক্ষমতা

মহাজাতক

কাজ প্রেম দেশ

২০১৯ ও ২০২০ সালে সাপ্তাহিক সাদাকায়ন কার্যক্রমে গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতকের আলোচনার সংকলিত রূপ *কাজ প্রেম দেশ*। সংকলিত আলোচনাগুলোয় প্রতিফলিত হয়েছে গভীর দর্শন আর জীবনের নানান অন্তর্নিহিত সত্য। এই আলোচনাগুলো সমৃদ্ধ করবে পাঠকমননকে এবং উদ্বুদ্ধ করবে নিজের কাজ সবচেয়ে ভালোভাবে করতে—এটাই আমাদের বিশ্বাস।

মহাজাতকের লেখা অন্যান্য বই

- সাফল্যের চাবিকাঠি কোয়ান্টাম মেথড
- শুদ্ধাচার
- আত্মনির্মাণ
- জীবন বদলের চাবিকাঠি অটোসাজেশন
- আলোকিত জীবনের হাজার সূত্র কোয়ান্টাম কণিকা
- 1001 Autosuggestions to change your life

কাজ প্রেম দেশ

কাজ প্রেম দেশ

মহাজাতক

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
quantummethod.org.bd

কাজ প্রেম দেশ

মহাজাতক

প্রকাশক

মায়িশা তাবাসসুম । কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ২২২২২১৪৪১, ২২২২২৫৭৫৬, ০৯৬১৩-০০২০২৫

০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩, ০১৭১১-৬৭১৮৫৮

E-mail : info@quantummethod.org.bd

গ্রন্থস্বত্ব

লেখক

প্রথম প্রকাশ

জানুয়ারি ২০২৫

মুদ্রাকর

প্রজ্ঞাপ্রকাশ

ইসলাম ভবন (২য় তলা)

৬৮ ফকিরাপুল বাজার রোড, ঢাকা-১০০০

মূল্য

৪২৫ টাকা

ISBN : 978-984-36-0812-3

Kaj Prem Desh

(Love for Work, Love for Country)

By : **Mahajataq**

Published by

Quantum Foundation

quantummethod.org.bd

Price : $15

কৃতজ্ঞতা

করোনা অতিমারিকালে জীবন বাজি রেখে
দাফনসেবায় অংশগ্রহণকারী
কোয়ান্টাম স্বেচ্ছাসেবীদের।
তাদের অকুতোভয় সেবায় সম্ভব হয়েছে
করোনা শহিদদের
স্ব স্ব ধর্মীয় মর্যাদায়
মমতার পরশে শেষ বিদায়।

সূচিপত্র

নিজের কাজ সবচেয়ে ভালোভাবে করাই প্রকৃত দেশপ্রেম	১১
সুস্থতার জন্যে মানুষের কল্যাণে কাজ করুন	১৯
প্রার্থনায় জীবন হয় গতিময়	২৯
নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নিজেই নিন	৩৫
সঙ্ঘবদ্ধ দানে জীবন হবে বরকতময়	৪৩
সংকট উত্তরণে মেডিটেশন	৫৩
ভালবাসুন আপনার পরিবারকে	৬১
সুবচনের চর্চা বাড়াবে আপনার কথার প্রভাব	৬৭
নিয়মিত দান রক্ষা করবে ৭০টি অকল্যাণ থেকে	৭৩
কোয়ারেন্টিন ॥ নতুন উপলব্ধির পথ	৮০
ভয়-আতঙ্ক উবে যায় বিশ্লেষণের আলোয়	৮৬
মনুষ্যত্বের মৃত্যু বেশি বেদনাদায়ক	৯১
অটোফেজি ॥ রোজা ॥ কোরআনে শেফা	৯৮
সমমর্মিতায় সিক্ত হোন এ রমজানে	১০৩
কোরআন ॥ রহমত ও শেফা	১১১
নব্য জাহেলিয়াত থেকে উত্তরণের উপায়	১১৮
রমজানে দান ॥ অফুরন্ত কল্যাণ	১২৫
ঋণের অভিশাপ থেকে মুক্ত হোন	১৩৬
মৃত্যু ॥ জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি	১৪৪
রোগ প্রতিরোধে কী খাবেন, কী খাবেন না!	১৫৪
কখন খাবেন, কতটুকু খাবেন	১৬১
দান ও সেবায় আমরা অনন্য	১৬৮

বিত্তবানরা কেন দান করতে ভয় পায়? ১৭৫
বনের বাঘে খায় না, মনের বাঘে খায় ১৭৯
সামাজিক সংযোগায়ন জোগায় মানসিক শক্তি ১৮৫
সাফল্য ও কল্যাণের জন্যেই ব্যয় করব দিনের প্রতিটি মুহূর্ত ১৯২
শিশুরা করোনায় আক্রান্ত হলে যতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে
তার চেয়ে বেশি ক্ষতি হবে স্কুলে না গেলে ১৯৯
নিজের প্রতি ধারাবাহিক যত্নই নিজেকে ভালবাসা ২০৬
সামাজিক শুদ্ধাচার এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ২১৫
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ॥ আমাদের টিকিয়ে রাখে জীবাণুর সাথে যুদ্ধে ২২০
বিশ্বাসে প্রবল হলেই ব্রেন ভালোভাবে কাজ করে ২২৬
প্রবৃদ্ধি বাড়ছে, স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দিন ॥ বঙ্গাসনের অভ্যাস গড়ুন ২৩১
অপচয় করে নিঃস্ব ২৩৭
বিজয় আমাদের মনছবিরই ফসল ২৪৭
বড় ত্যাগ দেয় বড় আনন্দ ২৫৩
সার্থক তাদের জীবন যারা দানশীল ২৬২

কাজ প্রেম দেশ

আমরা সবাই কিছু না কিছু করি। কখনো আনন্দ নিয়ে। কখনো বিরক্তি নিয়ে। কখনো ভালবেসে। কখনো বাধ্য হয়ে।

বিরক্তি নিয়ে বা বাধ্য হয়ে যা করা হয় তা কখনো কাজ হিসেবে কারো নজর কাড়ে না। নজর কাড়ে সে কাজটাই যা করা হয় ভালবেসে, আনন্দ নিয়ে। কাজের প্রতি প্রেম ও ভালবাসা ব্যক্তিকে অমর করে। সমাজকে নন্দিত করে। দেশকে সমৃদ্ধ করে।

নিজেকে নিয়ে, পরিবারকে নিয়ে, দেশকে নিয়ে বড় ভাবনা ও কল্যাণ ভাবনাই প্রেমের সূতিকাগার। হৃদয়ে প্রেম থাকলে মনোযোগায়ন ও ফোকাস করার সামর্থ্য বাড়ে। সৃষ্টি হয় নিজের কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করার সক্ষমতা। সৃষ্টি হয় নিজের সবটুকু সবার কল্যাণে ব্যয় করার আকুতি এবং যে-কোনো বিপদে সঙ্কটে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অদম্য সাহস।

কোয়ান্টাম মেথড গত ৩২ বছর ধরে এই মোটিভেশনের কাজটিই করে আসছে মেডিটেশন কোর্সের মধ্য দিয়ে। মানুষকে শুধু সুস্থ জীবনদৃষ্টি ও সায়েন্টিফিক লাইফস্টাইলের কথা বলে এবং সহজে মেডিটেশন করার শিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি কোয়ান্টাম, মেডিটেশন চর্চাকারীদের সঙ্ঘবদ্ধ করে গড়ে তুলেছে দেশের নেতৃস্থানীয় স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম। গড়ে তুলেছে অনগ্রসর জনপদে বিশ্বমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। মাতৃমঙ্গল, স্বাস্থ্যসেবা-সহ সেবার যে-কোনো প্রয়োজনে থেকেছে দুর্গত মানুষের পাশে।

কোয়ান্টামের সব কাজ গতিশীল করে তুলেছে একঘণ্টার আলোচনা ও যৌথ মেডিটেশনের নিয়মিত মিলনমেলা সাপ্তাহিক *সাদাকায়ন কার্যক্রম*। প্রতি শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে ১০টা—যেখানে মিলিত হন সমাজের সকল স্তরের মানুষ—পেশা ধর্ম বয়স নির্বিশেষে। ১৯৯৫ সালে শুরুটা সাদামাটা হলেও দেশবিদেশের দুই শতাধিক ভেন্যুতে এখন অনুষ্ঠিত হচ্ছে সাদাকায়ন।

কাজ প্রেম দেশ প্রধানত ২০২০ সালে করোনা সংকটকালে নিয়মিত সাদাকায়নের আলোচনাগুলোর সংকলিত রূপ।

সংকলিত আলোচনাগুলোয় প্রতিফলিত হয়েছে গভীর দর্শন আর জীবনের অনেক অন্তর্নিহিত সত্য। এই আলোচনাগুলো সমৃদ্ধ করবে পাঠকমননকে এবং উদ্বুদ্ধ করবে নিজের কাজ সবচেয়ে ভালোভাবে করতে—এটাই আমাদের বিশ্বাস। আর আমরা জানি, নিজের কাজ সবচেয়ে ভালোভাবে করাই প্রকৃত দেশপ্রেম।

নিজের কাজ সবচেয়ে ভালোভাবে করাই প্রকৃত দেশপ্রেম

আসসালামু আলাইকুম।
আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক!

অনেক সময় যেটা সুন্দর, ভালো, প্রয়োজন, সেটা পুরো আন্তরিকতা নিয়ে চাইতে হয়। নিজের অন্তরে চাওয়াটাকে জাগ্রত করতে হয়। যখন চাওয়া অন্তরে জাগ্রত হবে, তখন পাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। সে পাওয়াটাকে আপনি সুন্দরভাবে ঘরে তুলতে পারবেন। অর্থাৎ যে-কাজ আপনি করতে চাচ্ছেন, সে কাজটা সবচেয়ে সুন্দরভাবে করতে পারবেন, যদি আপনার মধ্যে আন্তরিকতার সৃষ্টি হয়।

অধিকাংশ মাকে কিন্তু বলে দিতে হয় না—সন্তানকে এভাবে লালন করতে হবে। মায়েরা প্রসববেদনা সহ্য করেন বলেই সন্তানের প্রতি তার টানটা সবচেয়ে বেশি থাকে। মায়েদের জন্যে প্রসববেদনা অনুভব করা ভালো। তবে আমাদের দেশের অধিকাংশ মা সন্তানকে শুধু ভালোই বাসেন না; বরং সন্তানের প্রতি আসক্ত। মায়েদের আসক্তির একটা বড় উপকরণ হচ্ছে তার সন্তান। কারণ অনেক বেদনা, অনেক কষ্টের পরে যা পাওয়া যায় সেটা সহজে কেউ হারাতে চায় না।

এক তরুণী, প্রথমবার মা হবেন। যিনি বুদ্ধিমান স্বামী—এসময় স্ত্রীকে তার মায়ের সাথে থাকার ব্যবস্থা করে দেন, যদি সুযোগ থাকে। কারণ মায়ের সাথে একজন যত ক্লোজ, কিছু কিছু বিষয়ে অন্য কারো সাথে ওই ঘনিষ্ঠতা থাকে না। প্রয়োজনের কথা সে অন্য কাউকে সেভাবে বলতেও পারে না।

সন্তানসম্ভবা সেই তরুণী থাকছে মায়ের সাথে। রাতে সে ঘুমোতে যাবে। যে-কোনো সময় তার প্রসববেদনা উঠতে পারে। মাকে বলছে—মা, আমার তো ঘুম পাচ্ছে। যদি ব্যথা ওঠে, তাহলে আমাকে জাগিয়ে দিও।

মা হেসে বলছেন, মা! তোমার চিৎকারেই যে কতজন জেগে যাবে! আমার তোমাকে জাগিয়ে দিতে হবে না। এই প্রসববেদনা আছে বলেই অধিকাংশ মাকে বলে দিতে হয় না, শিখিয়ে দিতে হয় না—সন্তানকে কীভাবে লালন করতে হবে।

আবার এখনকার সময়ে এই ভার্চুয়াল যুগে দেখা গেছে যে, এক গর্ভবতী মা, গেম খেলছে। গেম নিয়ে সে এত ব্যস্ত! সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। কোথায়? কমোডে! সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে কমোডে পড়ে গেছে। মা গেম নিয়ে ব্যস্ত!

যদিও এটা ব্যতিক্রম এবং ব্যতিক্রম কখনো উদাহরণ হয় না। ব্যতিক্রম সবসময় ব্যতিক্রমই।

অনেকদিন আগের গল্প।

এক মা। তার একটাই সন্তান—ছেলে। ছেলেকে তিনি খুব ভালবাসেন। ছেলে বড় হয়েছে। বিয়েও করেছে। ছেলের বিয়ের কিছুদিন পর তার বাবা মারা গেলেন।

একা মা, ছেলে এবং ছেলের বউ। এখন ছেলের বউয়ের সাথে যে-কোনোভাবে হোক, মায়ের বনিবনা হচ্ছে না। ছেলে স্বাভাবিকভাবেই নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট বউয়ের পক্ষে। ফাইভ পার্সেন্ট মায়ের পক্ষে। তার কাছে মনে হলো যে, আমার মা তো এখন বুড়ো হয়ে গেছে!

মানুষ বৃদ্ধ হলে তার কিছু কিছু আচরণ ঠিক যুক্তির মধ্যে পড়ে না। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এটা সহ্য করতে পারে না। ছেলে হোক, মেয়ে হোক। তার মনে হয়—মা এরকম করবে কেন?

সে-তো আসলে ইচ্ছে করে এরকম করছে না! তার যে মেন্টাল কন্ডিশন—আলঝেইমার অথবা সেনিলিটির কারণে এমনটা করে ফেলতে পারে। যখন ব্রেন আর ঠিকভাবে কাজ করে না। অর্থাৎ এই সময়টাকে 'সেকেন্ড চাইল্ডহুড' বলা যেতে পারে।

শিশুদের আচরণ যে-রকম যুক্তির বাইরে চলে যায়, সেকেন্ড চাইল্ডহুডে বয়োবৃদ্ধ মা-বাবার আচরণ—মা হোক, শাশুড়ি হোক, বোন হোক, এমনকি স্ত্রী—তার আচরণও অনেক সময় যুক্তির বাইরে চলে যায়। তখন যুক্তি খোঁজা

এবং যুক্তি দিয়ে তার আচরণকে বিচার করা পুরোপুরি বোকামি। যারাই এটা করতে যান, তারা ভুল করেন।

আমরা যেন কোথায় ছিলাম? হাঁ, মা ...।

বৃদ্ধা মায়ের ব্যবহারে কিছু অযৌক্তিকতা তো আছেই। ছেলের বউ কোনোভাবেই তাকে সহ্য করতে পারছে না। ছেলের বউ এবং ছেলে মিলে শেষ পর্যন্ত ঠিক করল যে, মাকে এই বাড়িতে আর রাখা যাবে না। এই বাড়িতে রাখলে শান্তি থাকবে না। তাই মাকে নির্বাসনে দিয়ে আসবে। গভীর জঙ্গলে ফেলে আসবে। ওখানে বাঘ বা কোনো বন্য জন্তু তাকে খেয়ে ফেলবে। তাদের আর কোনো ঝামেলা হবে না।

যেদিন মাকে নির্বাসনে দিয়ে আসবে, সেদিন ছেলে ও ছেলের বউ খুব ভালো করে খাওয়াচ্ছে মাকে। মায়ের সাথে খুব ভালো আচরণ করছে। বলছে, মা, তুমি বেড়াতে যাবে। অনেক দূরের পথ তো!

মা-তো খুব খুশি। সে বেড়াতে যাবে!

তখনকার দিনে ব্যাগের তেমন একটা চল ছিল না। মানুষ প্রয়োজনীয় কাপড়চোপড় সাধারণত পুরনো শাড়ি বা চাদর দিয়ে পোঁটলা বা গাঁট্টি বাঁধত। তারাও মাকে খাওয়াদাওয়া করিয়ে, সুন্দর পোশাক পরিয়ে প্রয়োজনীয় কাপড়চোপড় ও ব্যবহার্য জিনিসপত্র গাঁট্টি বেঁধে নিয়ে চলল।

ছেলে যখন মাকে জঙ্গলের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তখন মা ছেলের মতলব একটু একটু আন্দাজ করতে পেরেছেন। এমনিতেই তিনি খুব একটা হাঁটতেও পারেন না। কষ্ট করে হাঁটছেন। মা জঙ্গলের পথে পড়ে থাকা কিছু ছোট ছোট চিকন ডাল কুড়িয়ে নিচ্ছেন। কিছু নিজে টুকরো করে ভাঙছেন। কিছু আবার ছেলেকে দিচ্ছেন ভাঙতে। ছেলে চরম বিরক্ত; যে, কুড়িয়ে নেয়া ডাল টুকরো করে ভেঙে কী হবে? এগুলো আবার আমাকেই বয়ে নিয়ে যেতে হবে! তারপরও ... আপদ তো বিদায় হচ্ছে! আর কত জ্বালাবে!

অনেকগুলো টুকরো ডাল হাতে নিয়েছেন মা। কিছুক্ষণ পর পর জঙ্গলের পথে একটা করে টুকরো ডাল ফেলছেন। ফুরিয়ে গেলে আবার চেয়ে নিচ্ছেন ছেলের কাছ থেকে। ছেলেও একটা করে টুকরো ডাল দিচ্ছে মাকে। কিছুদূর পর পর উনি সেটা পথে ফেলে দিচ্ছেন। ছেলে আরো বিরক্ত! মা আমাকে দিয়ে ডাল ভাঙাল, আবার সেগুলো একটু পর পর রাস্তায় ফেলে দিচ্ছে!

মাকে নিয়ে ছেলে এভাবে অনেক দূর গেছে। গভীর জঙ্গল। তারা যখন জঙ্গলের খুব গভীরে চলে গেছে তখন ছেলে মাকে বলছে, মা, তুমি বিশ্রাম

নাও। অনেক দূর এসেছ। আমি একটু আসছি। কিছুক্ষণ পরে এসে আবার তোমাকে নিয়ে রওনা দেবো।

মা হাসলেন। বললেন—ঠিক আছে। আসবি তো বাবা?

এই আসছি! তুমি এখানে একটু বিশ্রাম নাও।

ছেলে পেছন ফিরে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। কারণ ফেরার রাস্তা তার খেয়াল নেই! জঙ্গলে ঢোকার সময় তো তালে তালে ঢুকে পড়েছে। এখন বেরিয়ে যাবে কোন পথে!

যে-রকম একবার লামাতেই আমাদের হয়েছিল। এটা ২০০০ সালের ঘটনা। এখনকার কোয়ান্টামমের রাস্তাঘাট দেখে তখনকার অবস্থা আপনারা কেউ কল্পনা করতে পারবেন না। কোয়ান্টামম সংলগ্ন যত রাস্তা—এখন যে আমরা ঢেঁকিছড়া যাই, নয়াপাড়া যাই, এগুলো সব গভীর জঙ্গল, বাঁশঝাড় এবং সেখানে থাকত বন্য কুকুর। এদের বলা হয় রাম কুকুর। রাম কুকুর হচ্ছে হায়েনা বা নেকড়ের মতো হিংস্র। এরা মানুষ খুব পছন্দ করে। কাউকে একা পেলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এরা ভাগ-বাঁটোয়ারা করে ফেলে!

আমরা জঙ্গলের ভেতরে ঢুকেছি। ফিরে আসব। আমাদের মধ্যে একজন বলল, তাকে দ্রুত ফিরে যেতে হবে। তাই সে আমাদের ফেরতযাত্রার ঘণ্টাখানেক আগেই দলছুট হয়ে গেল। আর আমরা ছিলাম স্থানীয় এক মুরং-এর সাথে, যে রাস্তা চিনত। আমি দেখলাম—যে পথ আমি চিনি না, সে পথে গাইডকে অনুসরণের সুযোগ থাকলে একা চলার ঝুঁকি নেয়া বোকামি।

ঘণ্টাখানেক পরে মুরং অধ্যুষিত নয়াপাড়া থেকে আমরা বেরিয়ে আসছি। আমরা গভীর জঙ্গলের পথ ধরে আসছি। একটা জায়গায় পায়ে চলার পথই তিনটে-চারটে হয়ে গেছে। ওখানে এসে যে-কেউ কনফিউজড হয়ে যাবে। অনেক সময় দেখা যায় দুই পাহাড়ের মাঝে গভীর খাদ। দৃশ্যমানভাবে এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড় কাছে মনে হলেও ওই পাহাড়ে পৌঁছতে গেলে দেখা যাবে দুই-তিন ঘণ্টা লাগছে। কারণ ঘুরে যেতে হবে। ইচ্ছে করলেই যে চলে যাবেন, ব্যাপারটা সে-রকম নয়।

তাই আমি সবসময় গাইড-নির্ভর। যখন একবার নির্ভর করি, যাত্রাপথ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি গাইড-ছাড়া হই না। কারণ গাইড যদি ভুল করে, তবুও সে ভুলের ব্যাখ্যা দিতে পারবে; যে, এই কারণে ভুল হয়েছে। আবার ভুল শুধরেও নিতে পারবে। আর একজন আনাড়ি যদি ভুল করে ফেলে,

তাহলে সে ভুলের ব্যাখ্যা দিতে পারবে না। যেমন : একজন ডাক্তারের অপারেশন ব্যর্থ হলেও তিনি বলে দিতে পারবেন যে, এই এই কারণে অপারেশন ব্যর্থ হয়েছে। একজন হাতুড়ের অপারেশন সাকসেসফুল হলেও তিনি হয়তো বলতে পারবেন না যে, কেন এটা সাকসেসফুল হলো।

আমি যখন অ্যাস্ট্রলজার ছিলাম, তখন এক ভদ্রলোক দেখা করতে এলেন। বললেন, অমুকের কাছে তিনি দেখিয়ে এসেছেন। আমি বললাম, সে তো অ্যাস্ট্রলজির তেমন কিছু জানে না।

তিনি বললেন, তার তো অনেক নামধাম আছে।

আমি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, নামধাম হলেই একজন কোনো বিষয়ে খুব ভালো জানবেন, এমন কোনো কথা নেই। তিনি খুব সুন্দরভাবে বলতে পারেন, এটা ঠিক আছে। তার প্রেডিকশন সঠিকও হতে পারে কিন্তু প্রেডিকশন কেন সঠিক হলো, এটা তিনি ব্যাখ্যা করতে পারেন না। এই জন্যে তিনি অ্যাস্ট্রলজার না।

আর ইনশাআল্লাহ—আমার কোনো প্রেডিকশন ঠিক হলে আমি বলে দিতে পারব যে, কেন ঠিক হয়েছে। ভুল হলেও আমি বলে দিতে পারব যে, এই কারণে ভুল হয়েছে। আমার কাছে এর ব্যাখ্যা আছে।

তো কীসের মধ্যে কী ঢুকে গেল? আচ্ছা, গাইড ...।

১৮ বছর আগে, তখন আমার ঘন ঘন ওয়াশরুমে যাওয়ার প্রয়োজন খুব একটা হতো না। আমি সকালবেলা প্রোগ্রাম শুরু করলে যদি সে-রকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো, তাহলে একেবারে রাতে প্রোগ্রাম শেষ করে ওয়াশরুমে যেতাম। কিন্তু আমি ওখান থেকে বেরোনোর পরে মোড়ের কাছে যখন এসেছি, তখন সাংঘাতিক রকম ... ওয়াশরুমে যেতেই হবে। জঙ্গলে তো কোনো অসুবিধা নেই। সেখানকার ওয়াশরুম পুরোপুরি 'পরিবেশবান্ধব'। একদম প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে একাকার!

আমি অন্যদেরকে বললাম, আপনারা একটু এগিয়ে যান, আমি আসছি। আমি আবার ভালোভাবে দেখে নিলাম—পায়ে চলার পথ কোনটা কোনদিক দিয়ে যাচ্ছে। বললাম, আবার যদি দোমাথা-তেমাথা হয়, তাহলে ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন।

যখন জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছি, দেখি আমাদের চেয়ে ঘণ্টাখানেক আগে রওনা দিয়েছিল যে, সে হাঁপাতে হাঁপাতে আসছে। এসে

আমাকে বলল, গুরুজী, আমি তো মারাই যেতাম। আমাকে রাম কুকুরে খেয়েই ফেলত আজকে। গ্রুপ দেখলে রাম কুকুর কখনো এগোয় না। কিন্তু যদি কাউকে একা পায় ... ইটস আ ম্যাটার অব মিনিটস। মানুষের মাংস ওরা খুব পছন্দ করে। পায় না বলে খায় না!

আমি বললাম, এই দেখেন, আপনি তো মহা ভুল করছিলেন। সে বলল, আর জীবনে এরকম করব না। যেটা হয় সাধারণত, ভুল করার পরে আমরা অনুশোচনা করি, তওবা করি। বললাম, তওবা করুন। আল্লাহর রহমত আপনার ওপরে আছে বলে রাম কুকুরের হাত থেকে এ-যাত্রায় বেঁচে গেলেন!

গাইডকে ছেড়ে দলছুট হতে হয় না অচিন পথে। অচেনা-অজানা পথে চলতে হলে গাইডকে অনুসরণ করা জরুরি।

তো আমরা যেন কোথায় ছিলাম? হাঁ, মা ছেলে ...।

ছেলে যখন এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে, তখন মা তাকে পথ দেখিয়ে বলছে, বাছা, এদিক দিয়ে যা। পথের যেদিকে টুকরো করে ফেলে রাখা ডাল দেখবি, সেটাই হচ্ছে বাড়ির পথ। টুকরো টুকরো ডাল দেখে দেখে যাস, তাহলে তুই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যেতে পারবি।

কী বুঝলেন?

ছেলে রওনা দিলো। রওনা দেয়ার পরে পথে পড়ে থাকা একটা-দুটো ডাল দেখছে ... আবার চিন্তা করছে, এই ডালগুলো যদি থেকে যায়, তাহলে মা-ও তো আবার ফিরে আসতে পারে। তাই একটা একটা করে টুকরো ডাল সে তুলে নিচ্ছে, যাতে পথে ডালের কোনো চিহ্ন না থাকে।

কয়েকটা ডাল তুলে নেয়ার পরে হঠাৎ তার মনে হলো যে, মা-তো সবই টের পেয়েছিল। আমি যেন ঠিক পথে বাড়ি ফিরে যেতে পারি, সেজন্যে মা পথে পথে টুকরো ডাল ছড়িয়ে এসেছে। আর এই মাকে জঙ্গলে ফেলে রেখে আমি একা বাড়ি চলে যাচ্ছি? নাহ, আমি মাকে নিয়েই বাড়ি যাব।

ছেলে আবার জঙ্গলে ফিরে এলো, যেখানে মাকে বসিয়ে রেখে গিয়েছিল, সেখানে। দুজনেই খুব আবেগপ্রবণ। ছেলে মাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলো।

একজন মা ... সন্তানের প্রতি তার যে মমতা ... সন্তানকে বাঁচানোর জন্যে তিনি কিন্তু তার সবটুকু দিয়েছিলেন। মা তার কাজ সবচেয়ে ভালোভাবে করেছিলেন বলেই তার সন্তানকে বিপদ থেকে বাঁচাতে পেরেছিলেন। মা নিজেও কিন্তু বেঁচে গেলেন। না, মারা গেলেন? মা-ও বেঁচে গেলেন।

তাই মাকে ভালবাসুন, পরিবারকে ভালবাসুন, দেশকে ভালবাসুন। যা কিছুই ভালবাসবেন, নিজের কাজ সবচেয়ে সুন্দরভাবে করাই হচ্ছে আসল ভালবাসা। সে মা হোক, প্রতিষ্ঠান হোক, দেশ হোক। এটাই হচ্ছে মাতৃপ্রেম সন্তানপ্রেম সঙ্ঘপ্রেম এবং দেশপ্রেম।

আমরা যেন নিজের কাজ বলতে শুধু অফিসের কাজটুকুতেই সীমাবদ্ধ না থাকি। নিজের কাজকে আমরা শুধু যেন পেশাগত কাজ মনে না করি। অবশ্যই পেশাগত কাজ সবচেয়ে সুন্দরভাবে করবেন। সেইসাথে পরিবারের কাজও সুন্দরভাবে করবেন। সঙ্ঘের কাজ, মানুষের উপকার এবং সেবার কাজ সবচেয়ে সুন্দরভাবে করবেন। একজনকে যখন কাউন্সেলিং করবেন, পরামর্শ দেবেন, সুন্দরভাবে দেবেন।

কাজের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকলে, কাজের প্রতি ভালবাসা থাকলে, প্রেম থাকলেই একজন মানুষ সবচেয়ে সুন্দরভাবে কাজ করতে পারে। আর সবচেয়ে সুন্দরভাবে যখন আপনি কাজ করবেন—পরিবার ভালো হবে, সমাজ ভালো হবে, দেশ ভালো হবে।

ব্যক্তিগত কাজগুলোও সুন্দরভাবে করবেন। নিজ দেহের যত্নায়নের কাজ—যখন দাঁত ব্রাশ করবেন, গোসল করবেন, সুন্দরভাবে করবেন। সন্তানের যত্ন নেবেন, সুন্দরভাবে নেবেন। মায়ের যত্ন নেবেন, বাবার যত্ন নেবেন, সুন্দরভাবে নেবেন।

আল্লাহকে ডাকবেন, ঈশ্বর বা ভগবানকে ডাকবেন, ইবাদত-বন্দেগি, পূজা-অর্চনা করবেন, সুন্দরভাবে করবেন। প্রার্থনা উপাসনা আরাধনা করবেন, সবচেয়ে সুন্দরভাবে করবেন। ওজু করবেন, নামাজ পড়বেন, সবচেয়ে সুন্দরভাবে পড়বেন।

যত ধরনের কাজ আপনি করেন, ছোট-বড়, ঘরের কাজ বা বাইরের কাজ, পড়াশোনা, জীবিকা বা পেশাগত কাজ, চাকরি, ব্যবসা, অর্থনৈতিকভাবে অলাভজনক অথবা লাভজনক—প্রতিটি কাজ সুন্দরভাবে করবেন। তাহলেই আপনি যে সত্যিই দেশকে ভালবাসেন, সেটা প্রস্ফুটিত হবে। তাহলেই মানুষকে যে আপনি ভালবাসেন, সেটা প্রমাণিত হবে।

সেই মা যেভাবে করেছেন—তার নিজের সন্তান তাকে বাসায় রাখবে না, জঙ্গলে ফেলে আসবে জানার পরও কী করেছেন? ছেলে যাতে জায়গামতো ফিরে যেতে পারে, মা হিসেবে এটা নিশ্চিত করা তার কর্তব্য ছিল। তিনি মনে করেছেন যে, এটা আমার কর্তব্য। শি হ্যাজ ডান ইট ওয়েল। ছেলে বোঝেও

নি যে, মা-ই তাকে দিয়ে তার ফিরে আসার পথটা চিহ্নিত করে দিচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে তিনি ছেলেকে শুধু মহাপাপ থেকে বাঁচান নি, প্রাণেও বাঁচিয়েছেন। মা নিজেও আবার নতুন জীবনের স্বাদ পেয়েছেন।

মা-ছেলের বাড়ি ফিরে আসার পরে উপসংহারটা বলেই দেই ...

বাড়ি ফিরে আসার পরে ছেলে তার স্ত্রীকে বলল, আমাকে যদি তুমি ভালবাসো, তাহলে আমার মাকেও ভালবাসতে হবে। আমার মা আচরণে যা-কিছুই করুক, তোমার মা হলে তুমি যে-রকম তাকে ফেলে আসতে পারতে না, আমিও ভুলবশত একবার ফেলে আসার চেষ্টা করেছি কিন্তু দ্বিতীয় বার আমি আর সে ভুল করতে পারব না। কারণ এই মায়ের জন্যেই আমি আবার তোমার কাছে বেঁচে ফিরে আসতে পেরেছি। তা না হলে জঙ্গলে আমি একা হয়ে যেতাম, পথ হারিয়ে ফেলতাম এবং রাম কুকুরের খাবার হয়ে যেতাম। তুমিও আমাকে হারাতে, বিধবা হয়ে যেতে।

আমার মনে হয়—আপনাদের কাছে বিষয়টা আমি পরিষ্কার করতে পেরেছি এবং বিষয়টা আমাদের সবার কাছে সুস্পষ্ট হয়েছে। নিজের কাজ সবচেয়ে সুন্দরভাবে করাই প্রকৃত দেশপ্রেম। এটাই নবী-রসুলদের শিক্ষা। এটাই মহামানবদের শিক্ষা।

সাদাকায়ন : ২২ মার্চ ২০১৯; কোয়ান্টামম

সুস্থতার জন্যে
মানুষের কল্যাণে কাজ করুন

নারীর সম্মান, নারীর মানমর্যাদা রক্ষা করা, নারীর যত্ন নেয়ার দায়িত্ব পবিত্র কোরআন শরীফে আল্লাহ তায়ালা পুরুষদের দিয়ে দিয়েছেন। অতএব আপনারা খুব ভালো কাজ করেছেন, সুন্দর কাজ করেছেন যে, মহিলাদের ছায়ায় বসার সুযোগ দিয়ে নিজেরা রোদে বসেছেন। কারণ পরিবারে সবসময়ই কষ্টকর কাজগুলো নারীকে করতে হয়। তাই যেখানেই সুযোগ আসবে—কষ্ট পুরুষ করবে, যেন নারী আনন্দ করতে পারে। এটাই হচ্ছে পুরুষোচিত গুণ। এজন্যে আমরা ছেলেদেরকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

[সেদিন কোয়ান্টামমের মারহামান হলে সাদাকায়ন অনুষ্ঠিত হয়। সেই উন্মুক্ত হলে নারীদের বসার দিকটিতে রোদ এসে পড়ছিল। রোদের তাপ ছিল প্রচণ্ড। কিন্তু পুরুষদের বসার দিকটিতে তখন রোদ পড়ছিল না। সেসময় পুরুষরা তাদের আসন নারীদের জন্যে ছেড়ে দিয়ে নিজেরা রোদে গিয়ে বসেন।]

(কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে) তোমাদের বয়সে আমি কোনোদিন ছাতা ব্যবহার করি নি। আমি প্রথম ছাতা ব্যবহার করেছি ৩২ বছর বয়সে। তোমাদের এখন যে বয়স, এই বয়সটা হচ্ছে রোদে পুড়ে আর পানিতে ভিজে শক্তপোক্ত হওয়ার বয়স। তোমাদের দেখলে আমারও জোশ বেড়ে যায়। মনে হয়, আমার বয়সও তোমাদের বয়সের কাছাকাছি।

ইয়ং লেডি এবং ইয়ং ম্যানদের দেখলে আমার খুব ভালো লাগে। তারা খুব সাহসী এবং তাদের মেমোরি খুব শার্প। এই রোদে তারা সবাই ঘামছে। যত ঘাম তত আরাম। অবশ্য আমিও যে কম ঘামছি, তা নয়। আপনাদের যে উত্তাপ, সে উত্তাপ আমাকে ঘামাচ্ছে। আপনারা ঘামছেন রোদে আর আমি

ঘামছি জোশে। কোয়ান্টাদের এই বয়সে যে সাহস, এই সাহস যিনি ধরে রাখতে পারবেন, তিনি জীবনে সফল হবেন।

আমরা যখন প্রথমদিকে বিভিন্ন প্রোগ্রাম করতাম, হলের ধারণক্ষমতার চেয়ে সাধারণত অংশগ্রহণকারী বেশি হতো। হলে জায়গা হতো না বলে চেয়ারের পাশে যে করিডোর, সেখানেও অনেককে বসতে হতো। অনেক সময় মঞ্চেও তাদেরকে বসাতে হয়েছে। বিশেষত তোমাদের মতো কিশোর এবং তরুণ যারা, তারাই মুরব্বিদের নিজেদের সিট ছেড়ে দিয়ে নিচে বসত।

আলহামদুলিল্লাহ! আজ সেই সময়ের তরুণদের কেউ প্রফেসর, কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ চাকরিজীবী, কেউ ব্যবসায়ী। তাদের অনেকেই এই প্রোগ্রামে উপস্থিত। এই তো, আমার চোখের সামনে ...।

যখন একজন মানুষ অন্যের জন্যে নিজের আরামটা ছেড়ে দেয়, অন্যকে আরাম করতে দিয়ে নিজে কষ্টের কাজটা বেছে নেয়, কষ্টের বিষয়টা বেছে নেয়, তখন সে প্রকৃতির প্রতিদানে সিক্ত হয়।

আল্লাহ তায়ালা তো সবকিছুর ক্ষেত্রে একটা প্রাকৃতিক নিয়ম করে দিয়েছেন। আল্লাহ যে নিয়ম করে দিয়েছেন, সেই নিয়মের মধ্য দিয়ে কাজ হয়; আবার নষ্টও হয় সেই নিয়মের মধ্য দিয়ে। যাকে আমরা বলি 'প্রকৃতির প্রতিদান' বা Laws of natural return।

আজকের আলোচনার বিষয় : *সুস্থতার জন্যে মানুষের কল্যাণে কাজ করুন*। মানুষের কল্যাণে কাজ করলে নিজে সুস্থ থাকা যায়। সুস্থ থাকাটা কী? আমরা কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে কী বলি? সুস্থ জীবন বলতে বোঝায় টোটাল ফিটনেস। শারীরিক মানসিক সামাজিক ও আত্মিকভাবে ভালো থাকা।

আমরা কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে মেডিটেশনে 'কমান্ড সেন্টার' কেন নির্মাণ করেছি? কমান্ড সেন্টার আমরা করেছি অন্যের কল্যাণের জন্যে। অন্যের কল্যাণ করা কেন এত জরুরি? অন্যের কল্যাণ যত করবেন, তত আপনার কল্যাণ হবে। অন্যের যত ক্ষতি করবেন, আপনার তত ক্ষতি হবে।

আমেরিকার আত্ম উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ ডেনিস ওয়েটলি তার জীবনের একটি চমৎকার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি ১৯৭৯ সালের।

ডেনিস ওয়েটলি শিকাগো থেকে লস অ্যাঞ্জেলসে যাবেন। সেখানে তার বক্তৃতা দেয়ার কথা। ব্যস্ততাকে সামাল দিয়ে শিকাগোর ওহারা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছতে তার দেরি হয়ে গেল।

দৌড়ে টার্মিনালের কাছে গিয়ে দেখেন—গেট বন্ধ হয়ে গেছে। বিমানে ওঠার সিঁড়ি সরিয়ে ফেলা হচ্ছে। গেটকিপার মহিলাকে তিনি বিমানটি থামানোর জন্যে অনুনয়, অনুরোধ, তর্কবিতর্ক সবই করলেন। কোনো লাভ হলো না। চোখের সামনে বিমানটিকে রানওয়ে দিয়ে চলে যেতে দেখলেন।

রাগে ক্ষোভে ঝড়ের বেগে তিনি ফিরে এলেন টিকেট কাউন্টারে, আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানাবেন বলে।

তিনি লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন। এসময় বিকট বিস্ফোরণের শব্দ হলো। লাইনে দাঁড়ানো অবস্থায়ই তিনি জানতে পারলেন—যে বিমানে তার যাওয়ার কথা ছিল, তা আকাশে ওড়ার সাথে সাথে বিধ্বস্ত হয়েছে। বিমানের একটি ইঞ্জিন ভেঙে রানওয়েতে পড়ে যায়। হাইড্রলিক লাইন ও কন্ট্রোল কেবল ছিঁড়ে যায়। পাইলট বিমানটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়। বিমানের আরোহী ও ক্রু সবাই নিহত হয়।

ডেনিস ওয়েটলি এই ঘটনার সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কে লিখেছেন, 'আমি টিকেট লাইন ত্যাগ করে এয়ারপোর্ট হোটেলে একটা রুমে উঠলাম। বিছানার পাশে কার্পেটের ওপর নতজানু হয়ে সেজদা করলাম। স্রষ্টার কাছে শুকরিয়া আদায় করে প্রার্থনা করলাম।

একযুগ পার হয়ে গেছে। এখনো ফ্লাইট ১৯১-এর টিকেটটি আমার কাছে রয়েছে। আমি টাকা ফেরত নেয়ার জন্যে টিকেটটি ট্রাভেল এজেন্টের কাছে পাঠাই নি। সেটি আমার অফিস কক্ষে বুলেটিন বোর্ডে সেঁটে রেখেছি। টিকেটটি নীরবে আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়—প্রতিদিনই আমার জন্যে ক্রিসমাস। আমি বেঁচে আছি এটাই তো অনেক বড় ব্লেসিংস।'

ডেনিস ওয়েটলি সেই বিমানের ফ্লাইট ১৯১-এর একমাত্র যাত্রী, যিনি বিমানে উঠতে পারেন নি বলে বেঁচে গেছেন!

কেন?

কারণ যে-কাজ তিনি করতেন—আত্ম উন্নয়নের কাজ, মানুষের আত্মিক ও মানসিক উন্নয়নের কাজ, অন্যের কল্যাণের কাজ; ফলে প্রকৃতি তাকে প্রতিদান দিয়েছে, আল্লাহ তাকে প্রতিদান দিয়েছেন।

ডেনিস ওয়েটলি সেদিন যদি আর দুই মিনিট আগে পৌঁছতে পারতেন, তাহলে বিমানে উঠতেন এবং লাশ হয়ে যেতেন। জীবন তার কাছ থেকে হারিয়ে যেত। জীবন থেকে তিনি বঞ্চিত হতেন। আমরা যখন অন্যের কল্যাণ

করি, এই কল্যাণটা প্রকৃতিতে সবসময় জমা হতে থাকে। যখন আপনার প্রয়োজন তখন এমন মানুষ আপনাকে সহযোগিতা করবে, যাকে আপনি আগেও দেখেন নি, হয়তো পরেও কখনো দেখবেন না।

আরেকটি ঘটনা।

ঘটনাটা কাতারের। কাতার মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশ। সৌদি আরবের পাশে। কাতারের এক ধনাঢ্য পরিবারের মহিলা, ক্যান্সারে আক্রান্ত। ডাক্তার ফাইনাল ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন—যত চিকিৎসা করেন, হাতে সময় আছে বড়জোর ছয় মাস ...।

মহিলা ধনাঢ্য। গৃহকর্মী বেশ কয়েকজন। একজন গৃহকর্মী নতুন এসেছেন। তাকে খুব যত্ন করছেন। মাত্র কয়েকদিন হলো এসেছেন, কিন্তু এরই মধ্যে মহিলা প্রচণ্ড অস্থিরতায় ভুগছেন। কী যেন ... আবার কিছু বলছেনও না। কাজকর্ম খুব মনোযোগ দিয়ে করছেন।

অসুস্থ গৃহকর্ত্রী বুঝতে পারছেন যে, নতুন গৃহকর্মী সাংঘাতিক কোনো অস্থিরতা এবং কষ্টের মধ্যে রয়েছেন। দুই জন মহিলার কেউই কারোর ভাষা বোঝেন না। গৃহকর্ত্রী আরব, বাংলা বোঝেন না। আর গৃহকর্মী বাংলাদেশি, আরবি বোঝেন না। কিন্তু মমতার তো আর ভাষা লাগে না। যত্ন করতেও ভাষার প্রয়োজন নেই।

আরেকজন মহিলার মাধ্যমে গৃহকর্ত্রী জানতে পারলেন যে, এই বাংলাদেশি মহিলা দেড় মাসের দুধের বাচ্চাকে রেখে জীবিকার তাগিদে কাতার চলে এসেছেন। তার অস্থিরতা স্বাভাবিক। বাঙালি মা-তো।

যখন অসুস্থ আরব গৃহকর্ত্রী বাংলাদেশি মহিলাটির অস্থিরতার কারণ বুঝতে পারলেন, তখন তিনি তাকে ছুটি দিয়ে দিলেন দেড় বছরের বেতনসহ! বললেন, ঠিক আছে, তুমি যাও। তোমার বাচ্চাকে বড় করো। এই তোমার দেড় বছরের পুরো বেতন। তোমার চাকরি থাকবে। আর তুমি আমার জন্যে দোয়া করবে। বাচ্চা যখন একটু বড় হবে, তারপরে তুমি আসবে। দেড় বছর পর কাতারে ফিরে আসার বিমানের টিকেটও দিয়ে দিলেন—আবার যখন আসবে, তখন যাতে সহজেই সে আসতে পারে।

এরকমটা সাধারণত হয় না। এখনকার আরবরা সাধারণভাবে মানবিক আচরণ খুব কম করে। কিন্তু এই আরব মহিলা তাকে ছুটি দিয়ে দিলেন! গৃহকর্মী দেশে ফিরে এলেন।

আরব মহিলাটি ছিলেন অসুস্থ; বিছানা ছেড়ে উঠতে পারতেন না। ডাক্তার যাকে বলে দিয়েছিলেন—আয়ু মাত্র ছয় মাস! সেই তিনি ধীরে ধীরে বিছানা থেকে উঠতে শুরু করলেন। ছয় মাসের মাথায় হাঁটা, চলাফেরা ... একবছরের মাথায় ডাক্তাররা তাকে ক্যান্সারমুক্ত ঘোষণা করল।

দেড় বছর পর যখন এই মহিলা আবার কাতারে গেলেন, দেখলেন যে, বেগম সাহেবা দিব্যি সেজেগুজে সবকিছু করছেন। ডাক্তারও বিস্মিত তার রোগমুক্তিতে! বললেন, তার জানা মতে মেডিকেল সায়েন্সে এরকম কোনো উদাহরণ নেই। এটা সম্ভব নয়। কিন্তু কীভাবে হলো?

সুস্থ হয়ে ওঠা আরব মহিলা বললেন, কীভাবে হলো বুঝতে পারছি না। কিন্তু আমি একজন মাকে তার দুগ্ধপোষ্য বাচ্চার কাছে ফিরে যেতে দিয়েছিলাম—এটুকুই বুঝি। তিনি ঘটনা বিস্তারিত বললেন। হয়তো আল্লাহ এজন্যে আমাকে দয়া করেছেন। ডাক্তার বললেন, সম্ভবত এটাই কারণ। আল্লাহর বিশেষ দয়া ছাড়া, আল্লাহর করুণা ছাড়া এই কঠিন অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হতো না।

যখন আমরা মানুষের সেবা করি, যখন অন্যের কল্যাণ করি, অন্যের উপকার করি তখন আমরা আল্লাহর খেদমত করি। আল্লাহর সেবা করি।

রসুলুল্লাহ (স) বলেছেন—‘শেষবিচারের দিনে আল্লাহ অনুযোগ করবেন, আমি অসুস্থ ছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে যাও নি। বান্দা বলবে, প্রভু হে! তুমি কীভাবে অসুস্থ হও? তুমি তো রোগশোকের ঊর্ধ্বে! আল্লাহ বলবেন, অমুক অসুস্থ ছিল, তুমি তাকে দেখতে যাও নি। তার সেবা করো নি।

আল্লাহ বলবেন, আমি অভুক্ত ছিলাম, তুমি আমাকে খাবার দাও নি। তখন বান্দা বলবে, প্রভু হে! তুমি তো সমস্ত ক্ষুৎপিপাসার ঊর্ধ্বে। আমি তোমাকে কীভাবে খাওয়াব? তখন আল্লাহ বলবেন, অমুক অভুক্ত ছিল, কিন্তু তুমি তাকে খাবার দাও নি।

আল্লাহ বলবেন, আমি তৃষিত ছিলাম, তুমি পানি দাও নি। উত্তরে বান্দা একই কথা বলবে। তখন আল্লাহ বলবেন, অমুক তৃষিত ছিল, কিন্তু তুমি তাকে পানি দাও নি। ...’

আল্লাহ বলি, ভগবান বলি, ঈশ্বর বলি—তাকে আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু যখন আমরা তাঁর সৃষ্টির সেবা করি, আমরা প্রকৃতপক্ষে তাঁরই সেবা করি এবং প্রতিদানও তিনিই দেন।

ছোট্ট একটা ঘটনা বলি। 'নাইন ইলেভেন'-এর পরে ইউরোপে তো সাংঘাতিক অবস্থা। ইউরোপের প্রত্যেক শহরে দুটো করে জেট ফ্লাই করে—আবার কোন বিমান কোন দিক থেকে হামলা করে! ওই সময়টায় এশিয়া অঞ্চলের কোনো দেশ থেকে যারা যেত, তাদের অনেকরকম ঝামেলা হতো।

২০০২ সালে আপনাদের মা-জীকে নিয়ে ইউরোপে গেলাম। আমাদের কয়েকটা জায়গায় যাওয়ার কথা। হোটেল বুকিং শুধু একটা শহরে ছিল আর তিনটা শহরে ছিল না। ভাবলাম যে, ঠিক আছে, ওখানে গিয়ে করে নেব। যে হোটেলে বুকিং ছিল, সেখানে উঠে ভাবলাম রিসিপশনিস্টকে বলি—ওদের তো হোটেলগুলোর সাথে যোগাযোগ থাকে। একজন রিসিপশনিস্টকে বললাম, দেখ, আমার এরকম অবস্থা। অমুক অমুক জায়গায় যাব কিন্তু হোটেল বুকিং নেই। তুমি করে দাও। কীভাবে কী করা যায় দেখ।

সে খুব দ্রুত বুকিং-এর উদ্যোগ নিয়ে আমাকে বলছে, তোমার ক্রেডিট কার্ড দাও। আমি বললাম, আমার তো কোনো ক্রেডিট কার্ড নেই!

সে বলল, ক্রেডিট কার্ড ছাড়া বুকিং হবে না। আমি কীভাবে পেমেন্ট করব? আমি বললাম, আমি তোমাকে টাকা দিয়ে দিচ্ছি। তোমার তো কার্ড আছে। তোমার কার্ড দিয়ে করে দাও।

রিসিপশনিস্ট আমার দিকে 'হা' করে তাকিয়ে রইল। সে ইউরোপিয়ান। আমি হচ্ছি বাংলাদেশি, বাঙালি। সে বলল, তুমি জানো যে, আমার ক্রেডিট কার্ডে তোমার জন্যে যদি আমি বুকিং করি, পেমেন্ট করি, তোমার সমস্ত রেসপনসিবিলিটি আমার হয়ে যাবে। তুমি যদি কোনো ক্রাইম করো, নেগেটিভ যে-কোনো কিছু করো, তুমি ধরা খেলে আমাকেও ধরবে!

আমি হাসলাম। বললাম, আমার চেহারা দেখে কি তোমার মনে হয় যে, আমি কোনো অন্যায় করব? আমি একজন বয়স্ক মানুষ।

রিসিপশনিস্ট আমার দিকে আবার তাকাল। বলল, তা না। বাট ইটস আ সিকিউরিটি রিস্ক। আমি বললাম, ঠিক। এই রিস্কটা তুমি নিতে পারো!

এখন আমি তো পড়েছি বিপদে। আমার যদি হোটেল বুকিং না হয়.. সাথে আপনার মা-জী, গিয়ে উঠব কোথায়? রিসিপশনিস্ট আবার আমার দিকে তাকাল। বলল, তুমি তো খুব ইন্টারেস্টিং পার্সন! ঠিক আছে, তুমি যখন এত করে বলছ ... বলে সে নিজের ক্রেডিট কার্ড দিয়ে সব বুকিং করে দিলো। আমি তাকে ধন্যবাদ জানালাম এবং তাকে নগদ টাকা দিয়ে দিলাম।

যখন লন্ডনে ফিরে এলাম—যারা আমাদের পরিচিত লোকজন ছিলেন, বললেন, কী বলেন? ইউরোপে কোনো ইউরোপিয়ান আপনার হোটেল বুকিং করে দিয়েছে? একে তো আপনি বাঙালি, তার ওপর নামের সাথে বোখারী!

আমি বললাম, করে তো দিলো।

আমরা ইউরোপ ঘুরে এলাম এবং কোথাও কোনো অসুবিধা হয় নি।

যখন আপনি অন্যের কল্যাণ করবেন, তখন আপনারও কল্যাণ হবে। এটাই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম। প্রকৃতির আইন।

সূরা কাসাসের ৭৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, '... আল্লাহ যেমন তোমাকে অনুগ্রহ করেছেন, তেমনি তুমিও মানুষের প্রতি সদয় হও (মানুষের উপকার করো) ...'। কারণ আমরা প্রতিনিয়ত আল্লাহর অনুগ্রহ পাচ্ছি এবং অনুগ্রহ পাচ্ছি বলে আমরা এত ভালো আছি। এই যে টি-শার্টটা পরে আছেন, কেউ এটার সূতো তৈরি করেছে, কেউ এটাকে বয়ন করেছে, কেউ বানিয়েছে, তারপরে রং করেছে, আবার কেউ ডিজাইন প্রিন্ট করেছে। তারপরে আমরা পরছি। কত মানুষের কাছে আমাদের ঋণ!

কোয়ান্টামে আমাদের আনন্দ কী? আমরা যে-রকম ঋণ করছি, আমরা মানুষের কল্যাণও করছি। এখন আমরা নিজেরা বুঝতে পারি যে, আমরা কাজ করছি মানুষের কল্যাণে। যখন প্রথম আসি এখানে ... (কোয়ান্টাদের দিকে তাকিয়ে) ইয়ং ম্যান! তোমরা তো খাবার একদম রেডি পাচ্ছ ডাইনিং টেবিলে। ... তখন ডাইনিং টেবিল ছিল না।

লম্বাখোলাতে লাস্ট স্টেশন। এরপরে গাড়ি আসত না। সেখানে এসে সমস্ত বাজার গাড়ি থেকে রাস্তায় ছুড়ে ছুড়ে ফেলে দেয়া হতো। এই ছোট ছোট থংইয়া, সুমথংরা বাজার কুড়িয়ে মাথায় চাপিয়ে নিয়ে আসত। সেই ছোট্ট থংইয়া এখন ইঞ্জিনিয়ার থংইয়া।

আমি যখন নয়াপাড়াতে বেড়াতে গিয়েছিলাম, তখন থংইয়া, সুমথং এবং আরো তিন/ চারটা শিশুকে দেখে খুব মায়া লাগল। মনে হলো, ওদেরকে যদি শিক্ষার সুযোগ দেয়া যায়, ওরা দেশকে, জাতিকে অনেক কিছু দিতে পারবে। গতকাল থংইয়ার সাথে কথা হচ্ছিল। থংইয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার মনে আছে? সে বলল, মনে থাকবে না! আমার এখনো মনে আছে। এখান থেকে লাইন ধরে সবাই যেতাম। যত বাজার—কেউ লাউ নিয়ে, কেউ চাল মাথায় নিয়ে, কেউ অন্য বাজার নিয়ে ওখান থেকে হেঁটে আসতাম।

তখনই আমরা নিয়ম করেছি—এখানে যে আসবে, দুপুরবেলা কেউ যেন না খেয়ে ফিরে না যায়। কারণ এখানে কোনো রাস্তা ছিল না। হাঁটাই ছিল যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম। আশেপাশে খাবারের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। দুপুরবেলা না খেয়ে যাওয়া মানে—কেয়াজুপাড়া পর্যন্ত হেঁটে যেতে হবে। আমরা বলেছি—যে আসুক, তাকে বলবেন, ভাই! আমাদের এই একটু ডাল-ভাত আছে। আমিরাবাদ গেলে অনেক ভালো খাবার খেতে পারবেন। কিন্তু এখন দুপুরবেলা। দুমুঠো ডাল-ভাত খেয়ে যান।

তখন থেকে এখানে এসে কেউ না খেয়ে যেতে পারে না।

আল্লাহর রহমত! সাত জন নিয়ে আমরা শুরু করেছি। এখনো সেই সোবহান আছেন এখানে। সোবহান, তার স্ত্রী হাসি। হাসিকে নিয়ে সোবহানের ঘরের অবস্থা ছিল—বৃষ্টি হলে চাল থেকে পানি পড়ত, ছাতা নিয়ে বসে থাকতে হতো। আমাদের অনেক স্থাপনা সোবহানের হাতে গড়া। সাধারণত ঘরামি বা রাজমিস্ত্রিদের কিন্তু কী হয় না? তাদের সম্পর্কে প্রচলিত আছে যে, তাদের ঘর হয় না। অর্থাৎ ঘর বানানোর মিস্ত্রির নিজের ঘর হয় না। আলহামদুলিল্লাহ! আপনারা দোয়া করবেন। সে তার দেশের বাড়িতে চার তলা ফাউন্ডেশন দিয়েছে। আরসিসি পিলার দিয়ে বিল্ডিং তুলছে। মানে এখানকার উপার্জনের টাকায় এত বরকত! কেন?

এই কাজ করে নিজের চার তলা বিল্ডিং তোলার ঘটনা শুনি নাই। সে কেন তুলতে পারছে? অন্তর দিয়ে সে এখানে কাজ করেছে। অন্তর দিয়ে ভালবেসেছে এবং কাজটা তার জন্যে ইবাদত হয়ে গেছে। অর্থাৎ যখন মানুষ অন্যের কল্যাণে কাজ করে, এই কাজটাই তার জন্যে ইবাদত হয়ে যায়।

একজন মানুষ আল্লাহকে ডাকছে, ভগবানকে ডাকছে, ঈশ্বরকে ডাকছে। ডাকার সাথে সাথে সে আর কী করছে? সে নিজের কল্যাণে, মানুষের কল্যাণে কাজ করছে। তার তো সবটাই ইবাদত। তার সাথে আরেকজন মানুষ পাল্লা দিয়ে পারবে কীভাবে! আল্লাহ তো তার সব সৎকর্ম ইবাদত হিসেবে গ্রহণ করছেন, কবুল করছেন এবং তাকে সেভাবে পুরস্কৃত করছেন।

আমরা সূরা কাসাসের ৭৭ নম্বর আয়াতের কথা বলেছিলাম—'আল্লাহ যেমন তোমাকে অনুগ্রহ করেছেন, তেমনি তুমিও মানুষের প্রতি সদয় হও।'

বাইবেলেও কিন্তু একই কথা বলা হয়েছে, 'সার্থক জীবন তাদের, যারা দানশীল। কারণ তারা দয়া পাবে'। *[মথি ৫:৬-৮]*

বেদ-এ বলা হয়েছে, 'এসো প্রভুর সেবক হই। গরিব ও অভাবীদের দান করি।' *[ঋগ্‌বেদ : ১.১৫.৮]*

যে অভাবী, সব ধর্মে—সে হিন্দু না মুসলমান, বৌদ্ধ না খ্রিষ্টান—এটা বলা হয় নি। বলা হয়েছে—অভাবী, বলা হয়েছে—মানুষ।

আমরা খুব ভাগ্যবান। আমরা মানুষের জন্যে কাজ করছি এবং মানুষের জন্যে কাজ করছি বলে আল্লাহ আমাদেরকে এত ভালো রেখেছেন। ঢাকার স্বনামধন্য কলেজগুলো থেকে পড়াশোনা করে অনেকে মেডিকেলে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পায় না। সেখানে আমাদের এখান থেকে এবারও (২০১৯ সালে) দুই জন মেডিকেলে এবং পাঁচ জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়েছে। কেন? কারণ ওরা যে শুধু পড়াশোনা করে তা না। আজকে ওরা যাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা করসেবা করার জন্যে। আপনারাও যাচ্ছেন করসেবা করার জন্যে। এজন্যে আল্লাহর রহমত আমাদের সবার ওপর বর্ষিত হয়।

কোয়ান্টামে আমরা কী বলি? আমাদের প্রত্যয়নটা কী? শেষ বাক্যটা কী? 'জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে মানুষের কল্যাণ করব।' এই মানুষের কল্যাণ করার মধ্য দিয়ে নিজের কল্যাণ হয়। অর্থাৎ অন্যের কল্যাণে যত কাজ করবেন তত আপনি সুস্থ থাকবেন, তত সুন্দর থাকবেন, তত সুখী জীবনের অধিকারী হবেন প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে।

একটা উদ্যোগের কথা আগাম বলি। এখন তো আমরা শুধু সন্তানসম্ভবা মায়েদের জন্যে মাতৃমঙ্গল কার্যক্রম করছি। ইনশাআল্লাহ! আমরা আগামীতে আশেপাশের যত অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আছেন, তাদের নিয়ে প্রবীণসেবা কার্যক্রম শুরু করব। আমরা ঘরে ঘরে গিয়ে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের খোঁজ নেব। দরকার হলে তাদেরকে গোসল করিয়ে দেবো, চুল আঁচড়ে দেবো। অর্থাৎ অনেকে আছেন, তাদের কেউ দেখে না। ময়লার মধ্যে হয়তো পড়ে আছে অযত্নে-অবহেলায়। আমরা তাদের যত্ন করতে চাই। আশেপাশে এরকম যত প্রবীণ আছেন, সবার যত্ন করতে চাই। অসহায় প্রবীণদের যত্নায়নের কাজ করতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কোয়ান্টামমে আসতে পারবেন সাত দিন, ১০ দিনের জন্যে। এই কাজের মধ্য দিয়ে আমরা প্রকৃতপক্ষে নিজেদেরই কল্যাণ করব। আমরা সবসময় প্রভুর রহমতের ছায়ার মধ্যে থাকব ইনশাআল্লাহ!

আমি নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করছি এজন্যে যে, আমার এই নাতি-নাতনিদের পাশাপাশি আমিও কিছু রোদ সেবন করেছি। গরম রোদ দেখে আমারও জোশ বেড়ে গেছে। সকালের রোদের মধ্যে ভিটামিন ডি

থাকে। অতএব এই রোদের দিকে যারা বসেছেন, তারা যে-রকম অন্যদের জন্যে ত্যাগ করেছেন, সে-রকম আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বোনাস ভিটামিন ডি দিয়ে দিয়েছেন। যারা রোদহীন অবস্থায় থাকেন তাদেরকে আবার পয়সা দিয়ে ভিটামিন ডি ক্যাপসুল কিনতে হয়।

আমার খুব ভালো লাগছে। অবশ্য শুধু এই গরম না, আমার এর চেয়েও গরমে ক্লাস নেয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে। রাজশাহীতে গরম কিন্তু মাশাআল্লাহ! চৈত্র-বৈশাখ মাসে সে-রকম গরমের মধ্যে হলরুমে একশ লোক বসতে পারত। সেই হলে জানালা নেই। দুটো এসি আছে। কিন্তু ইলেকট্রিসিটি নেই। লোড শেডিং। সবাই ঘামছে। স্বাভাবিকভাবে আমিও ঘামছি। আমি ঘামছি আর ভাবছি—যত গরম তত আরাম এবং যত ঘাম তত জোশ।

আমি তো আমার আলোচনা করছি। এর মধ্যে দুটো জানালা বন্ধ ছিল। কয়েকজন বলল—এসি চলছে না, জানালা বন্ধ করে রেখেছেন! জানালা খুলে দিন। জানালা খুলে দেয়া হলো। ভেতরে তো গরম ছিল ওভেনের মতো। জানালা খুলে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে যে বাতাস এলো সেটা ভেতরের বাতাসের চেয়েও গরম। যারা জানালা খোলার জন্যে বলেছিল, তারা আবার নিজেরাই জানালা বন্ধ করে দিলো।

কোয়ান্টাদের জন্যে আমি অনেক দোয়া করছি। তাদের দেখে আমার নিজের ছোটবেলার কথা মনে পড়ছে। দে আর রেডি টু স্যাক্রিফাইস। অন্যের কল্যাণের জন্যে, একজন আরেকটু আরাম পাবে সেজন্যে তারা যে-কোনো ত্যাগ স্বীকারে সবসময় প্রস্তুত। আজকে তারা সেটাই প্রমাণ করেছে। তারা নিজেরা রোদে এসে বসেছে যাতে অন্যেরা ছায়ায় বসতে পারে।

সাদাকায়ন : ১৮ অক্টোবর ২০১৯; কোয়ান্টামম

প্রার্থনায়
জীবন হয় গতিময়

আজকের সাদাকায়নের বিষয়বস্তু হচ্ছে, *প্রার্থনায় জীবন হয় গতিময়*।

প্রার্থনা কবুল হওয়ার জন্যে কাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের জীবন কণিকায় একটা বাক্য আছে—কর্ম ছাড়া প্রার্থনা কবুল হয় না। আবার কর্মকে সফল করার জন্যেও এই প্রার্থনা প্রয়োজন।

আপনি সমস্ত প্রস্তুতি নিলেন অর্থাৎ কর্মের মালিক আপনি, ফল দেয়ার মালিক আল্লাহ। কাজ এবং প্রার্থনা, প্রার্থনা এবং কাজ—এই দুটো যখন জীবনের সাথে মিশে একাকার হয়ে যায়, তখন জীবন গতিময় হয়, সুন্দর হয়, চমৎকার হয়, জীবন অপূর্ব হয়। যুগে যুগে এজন্যেই মানুষ প্রার্থনা করে। প্রার্থনা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে।

আমরা যদি ইতিহাসের দিকে তাকাই—আপনারা সবাই বাবরের নাম শুনেছেন। মোঘল সম্রাট বাবর। ছেলে হুমায়ুনকে বাবর তার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে গড়ে তুললেন। একবার হুমায়ুন প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হন। নামকরা যত ডাক্তার কবিরাজ হেকিম বৈদ্য ছিল, সবাইকে দেখানো শেষ। জ্বর কিছুতেই ভালো হয় না।

বাবর তার মুর্শিদ অর্থাৎ পীর সাহেবের কাছে গেলেন। দোয়া হলো। বাবর নিজেও দোয়া করছেন। তার মুর্শিদ, তার পীর তাকে বললেন, দেখ, দোয়াতে কাজ হবে কিন্তু তোমার ছেলে তখনই বাঁচবে যদি তুমি তার জীবনের বদলা হিসেবে নিজের জীবন দান করে দাও। সেভাবে যদি প্রার্থনা করো। বাবর বললেন, ঠিক আছে। সেভাবে প্রার্থনা করব।

মুমূর্ষু হুমায়ুন। বাবর পুত্রের বিছানার কাছে বসলেন। দোয়া শুরু করলেন

এবং দোয়ার একপর্যায়ে বললেন, আল্লাহ! আমার আয়ু আমার সন্তানকে দিয়ে দাও আর ওর রোগ আমাকে দিয়ে দাও। আমার জীবনের বিনিময়ে হলেও আমার উত্তরাধিকার বাঁচুক এবং সে রাজত্ব করুক।

প্রার্থনায় বাবর লীন হয়ে গেলেন। তারপর তিনি আস্তে আস্তে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অন্যদিকে হুমায়ুন সুস্থ হতে লাগলেন। হুমায়ুন যখন পুরো সুস্থ হলেন, বাবর তখন মারা গেলেন।

কেউ যদি প্রার্থনা করে, দোয়া করে, কায়মনোবাক্যে কিছু চায়, আল্লাহ তাকে সেটা দেন। জীবন যে-রকম দেন, সে-রকম জীবিকাও তিনি দেন, আহারও তিনি দেন।

মহামতি বুদ্ধের জীবনে খুব সুন্দর একটা ঘটনা আছে। বুদ্ধ রাজপ্রাসাদ ছেড়ে এক কাপড়ে বেরিয়ে গেলেন ... শীতবস্ত্রও নেই। অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে আশ্রয় নিলেন। বসলেন। ধ্যানমগ্ন হলেন। তিনি দুঃখের কারণ অনুসন্ধান করতে লাগলেন এবং প্রার্থনা করতে লাগলেন।

খাবার আসবে কোত্থেকে? জঙ্গলে ডুমুর গাছ ছিল। পাকা ডুমুর ফল। আমাদের দেশে যে ডুমুর হয়, এগুলো ছোট থাকতে তরকারি করে বা ভর্তা করে খাওয়া যায়। পাকলে এর কোনো স্বাদ নেই। কিন্তু সেই ডুমুর ছিল খুব সুস্বাদু। পাকা ডুমুর খেয়ে বুদ্ধ দিন কাটাতে লাগলেন।

ডুমুরেরও তো সিজন আছে। উনি ওখান থেকে নড়বেন না, সাধনা থেকেও বিচ্যুত হবেন না। ভাবলেন—এখন খাবার আসবে কোত্থেকে? ডুমুর শেষ। গাছে আবার ডুমুর আসতে সময় লাগবে। এখন খেতে তো হবে! উনি ধ্যানমগ্ন। প্রার্থনা করছেন, প্রভু! আমি তো সত্যের সন্ধান করতে চাই। দুঃখের কারণ বুঝতে চাই। আমি জানি, তুমি সর্বপ্রাণীকে আহার দান করো। জগতের সকল প্রাণীকে, কীটপতঙ্গকেও তুমি আহার প্রদান করো।

এর পর পরই দূর গ্রাম থেকে এক মহিলা সেখানে এলেন। তিনি মানত করেছিলেন যে, তার চাওয়া যদি পূর্ণ হয়, তাহলে পায়েস রান্না করে কোনো ঋষিকে, পুণ্যাত্মাকে খাওয়াবেন। নাম তার সুজাতা। ধনাঢ্য পরিবারের স্ত্রী তিনি। পায়েস নিয়ে বেরিয়েছেন, কোনো পুণ্যাত্মা পাচ্ছেন না। লোকালয় ছেড়ে জঙ্গলে হাঁটতে হাঁটতে এক অশ্বত্থ গাছের নিচে দেখলেন—এক সন্ন্যাসী, ধ্যানমগ্ন। কোনোদিকে খেয়াল নেই। তিনি ভাবলেন যে, এ-ই তো পুণ্যাত্মা!

বুদ্ধ তখনো 'মহামতি বুদ্ধ' হয়ে ওঠেন নি। তিনি সন্ন্যাসী সিদ্ধার্থ। তার

সাথে আরো পাঁচ জন সন্ন্যাসী সাধনা করছিলেন। কৃচ্ছ্রসাধনা। বুদ্ধের ধ্যান ভাঙল। যখন সুজাতার নিয়ে আসা পায়েস দেখলেন, বুদ্ধ ওখান থেকে কিছু খেলেন। তার সাথে যারা ছিল তাদেরকে বললেন, খাও। তারা বিরক্ত হলো—এ পায়েস খায়, আবার সাধনা করতে আসছে! এর তো সাধনা হবে না। পাঁচ সন্ন্যাসী বুদ্ধকে ছেড়ে চলে গেলেন। বুদ্ধ একা থেকে গেলেন।

বুদ্ধের সাথে সাধনা করছিলেন যে পাঁচ জন সন্ন্যাসী, তাদের কথা কিন্তু আমরা ইতিহাসে পাই না। পাই বুদ্ধের কথা। বুদ্ধ বলতেন, আমি সাধনা করি এবং আমি মধ্যপন্থী। সাধনার ক্ষেত্রে তাঁর পন্থার নামই ছিল মধ্যপন্থা। সুজাতা বুঝতে পেরেছিলেন, বুদ্ধই প্রকৃত সাধক। মাঝে মাঝেই সুজাতা খাবার নিয়ে আসতেন। বুদ্ধ সে খাবার গ্রহণ করতেন। এভাবেই প্রার্থনায় যখন একজন মানুষ ডুবে যায়, তার প্রয়োজন পূরণের পথও বেরিয়ে আসে।

দেখুন, মাদার তেরেসার ঘটনা। কলকাতায় মাদার যে আশ্রম গড়েছিলেন—মিশনারিজ অব চ্যারিটি, সেখানে এতিম আশ্রয়হীন শিশুদের স্কুল ছিল। যে সিস্টার স্কুলের দায়িত্বে ছিলেন, একদিন দুপুরে কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, মাদার! আমার তো খেয়াল ছিল না, আজ দুপুরে বাচ্চাদের খাওয়ার তেমন কিছু নেই। আমাদের পৃষ্ঠপোষক কাউকে যদি আপনি ফোন করে দেন, তাহলে হয়তো আজ দুপুরবেলার ৩০০ বাচ্চার খাবারের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

মাদার তেরেসা সিস্টারকে বললেন, তুমি আমাকে বলছ পৃষ্ঠপোষকদের ফোন করতে? তুমি কি ঈশ্বরকে জানিয়েছ তোমার অভাব, তোমার অভিযোগ? সিস্টার বললেন, না। মাদার বললেন, প্রথমে তুমি ঈশ্বরকে জানাও।

সিস্টাররা চার্চের দিকে চলে গেলেন এবং প্রার্থনা শুরু করলেন। এর মধ্যে এক ভদ্রলোক এলেন মাদারের সাথে দেখা করার জন্যে। খুব বিনয়ের সাথে বললেন, তিনি শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা। একটা সমাবেশের আয়োজন করেছিলেন ৭০০ শিক্ষকের জন্যে। দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু শিক্ষকেরা আজ ধর্মঘট করছেন। সমাবেশে আসবেন না। এত খাবারের এখন কী হবে? মাদারকে বললেন, আপনি যদি অনুমতি দেন তো এই ৭০০ জনের খাবার এই শিশুদের জন্যে নিয়ে আসতে চাই। আপনি যদি গ্রহণ করতেন!

দরকার ছিল ৩০০ জনের খাবার। খাবার এলো ৭০০ জনের। তো আমাদের কাজ করতে হবে, কিন্তু তার আগে প্রার্থনা করতে হবে। যে যেভাবে বিশ্বাস করি সেভাবে প্রার্থনা করতে হবে।

দেখুন, রসুলুল্লাহর (স) জীবন। বদরের প্রান্তরে শত্রুরা তাকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে একহাজার সুসজ্জিত সৈন্য নিয়ে এসেছে। নবীজীর (স) পক্ষে বয়োবৃদ্ধসহ ৩১৩ জন। কারো ঢাল আছে তো তলোয়ার নেই। কারো তলোয়ার আছে, বর্ম নেই। আর কোরাইশরা সুসজ্জিত একহাজার সৈন্য।

নবীজীর (স) সঙ্গীসাথিরা লড়াই না করলেও মারা যাবেন। কারণ কোরাইশরা এসেছেই তাদেরকে মারতে। অতএব আত্মরক্ষার জন্যে লড়াই ছাড়া তাদের কোনো বিকল্প ছিল না। লড়াই না করে মারা যাওয়ার চেয়ে লড়াই করে মারা যাওয়াটা নবীজী (স) উত্তম মনে করলেন। তাঁর যা ছিল সেটা নিয়ে তিনি প্রস্তুতি নিলেন।

রণক্ষেত্রে গিয়ে তিনি প্রার্থনা করলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি যদি সাহায্য না করো তাহলে আজ আর তোমার নাম নেয়ার জন্যে কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। তোমার সাহায্যই শুধু আমাদেরকে বিজয়ী করতে পারে।' তিনি প্রার্থনায় ডুবে গেলেন। নবীজীকে (স) আল্লাহ বিজয় দান করলেন।

কাজ করতে হবে কিন্তু কাজ সবসময় সমৃদ্ধ হতে হবে প্রার্থনা দ্বারা। প্রার্থনা দ্বারা যখন কর্ম সমৃদ্ধ হয়, তখন জীবন গতিময় হয়। শুধু কর্মে হয় না, কর্মের সাথে প্রার্থনা করা জরুরি। প্রার্থনার যে শক্তি, এই শক্তি আমাদের চারপাশের মানুষের জীবনেও যদি খোঁজ করি, আমরা দেখতে পাবো। যত সফল মানুষ আছেন, যারা শান্তিতে আছেন, তৃপ্তিতে আছেন, প্রত্যেকের শান্তি এবং তৃপ্তির প্রক্রিয়ায় কর্মের সাথে থাকে প্রার্থনা।

কাজ এবং প্রার্থনা। প্রার্থনা কাজকে গতিময় করে। প্রার্থনা কাজকে সঠিক পথে সঠিকভাবে পরিচালিত করে। প্রার্থনা যে নিরাময় করে, এটা তো আমরা সবাই জানি। যে কারণে 'রসুলুল্লাহ (স) রোগীকে দেখতে গেলে তার মাথার কাছে বসতেন এবং দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! হে মহান আরশের অধিপতি! তুমি তাকে নিরাময় করো। তিনি সাত বার এই দোয়া করতেন।' *[আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা); তিরমিজী, আবু দাউদ]*

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। তারা এখন প্রার্থনা নিয়ে গবেষণার জন্যে ফান্ড দিচ্ছে। কেন? নিরাময়ের ক্ষেত্রে প্রার্থনার যে কার্যকারিতা, এটা নানারকম তথ্য-উপাত্ত গবেষণা থেকে উঠে আসছে। যে কারণে এখন আমেরিকাতে ১১০টা মেডিকেল কলেজে ডাক্তারদের শেখানো হয়, কীভাবে প্রার্থনা করতে হবে।

আরেকটি ঘটনা। এক যুবক। তিনি তার স্ত্রীসহ হজে গেলেন। **১১-১২** জনের গ্রুপের সাথে ছিলেন। তার স্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন মক্কাতে। জ্বর **১০৪, ১০৫** ডিগ্রি। **১০২**-এর নিচে নামছে না। একসপ্তাহ। মক্কা ছেড়ে হজের পরবর্তী যাত্রা মিনা। মিনার পরে আরাফাত। এখন সবাই মিনাতে যাবে।

অসুস্থ স্ত্রী বললেন, জ্বর তো ভালো হচ্ছে না। আমি এখানেই থাকি। আমার জন্য তিন-চার দিনের খাবার রেখে যাও। যা হয় পরে দেখা যাবে। কিন্তু যুবক ভাবলেন যে, না। এই অবস্থায় অসুস্থ স্ত্রীকে রেখে সে যাবে না।

প্রথমবারের মতো তারা হজে গেছেন। এখন কী করবেন? ওষুধে কোনো কাজ হচ্ছে না। জ্বর, জ্বরের সাথে মাথাব্যথা এবং আরো কিছু উপসর্গ। দেখা গেল, হজের আহকাম তার পক্ষে পূরণ করা সম্ভব হবে না। তখন যুবকের খুব অভিমান হলো। তিনি কাবা শরীফে চলে গেলেন। কাবা শরীফে গিয়ে আল্লাহর সাথে অভিমান! ...

একটা সময় দোয়ায় নিমগ্ন হলেন, হে আল্লাহ! তুমি তাকে ভালো করে দাও। কারণ এরপরে আমাদের আর হজে আসা সম্ভব হবে কিনা জানি না। অভিমানে নানান কথা। যুবকটি দোয়ায় ডুবে গেলেন। তিনি আর কিছু বলতে পারছেন না। বসেই ছিলেন। বসা অবস্থায় যখন তার সেন্স আবার জাগ্রত অবস্থায় এলো, তখন তার চোখ দিয়ে দরদর দরদর করে পানি পড়ছে।

তিনি অনুভব করলেন—একটা শক্তি বলয় থেকে তিনি যেন বেরিয়ে এলেন। একটা তৃপ্তি অনুভব করলেন। যেখানে তার স্ত্রীকে রেখে গিয়েছিলেন, সাথে খাবার নিয়ে সেখানে গেলেন। গিয়ে দেখলেন স্ত্রীর জ্বর নেই। একদম স্বাভাবিক। এরপর তারা মিনার উদ্দেশ্যে রওনা করলেন। হজে পরবর্তী যত দিন ছিলেন, জ্বর বা অন্য কোনোরকম অসুখ-বিসুখ কাছেও আসে নি।

প্রার্থনা কখন কবুল হয়? প্রার্থনা যদি ঠিকমতো হয়। যখন প্রার্থনার সাথে প্রার্থনাকারী একাকার হয়ে যায়, তখন প্রার্থনা কবুল হয়। তখন আপনি যা চাইবেন, তা-ই পাবেন।

আমরা আমাদের আলোচনায় দেখলাম—প্রার্থনা শুধু যে আমাদেরকে সুস্থ করে তা না। আমাদের যত চাহিদা আছে, যত প্রয়োজন আছে, সমস্ত প্রয়োজন পূরণের জন্যে কর্মের মধ্যে গতিসঞ্চার করে প্রার্থনা। জীবনে গতি নিয়ে আসে এই প্রার্থনা। জীবনে স্থিরতাও নিয়ে আসে এই প্রার্থনা। কিন্তু প্রার্থনা করতে হবে একমাত্র স্রষ্টার কাছে। দেয়ার মতো সবকিছুই যার কাছে

আছে। নিজেকে বিলিয়ে দিতে হবে তাঁর কাছে। তাঁর কাছ পর্যন্ত পৌঁছতে হবে এবং সেটা তখনই সম্ভব হবে, যখন আপনি একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করবেন। চিত্তকে আত্মার সাথে সংযুক্ত করে দিতে হবে। মনকে আত্মার সাথে সংযুক্ত করে প্রার্থনা করতে হবে। তাহলে নেটওয়ার্কিং হবে এবং আপনার প্রার্থনা যেখানে আপনি পাঠাতে চাচ্ছেন সেখানে পৌঁছবে।

প্রার্থনা কবুল হওয়ার জন্যে কখনো কখনো সময়েরও প্রয়োজন হয় না, যদি সেভাবে প্রার্থনা করতে পারেন। তবে সাধারণভাবে প্রার্থনা কবুল হওয়ার জন্যে সময়ের প্রয়োজন। আপনি যে লক্ষ্যে প্রার্থনা করছেন সেই লক্ষ্যটা অর্জনের জন্যে সময় দিতে হবে।

ধরুন, আপনি ডাক্তার হওয়ার মনছবি দেখছেন। মনছবিকে আমরা বলি ভিডিও প্রার্থনা। আল্লাহকে একদম ছবিটবিসহ বলে দেয়া যে, আল্লাহ! এই এই চাই ...। পড়ছেন ক্লাস এইটে। তাহলে প্রার্থনা পূরণ হওয়ার জন্যে কত বছর অপেক্ষা করতে হবে? টেন টু টুয়েলভ। চার বছর। তারপরে এক চান্সে এমবিবিএস পাশ করতে আরো পাঁচ বছর। মোট নয় বছর। নয় বছর অপেক্ষা এবং পরিশ্রম—দুটোই করতে হবে।

আর মনছবি বাস্তবায়নে গতি আসার পথ হচ্ছে প্রার্থনা। যখন আপনি মনছবির সাথে, প্রার্থনার সাথে একাকার হয়ে যেতে পারবেন, তখন প্রার্থনা যিনি পূরণ করেন তাঁর সাথেও একাকার হয়ে যেতে পারবেন। আমাদের সবাইকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। সেই এক ঈশ্বরের কাছে, এক ভগবানের কাছে, এক আল্লাহর কাছেই আমরা চাইব।

সাদাকায়ন : ২২ নভেম্বর ২০১৯; কোয়ান্টামম

নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নিজেই নিন

আজকের সাদাকায়নে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। কোয়ান্টামমে স্বাগত জানানোর সুযোগ আমার খুব কম হয়। সেই দিক থেকে আজ নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। বিশেষত এখানে যারা আছেন এবং দেশের দূরদূরান্ত থেকে যে বাণীবাহকেরা এসেছেন, তাদের সামনে আমাদের বাণীকে তুলে ধরার সুযোগ পাওয়ায় স্রষ্টার কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে, *নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নিজেই নিন*। সিদ্ধান্ত বলতে আমরা সঠিক সিদ্ধান্তই বুঝি। নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নিজে নিলেন কিন্তু সিদ্ধান্তটা যদি ভুল হয়; সাধারণত ভুল সিদ্ধান্তের দায়িত্ব কেউ নিতে চায় না।

সিদ্ধান্তটা নিতে হবে সময়মতো। সময়মতো সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে শেখাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনার পরিবেশ পরিস্থিতি পারিপার্শ্বিকতাকে আপনি যতটা বুঝতে পারবেন, যত বড় বিশেষজ্ঞের কাছে যান, তিনি আত্মিক শক্তিতে শক্তিমান না হলে আপনি তাকে আপনার সমস্যার সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ বোঝাতে পারবেন। কারণ আপনি ৫০ শতাংশ কমিউনিকেট করতে পারবেন। পুরো সমস্যাটাকে আপনি কখনো কমিউনিকেট করতে পারবেন না। কারণ প্রত্যেকটি সমস্যার এমন কিছু অংশ থাকে, যা কেউ সাধারণভাবে কমিউনিকেট করতে চায় না।

অতএব নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত সঠিক সময়ে সঠিকভাবে নিতে পারা নিঃসন্দেহে একটি বড় গুণ। যে-কোনো কাজ সবচেয়ে ভালোভাবে করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ; সময়মতো

করাটাও জরুরি। যে কারণে প্রত্যেক ধর্ম সময়মতো কাজ করাকে এত গুরুত্ব দিয়েছে। যেমন : নামাজের ওয়াক্ত সুনির্দিষ্ট করা আছে; যে, এই সময়ে এই নামাজ পড়তে হবে; তা না হলে কাজা হবে।

একইভাবে আমরা যদি হিন্দুধর্মে দেখি—তিথি নক্ষত্র ক্ষণ গণনা অনেক জটিল। যেটা আসলে জ্যোতিষশাস্ত্রে বা জ্যোতির্বিদ্যায় অভিজ্ঞতা ছাড়া কারো পক্ষে নিরূপণ করা সম্ভব নয়। কোনো জ্যোতির্বিজ্ঞানী যদি নিরূপণ করে দেন, তারপর সেটা একজন ফলো করতে পারবেন।

অর্থাৎ সময়ের গুরুত্ব—এটা প্রত্যেক ধর্ম একইভাবে দিয়েছে। আসলে সিদ্ধান্ত সঠিক হলে যে-রকম আপনার উপকার হবে, কল্যাণ হবে; ভুল হলে একইভাবে আপনার অকল্যাণ হবে।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের কন্যা অসুস্থ ছিলেন। কোনো হেকিম কবিরাজ বৈদ্য তাকে সুস্থ করতে পারছিলেন না। ইংরেজরা যখন খবর পেল তখন তারা টমাস রো-কে পাঠাল দূত হিসেবে। টমাস রো সম্রাটের কাছে আবেদন করলেন যে, আমরা চেষ্টা করে দেখি। জাহাঙ্গীর তার কন্যাকে অনেক স্নেহ করতেন। ভাবলেন—আচ্ছা, ঠিক আছে, যদি হয় ...।

ওষুধ কাজ করল। তখনকার দিনের সম্রাটরা তো কোনো ব্যাপারে খুশি হলে 'মু-মাঙ্গা' পুরস্কার দিতেন; অর্থাৎ যে যা চাইত, তাকে সে পুরস্কার দেয়াটা রাজা বাদশা সম্রাটদের কাছে খুব আত্মসম্মানের ব্যাপার ছিল। আর মোঘল সম্রাট তো মোঘল সম্রাট! সেই সময়ে ভারতবর্ষের জিডিপি ছিল ওয়ার্ল্ড জিডিপির ২৩ শতাংশ.. এখন শুনছি যে, ২৩ না—৩৯ শতাংশ!

পারস্যসম্রাট নাদির শাহ দিল্লি লুট করে ময়ূর সিংহাসনসহ আট হাজার গাড়ি বোঝাই ধন-রত্ন-মণিমাণিক্য নিয়ে যায়। এখন বুঝতে পারেন, দিল্লির সম্রাটের কী অবস্থা ছিল! দিল্লির সম্রাটকে তখন বলা হতো দিল্লিশ্বর জগদীশ্বর। দিল্লির যিনি ঈশ্বর, তিনি জগতের ঈশ্বর। মানে তেল কী পরিমাণ দেয়া হতো সম্রাটকে! বোঝেন!

সম্রাট জাহাঙ্গীর বললেন, কী পুরস্কার দেবো তোমাকে! বলো, যা চাইবে তা-ই পাবে।

টমাস রো কিন্তু তেমন কিছুই চান নি। খুব বিনয়ের সাথে একেবারে কুর্নিশ করে বললেন, সম্রাট! দিল্লিশ্বর জগদীশ্বর! আমরা বহত গরিব আছি। ব্যবসাবাণিজ্য করিয়া খাই। আমাদের কিছুই চাই না। সোনাদানা কী এইটা

আমরা বুঝি না। আমাদের শুধু বিনা শুল্কে ব্যবসা করার অনুমতি দিলে আমাদের জীবন ধন্য হইয়া যায়।

সম্রাট জাহাঙ্গীর বললেন, ঠিক হ্যায়! ঠিক আছে।

টমাস রো-এর একটা চাওয়া ... আজকের ব্রিটেন যে অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছে—এই একটা সিদ্ধান্তের জন্যে। আর আমরা যে ২০০ বছর গোলামি করলাম ইংরেজদের, এই একটা চাওয়া, একটা সিদ্ধান্ত—বিনা শুল্কে ব্যবসা করতে দেয়ার জন্যে। তো একজন সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে নেই। আমরা ২০০ বছরের গোলাম হলাম। আরেকজন ঠিক বুঝেছিল যে, কী চাইতে হবে। একটা চাওয়া তার জাতিকে পৃথিবীতে ২০০ বছরের জন্যে সবচেয়ে কর্তৃত্বশীল জাতিতে পরিণত করল।

একটা চাওয়া! একটা সিদ্ধান্ত ...!

টমাস রো চাইতেই পারতেন যে, ঠিক আছে, সম্রাট! আমাকে এত এত স্বর্ণমুদ্রা মণিমুক্তা দেন। আপনার তো মণিমুক্তার কোনো অভাব নেই। সোনাদানার অভাব নেই। এক বস্তা দিয়ে দেন। তিনি দিয়ে দিতেন, কিন্তু ইংরেজরা তাতে ২০০ বছর পৃথিবীব্যাপী রাজত্ব করতে পারত না। এই একটা সিদ্ধান্ত, একটা চাওয়া; যে, কী চাইতে হবে ... ইংরেজদেরকে ২০০ বছরের জন্যে পৃথিবীর প্রভু বানিয়ে দিলো। এরপর থেকেই তাদের বিস্তৃতি ঘটতে লাগল। বলা হতো যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য কখনো অস্ত যায় না।

পুরো ব্রিটিশ সরকারের সৈন্যসংখ্যা ছিল এক লক্ষ। আর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈন্য ছিল দুই লক্ষ! এখন বোঝেন, তারা কত গরিব ছিল! একটা কোম্পানির দুই লক্ষ সৈন্য ছিল একটা দেশকে লুটপাট করার জন্যে।

একটা সিদ্ধান্ত ...!

আসলে কেন টমাস রো এবং ইংরেজরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলেন? একজন মানুষ সঠিক সিদ্ধান্ত তখনই নিতে পারে, যখন সে বোঝে তার কী করতে হবে। কী করা উচিত, কী করা উচিত নয়!

আমাদের অবস্থা কী? আমাদের তরুণদের কী অবস্থা? এই দু-বছর আগের একটা জরিপ হচ্ছে, ৬৩ শতাংশ তরুণ জানে না তার জীবনের লক্ষ্য কী। অর্থাৎ সে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। সেটা এই পার্বত্য অঞ্চলের বঞ্চিত তরুণ থেকে শুরু করে শহরের নাগরিক, সুযোগ-সুবিধা ও বিত্তের মধ্যে লালিত তরুণ-তরুণী পর্যন্ত। তারা যাকে উচ্চশিক্ষা বলে, সেই উচ্চশিক্ষা পাওয়ার পরেও বুঝতে পারে না; যে, সে কী করবে!

কারণটা কী? কারণ আমাদের মা-বাবারা।

আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের ননীর পুতুলের মতো আঁকড়ে রাখি। আদর এবং আহ্লাদ দিয়ে আমরা তাদেরকে বড় করি। শুধু গোল্ডেন জিপিএ ফাইভ ছাড়া আর কোনোকিছুর দিকে লক্ষ নেই। আমরা অধিকাংশ মা-বাবা চাই আমার ছেলেমেয়ে শুধু পড়ুক, পড়ুক। গোল্ডেন জিপিএ ফাইভের জন্যে পড়ুক। তারা সন্তানকে নিজের কাজ নিজে করার সুযোগই দেন না।

নিজের কাজ নিজে করার সুযোগ না পেলে, নিজে করার অভ্যাস না হলে কেউ নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারে না। কখনোই পারে না। তো সন্তান যদি পরিশ্রমী এবং কষ্টসহিষ্ণু না হয়, তাহলে সেই সন্তান স্বাবলম্বী হতে পারে না এবং স্বাবলম্বী হতে পারে না বলে নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারে না।

জাপানিদের দেখুন। জাপানি মায়েদের অবস্থা শুনলে তো অনেক বাঙালি মা মনে করবেন যে, জাপানি মায়েরা মা-ই না। একটি জাপানি শিশুর বয়স যখন দুই থেকে তিন বছর হয়, তখনই ঘরের ছোটখাটো জিনিস নাড়াচাড়া করা, পরিষ্কার করার কাজ শিশুকে দিয়ে করানো হয়। কাগজের টুকরা পড়ে আছে, শিশুকে বলা হয়—কাগজের টুকরাটা তুলে ডাস্টবিনে রেখে আসো। অর্থাৎ দুবছর/ তিন বছরের শিশু ক্লিনিং থেকে শুরু করে যে যে কাজগুলো করতে পারে, সে মনের আনন্দে করে।

আমাদের ছেলেমেয়েরা স্কুল থেকে বাসায় এসে জুতা একদিকে ছুড়ে মারল, ইউনিফর্ম আরেকদিকে ছুড়ে মারল; করে না ... ? করে। কিন্তু জাপানি শিশুরা এমনটা করে না। কারণ জানে যে, করলে এটা তাকেই আবার ওখান থেকে এনে জায়গামতো রাখতে হবে। এটাকেই বলে প্রি-স্কুলিং। এখন তো তিন বছর বয়সেই প্রি-স্কুলিং। কারণ এখনকার অধিকাংশ শহুরে শিশুর তো মেশার কেউ নেই। প্রি-স্কুলিং করবে না তো কী করবে? আমাদের সময় তো মেশার জায়গা ছিল। কাজিন ছিল, বন্ধু ছিল। ভাইবোনও কম ছিল না। সব মিলিয়ে তো একটা ফুটবল টিম!

জাপানি মায়েরা কত স্ট্রিক্ট! অর্থাৎ কত ভালবাসে সন্তানকে ...। টিফিন যে বক্সে নিয়ে যাচ্ছে, টিফিন খেয়ে ওটাকে আবার ধুয়ে পরিষ্কার করে বাসায় এনে জায়গামতো সাজিয়ে রাখতে হয়। তাহলেই পরের দিনের টিফিন সে নিয়ে যেতে পারবে। তা না হলে পরের দিন টিফিন নেই।

জাপানিদের অনেকগুলো গুণকে আমি পছন্দ করি। আবার অনেকগুলো দোষ আছে, যেটাকে অপছন্দ করি। তাদের কোন গুণটা পছন্দ করি? চার জন

বাঙালি যে কাজ করতে পারে ... ফিজিক্যাল ওয়ার্ক, স্ট্যামিনা ... একজন জাপানি সেই পরিমাণ কাজ করতে পারে। কেন? ছোটবেলা থেকেই সে স্বাবলম্বী এবং কাজ করে অভ্যস্ত।

স্কুলেও একই অবস্থা। স্কুল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নের কাজ শিক্ষার্থী শিশুরাই করে। ওখানে যদি টিফিন পরিবেশনের ব্যাপার থাকে, স্টাফ বা কর্মচারীরা নয়, শিশুরা পরিবেশন করে। ফলে তাদের কাছে স্কুলিং-এর মধ্যে একধরনের পিকনিক পিকনিক ভাব কাজ করে। যেহেতু সে ছোটবেলা থেকেই স্বাবলম্বী হয়, সে কারণে বড় হলে সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং দায়িত্ব নিতে শেখে।

নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নিজে নেয়ার পথে সবচেয়ে বড় বাধা কী? কর্মবিমুখতা। আমরা সবসময় চিন্তা করি যে, অমুকে সাহায্য করবে। যে-রকম মামা-চাচা আমাকে একটা ব্যবসা দিয়ে দেবে। শ্বশুর আমাকে একটা ব্যবসা দিয়ে দেবে। বাবা তার ব্যবসা আমাকে দিয়ে দেবে।

মারোয়াড়িরা সাধারণত ব্যবসায়ী হয়। এ উপমহাদেশে ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রণ করে তারা। কিন্তু কোনো মারোয়াড়ি তার ছেলেকে কর্মজীবনের শুরুতে ব্যবসা দেয় না। নিজের ছেলেকে নিয়োগ করে তার সবচেয়ে অধঃস্তন কর্মচারীর অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে। অর্থাৎ তার সর্বনিম্ন যে কর্মচারী, তার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে সে কর্মজীবন শুরু করে। আর আমাদের ছেলেমেয়েরা? মাশাআল্লাহ! আমি যদি কোনো কোম্পানির এমডি হই, আমার ছেলে তো জয়েন করবে ডিরেক্টর হিসেবে। যে কারণে ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে এই ছেলে আর ব্যবসা রাখতে পারে না। বাবা এমডি ছিলেন; ব্যবসা গড়েছেন। এই ছেলে ব্যবসা বিনাশ করেছে।

উদ্যোগী, কর্মশীল যদি নিজে না হওয়া যায় তাহলে ব্যর্থতা তার জীবনে অবধারিত। কারণ সে কোনো প্রতিকূলতা ফেইস করতে পারে না তখন। তো যে নিজে মেহনত করে, ভাগ্য তার সহায় হয়। আল্লাহ তার সহায় হন। ঈশ্বর তার সহায় হন। ভগবান তার সহায় হন—যে নিজে উদ্যোগী হয়।

এই যে মাইক্রোওয়েভ বলি, বেতার যোগাযোগ বলি, ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের মূল যে জিনিস—তারহীন যোগাযোগ, এটার আবিষ্কারক কে? আমাদের দেশের বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু। জগদীশচন্দ্র বসু কী করেছেন? তিনি কি আনুকূল্য পেয়েছেন কখনো? নিজে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রতিকূলতার মুখে। সেই সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করেছেনও নিজে।

তিনি দেশে ফিরে এলেন ইংল্যান্ড থেকে ডিগ্রি নিয়ে। প্রেসিডেন্সি কলেজে জয়েন করলেন। সে-সময় ইংরেজরা শাসন করত এই দেশ। বাঙালিদের, এই দেশের মানুষদের তারা নেটিভ বলত আর নিম্নস্তরের মানুষ ভাবত। প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংলিশ অধ্যাপকের বেতন বেশি আর বাঙালি অধ্যাপক হলে তার বেতন ছিল অর্ধেক।

জগদীশচন্দ্র বসু গবেষণা করতে চাইলেন। কলেজের ল্যাবরেটরিতে তাকে গবেষণা করার কোনো সুযোগ দেয়া হলো না। কিন্তু তিনি থেমে থাকেন নি। উদ্যম আর কর্ম ...।

তিনি টয়লেটের পাশে তিন ফিট বাই আট ফিট পরিত্যক্ত একটা রুম পেলেন। কত স্কয়ার ফিট হলো? ২৪ স্কয়ার ফিট একটা রুম। তাকে কোনো ফান্ড দেয়া হয় নি। ফান্ড নেই, কোনো যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা নেই। তিনি দেশি মিস্ত্রি দিয়ে যন্ত্র তৈরি করা শুরু করলেন ঐটুকু রুমের মধ্যে। কলেজের ফান্ড ছাড়া, নিজের টাকায়। তারপর কী হলো?

তাকে যেহেতু অর্ধেক বেতন বরাদ্দ করা হয়েছিল, তিনি বললেন, না, অর্ধেক বেতন নেব না। বেতন দিতে হলে পুরো বেতন দিতে হবে। ইংরেজের সমান বেতন দিতে হবে। তা না হলে অহিংস প্রতিরোধ। মারপিট না, ভাঙচুর না, স্লোগান না। কাজ আমি করব কিন্তু আধা বেতন নেব না। কাজও ছাড়ব না। বেতন ছাড়াই চাকরি করব।

অভাব ছিল। সে অভাবকে সয়েছেন তিন বছর। তিন বছর অহিংস অসহযোগ। তিন বছর পর ইংরেজরা নতি স্বীকার করল। তাদেরও তো একটা প্রেস্টিজের ব্যাপার আছে; যে, তিন বছর ধরে এক নেটিভ বেতন ছাড়া কাজ করছে! তারা পুরো বেতন দেয়া শুরু করল তিন বছরের বকেয়াসহ।

সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তে দৃঢ় থাকার যে সাহস ...। যেখানে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে ইউরোপের বিজ্ঞানীরা ৬০ মিলিমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ওয়েভ তৈরি করতে পারছিল না, তিনি দেশি কারিগর দিয়ে, দেশি যন্ত্র দিয়ে ৫ মিলিমিটার মাইক্রোওয়েভ তৈরি করলেন। আমরা তো মাইক্রোওয়েভ বলতে ওভেন বুঝি ..., গৃহিণীরা সাধারণত বোঝেন মাইক্রোওয়েভ ওভেন।

মাইক্রোওয়েভ কমিউনিকেশনের উদ্ভাবক হচ্ছেন জগদীশচন্দ্র বসু। তার এ আবিষ্কারের ১২০ বছর পর বিশ্বের রেডিও ইঞ্জিনিয়ারদের প্রতিষ্ঠান IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineering) আমাদের জগদীশচন্দ্র বসুকে ঘোষণা করল আধুনিক রেডিও বিজ্ঞানের জনক হিসেবে।

মাইক্রোওয়েভ বিষয়টা আসলে কী? এখনকার ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ওয়ান অব দ্য পিলার্স হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ। এর উদ্ভাবক হচ্ছেন একজন বাঙালি। যিনি তিন বাই আট অর্থাৎ ২৪ স্কয়ার ফিট ল্যাবরেটরিতে কাজ করেছেন। কেন পেরেছিলেন? কারণ সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলেন যে, আমি এটা করবই।

যারা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তারা সফল হন। যিনি মেহনতকে ভয় পান না, পরিশ্রমকে ভয় পান না; তিনি সফল হন। জগদীশচন্দ্র বসু সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলেন, তাই তিনি সফল হয়েছেন। এটা ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে যে-রকম সত্য, জাতিগতভাবেও একইরকম সত্য।

আপনি যখনই কোনো সমস্যার সম্মুখীন হন তখন কী করতে হবে? সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে—ঠান্ডা মাথা। যে-কোনো সমস্যায় মাথাটাকে ঠান্ডা রাখতে হয়। সমস্যা যেন আপনাকে আবেগতাড়িত না করে। সমস্যা যখন আপনাকে আবেগতাড়িত করবে, আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না।

সম্রাট জাহাঙ্গীর কেন ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন? আবেগতাড়িত হয়ে গিয়েছিলেন। আমার মেয়ে ভালো হয়ে গেছে! তার আর কোনো চিন্তা নেই। টমাস রো কেন সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলেন? ঠান্ডা মাথা, দূরপ্রসারী চিন্তা। তাই যে-কোনো সমস্যা আসুক, মাথাটাকে ঠান্ডা রাখবেন। সমস্যা থেকে নিজেকে আলাদা করে ফেলবেন। আলাদা করার পথ কিন্তু খুব সহজ। সমস্যাটা নিজের মনে না করে অন্যের মনে করবেন। যে মুহূর্তে আপনি মনে করতে পারলেন যে, সমস্যাটা আমার না; সমস্যাটা অমুকের। আমি তার শুভাকাঙ্ক্ষী, তার কল্যাণকামী। তখন আমি কী করতাম? আচ্ছা, কেউ যদি আমার কাছে পরামর্শ নিতে আসত, তাকে কী বলতাম? দেখবেন, আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন। তখন সমস্যাটা সমাধানের প্রক্রিয়ায় ঢুকে যাবে।

নিজেকে দেখা সবচেয়ে কঠিন। নিজেকে দেখতে হলে সমস্যা থেকে নিজেকে আলাদা করে ফেলবেন। তখন বিষয়টি আপনার সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আর মাথা ঠান্ডা রাখার জন্যে প্রয়োজন মেডিটেশন। আর আরো যদি জানতে চান, আমার পলিসি ফলো করবেন। কোনো সমস্যা এলেই আনন্দিত হবেন যে, একটা কিছু পাওয়া গেছে।

সমস্যা হচ্ছে একটা পিঠা অথবা বার্থডে কেক-এর মতো। পেলে সবাই খুশি হন। আহ! বার্থডে কেক! কেউ নেই, একা আমাকে খেতে হবে।

সমস্যার সময় আপনি কাউকে পাশে পাবেন না—নির্মম সত্য হচ্ছে এটা। সান্ত্বনা দেবে কিন্তু আপনার সমস্যা কেউ ঘাড়ে নিতে আসবে না। এই কেক একাই খেতে হবে।

একটা আস্ত কেক যদি মুখে দেন তো কী হবে? তাই প্রথমে কেকটাকে টুকরা টুকরা করতে হবে। অর্থাৎ সমস্যাটাকে বিশ্লেষণ করতে হবে। পার্ট পার্ট করে ফেলতে হবে। তারপরে একটুকরা, একটুকরা করে খেতে হবে। দেখবেন যে, সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।

নিজের কাজ নিজেকে করতে হবে। সবসময় স্রষ্টার সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে; যে, আমি তো সব দেখছি না, কিন্তু তুমি সব দেখছ। আমি তো এটা টুকরা টুকরা করে খেতে চাই। তুমি টুকরা করার ব্যাপারে আমাকে একটু সহযোগিতা করো। এটা যেন হজম করতে পারি। হজম শক্তি বাড়িয়ে দাও।

এই মাথা ঠান্ডা রাখার জন্যে কী করতে হবে? শিথিলায়ন করতে হবে। অর্থাৎ নিয়মিত মেডিটেশন করতে হবে। শিথিলায়ন হচ্ছে সকল মেডিটেশনের 'মা মেডিটেশন'। মাকে না ধরলে মেয়েকে পাবেন না। অনেকে আছে যে, বিয়ে করবে মেয়েকে, খাতির করে মায়ের সাথে। যদিও বাঙালি মেয়ের মাকে রাজি করানো হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন কাজ। কারণ মায়েরা মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে খুব খুঁতখুঁতে। মা যদি রাজি হয়ে যায়, তাহলে সম্ভাবনা হচ্ছে—মেয়েও রাজি হবে। তখন তো দুজনে মিলে ... পাত্রও রাজি করাচ্ছে, মা-ও রাজি করাচ্ছেন। ডবল অ্যাকশন।

তো সব মেডিটেশনের মা মেডিটেশন হচ্ছে শিথিলায়ন। তাই মাথা ঠান্ডা রাখার জন্যে শিথিলায়ন চর্চা করবেন। তাহলে নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারবেন। নিজের সমস্যা সমাধানের উদ্যোগও নিজে নিতে পারবেন।

সাদাকায়ন : ২৯ নভেম্বর ২০১৯; কোয়ান্টামম

সঙ্ঘবদ্ধ দানে জীবন হবে বরকতময়

আজকে সাদাকায়নে আসতে পেরে এবং আপনাদের সবাইকে এখানে দেখে আমার খুব ভালো লাগছে। ছোটদের ও তরুণদের দেখলে, আমার সবসময়ই ভালো লাগে। আমার আলোচনায় উদ্দীপনা বেড়ে যায়, আমি অনুপ্রাণিত হই।

আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে, *সঙ্ঘবদ্ধ দানে জীবন হবে বরকতময়*। আসলে দান কীভাবে জীবনকে বরকতময় করে, সেটা আমরা আমাদের কোয়ান্টামে সাফল্যের যে পঞ্চসূত্র সেখানে পরিষ্কারভাবে বলেছি। কোয়ান্টাম কণিকা যারা পড়েছেন, সেখানে সাফল্যের পঞ্চসূত্র রয়েছে। পঞ্চসূত্রে আমরা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছি। আমাদের ধর্মীয় শিক্ষক যারা, ধর্মগুরু যারা, তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা বলেছি যে,

১. দান উপার্জনকে শুদ্ধ করে।
২. দান পাপমোচন করে ও অন্তরে তৃপ্তি প্রদান করে।
৩. দান বালা-মুসিবত ও রোগব্যাধি দূর করে।
৪. দান ভয়ভীতি, টেনশন-পেরেশানি ও দুঃখকষ্ট দূর করে।
৫. দান দারিদ্র্য বিমোচন করে, সম্পদে অফুরন্ত বরকত আনে।

আপনি অনেক অর্থ উপার্জন করতে পারেন কিন্তু যদি মামলা-মোকদ্দমা লেগে থাকে, অসুখ-বিসুখ থাকে, তাহলে আপনি উপার্জন করলেন কষ্ট করে, আপনার টাকাগুলো খেল ওষুধ কোম্পানি। উকিলের পেছনে সব টাকা ব্যয় হয়ে গেল। তাহলে কী হলো? আপনার উপার্জনে বরকত থাকল না।

দান উপার্জনকে যেমন শুদ্ধ করে, তেমনি বালা-মুসিবত দূর করে, পাপমোচন করে এবং উপার্জনে বরকত দেয়। এজন্যে নিয়মিত দান করা

প্রয়োজন। আমাদের সবাইকে দাতা হতে হবে। পবিত্র কোরআন শরীফে বলা হয়েছে, দান হচ্ছে ভয় এবং পেরেশানি মুক্তির পথ। দান করলে ভয় থাকে না, পেরেশানি থাকে না।

সূরা বাকারার ২৭৪ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, 'নিশ্চয়ই যারা তাদের উপার্জন থেকে রাতে বা দিনে, প্রকাশ্যে বা গোপনে, সচ্ছল বা অসচ্ছল অবস্থায় দান করে, তাদের জন্যে তাদের প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোনো ভয় বা পেরেশানি থাকবে না।'

তাহলে দান করলে পরম করুণাময় ভয় এবং পেরেশানি থেকে মুক্ত করে দেন। যে দান করে তার কখনো কোনো ভয় থাকে না। সে নির্ভয়ে নির্ভাবনায় চলতে পারে। এই দানের কথা প্রত্যেক ধর্মীয় পুরুষই বলেছেন, প্রত্যেক ধর্মের মহামানবেরা বলেছেন।

পবিত্র ঋগ্‌বেদে বলা হয়েছে, 'নিঃশর্ত দানের জন্যে রয়েছে চমৎকার পুরস্কার। তারা লাভ করে আশীর্বাদধন্য দীর্ঘজীবন ও অমরত্ব।' *[১.১২৫.৬]*

পবিত্র বাইবেলে বলা হয়েছে, 'অভাবীদের সাহায্য করো। ঈশ্বরের সন্তুষ্টিমূলক কাজে অগ্রগামী থাকো।' *[রোমীয় ১২:৯-১৩]*

মহামতি বুদ্ধ বলেছেন, 'দানের অনন্ত কল্যাণ সম্পর্কে আমি যা জানি, তা মানুষ যদি জানত তাহলে কাউকে না দিয়ে সে অন্ন গ্রহণ করত না।' *[ইতিবুত্তক : ২৬]*

অর্থাৎ সকল ধর্মগ্রন্থেই দানকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে কল্যাণের জন্যে এবং উপকারের জন্যে।

যে-কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে—আমি দিয়ে দিলেই তো কাজ হয়ে গেল। সঙ্ঘবদ্ধভাবে দান কেন করতে হবে? আমি তো দিলাম, দাতা হয়ে গেলাম! ঠিক আছে—আপনি দিলে 'দাতা' হয়ে গেলেন। কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধভাবে দান করে যে অনন্ত কল্যাণ পেতে পারতেন, সেই অনন্ত কল্যাণের অল্প কিছু হয়তো আপনি পাবেন। অনন্ত কল্যাণ থেকে তখন আপনি কিছুটা হলেও বঞ্চিত হবেন, যদি বিচ্ছিন্নভাবে বা একা একা দান করেন।

যে-রকম কেউ কেউ অনেক দান করতে পারেন, তাদের অবস্থা একরকম। কিন্তু যারা অল্প অল্প দান করেন, যেমন : আমরা—আমরা অনেক দান করতে পারি না। আমরা কী করি? অল্প অল্প দান করি। যাদেরকে আমরা ধনী ভাবি, বড়লোক ভাবি, তারা আসলে দেয় সবচেয়ে কম। তারা অধিকাংশই হচ্ছে কঞ্জুস। কঞ্জুস বোঝেন তো! কৃপণ। তারা আসলে গরিব। তাদের আত্মাটা খুব ছোট। তাদের আল্লাহ তায়ালা অনেক টাকা দিয়েছেন

কিন্তু তারা তাদের মনটা বড় করতে পারে নি। তারা দেয় খুব কম। আমাদের মতন সাধারণ মানুষ যারা, আমরা আসলে দান করি বেশি। কিন্তু অধিকাংশ সাধারণ মানুষের দান বড় কাজে লাগে না।

আপনার মনে হতে পারে বা কেউ আপনাকে বলতে পারে—দিলেই তো হলো, সঙ্ঘবদ্ধভাবে কেন দিতে হবে? এই সঙ্ঘবদ্ধভাবে দেয়ার বিশেষত্ব বা উপকারটা কী? দেয়ার কারণটা কী? কারণটা কিন্তু খুব সহজ। বিচ্ছিন্ন যে দান, এই দান কখনো স্থায়িত্ব পায় না।

আমি বেশ কয়েকজন প্রফেসরের কথা জানি, তারা গ্রামে বিশাল হাসপাতাল করেছেন। এখন চিন্তায় আছেন—তিনি মারা গেলে এই হাসপাতালের কী অবস্থা হবে? কারণ হাসপাতাল দেখার জন্যে, চালানোর জন্যে দানের যে প্রবাহ, তিনি মারা গেলে তিনিও নাই, টাকাও নাই। দানের প্রবাহ থাকবে না। কিছুদিন পরে হাসপাতালের বিল্ডিংটা পরিত্যক্ত হয়ে যাবে। তারপরে সেটা বদমায়েশদের আখড়া হবে। কারণ পরিত্যক্ত বাড়ি পেলে ওখানে কারা জড়ো হয়? ইয়াবাখোর অথবা এরকম আরো মাদকসেবীরা।

কী হলো? করেছিলেন ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে কিন্তু স্থায়ী হলো না। কারণ সেটা দেখভালের জন্যে দানের প্রবাহ দরকার, লোকবল দরকার, যা তার নেই। তিনি শেষ, তার সাথে সাথে সব শেষ।

একজন বললেন, আমি ৫ জন এতিমকে লালন করছি। ছোট্ট এতিমখানা করে ৫ জন এতিমের খাওয়াদাওয়াসহ সমস্ত ব্যবস্থা করতে লাগলেন তিনি। ওরা একটু বড় হলো। কেউ ফাইভে, কেউ সিক্সে, সেভেনে, এইটে, নাইনে উঠেছে। এর মধ্যে তিনি মারা গেলেন। তো এতিমখানার কী হলো? যেহেতু তার একার টাকা দিয়ে শুরু হয়েছিল, তাই সেটি বন্ধ হয়ে গেল। যে ফাইভ পর্যন্ত পড়েছিল, তার ফাইভে পড়েই শেষ। যে সেভেনে ছিল, তার সেভেনে শেষ। যে নাইনে ছিল, নাইনে শেষ। এখন এরা না ঠিকঠাকভাবে পড়াশোনা করতে পারল, না ক্ষেত-খামারি করতে পারল। কোনোটারই উপযুক্ত সে হলো না। কারণ উদ্যোক্তা একা ছিলেন। তিনি তার উপার্জন থেকে করেছেন। তিনি নাই, এতিমখানাও নাই। অর্থাৎ একা কেউ যখন সেবামূলক কাজ করে, সে কাজ স্থায়ী হয় না। তিনি মারা গেলে সাথে সাথে সব শেষ।

যেমন : নবাব ফয়জুন্নেসা। ফয়জুন্নেসার নাম কে কে শুনেছেন? যারা শুনেছেন, তারা শুধু হাত তুলবেন। এখানে আমরা অন্তত ৬০০ মানুষ আছি, তার মধ্যে ৮/১০ জন হবে, আর কিন্তু কেউ শোনেন নি। বেগম রোকেয়ার নাম কয়জন শুনেছেন? মোটামুটি সবাই শুনেছেন।

নবাব ফয়জুন্নেসা, কুমিল্লার বড় জমিদার ছিলেন। তার বাবা অনেক ধনসম্পত্তি রেখে যান এবং তিনি তার জমিদারি অনেক বিস্তৃত করেছেন। তিনি অনেক ভালো ভালো কাজ করেছেন। মহিলাদের জন্যে স্কুল করেছেন। বিভিন্ন দাতব্য কাজে দান করেছেন। বসুন্ধরা আবাসিক এবং বসুন্ধরার পাশে আরো এলাকা আছে—নাভানা, ইস্টার্ন হাউজিং, রামপুরা—এই পুরো এলাকা নবাব ফয়জুন্নেসার ছিল। ২০০০ একর। ১০০ শতাংশে এক একর। বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে শুরু করে বাড্ডা—এই পুরো এলাকার ২০০০ একর জমি শিক্ষার জন্যে নবাব ফয়জুন্নেসা ওয়াকফ করে গিয়েছিলেন।

কিন্তু যেহেতু তার কোনো সন্তান ছিল না, তিনি যাকে মোতাওয়াল্লি করেছেন, সেই মোতাওয়াল্লি শুধু দলিল সাইন করেছেন, আর বিক্রি করেছেন। সাইন করেছেন, বিক্রি করেছেন। ওই এলাকায় এখন এক শতাংশ জমির দাম হচ্ছে ১ থেকে ৫ কোটি টাকা। এক শতাংশ জমি যদি ১ কোটি টাকাও হয়, তাহলে ২০০০ একর মানে ২ লক্ষ শতাংশ। তার মানে ২ লক্ষ কোটি টাকা হচ্ছে তার জায়গার দাম। কিন্তু কিচ্ছু নেই!

কেন নেই? কারণ উনি একা ছিলেন। সম্পত্তি ছিল, দান করেছেন। আর তার মোতাওয়াল্লি 'কোম্পানিকা মাল দরিয়ামে ডাল' ভেবে অল্প অল্প করে সব বিক্রি করে দিয়েছে। কিচ্ছু নেই। এত সম্পত্তি দান করার পরও আপনাদের মধ্যে মাত্র ৮/১০ জন নবাব ফয়জুন্নেসার নাম শুনেছেন।

বেগম রোকেয়ার জন্ম পায়রাবন্দে। তিনি জমিদার পরিবারের মহিলা। তার কোনো সম্পত্তি ছিল না। তখনকার দিনে মুসলমান মহিলাদের কোনো সুযোগ ছিল না লেখাপড়ার। আরবি-ফারসি ভাষা তিনি বাসায় শিখেছিলেন। তার বড় ভাই ছিলেন শিক্ষিত ও জ্ঞানী। রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ত, মোমবাতি জ্বালিয়ে বড় ভাই রোকেয়াকে বাংলা ও ইংরেজি পড়াতেন।

রোকেয়া যখন কিশোরী হয়ে উঠলেন, তার বিয়ের প্রস্তাবের কোনো অভাব ছিল না। এখন তো ১৮ বছরের নিচে মেয়েদের আইনগতভাবে বিয়ে হয় না। তখন ৯/ ১০/ ১১/ ১২ বছর হলে বিয়ে হয়ে যেত। তার অনেক বিয়ের প্রস্তাব এসেছে কিন্তু তাকে তার ভাই এমন একজনের সাথে বিয়ে দিলেন, যিনি জ্ঞান-অনুরাগী। যিনি বেগম রোকেয়াকে পড়াশোনা করতে ও জ্ঞান অর্জনে সহযোগিতা করবেন।

সাখাওয়াত হোসেন উর্দুভাষী এবং বিপত্নীক ছিলেন। বেগম রোকেয়ার সাথে তার বয়সের ব্যবধান ছিল ২০ বছরের। তিনি রোকেয়াকে লেখাপড়ার সুযোগ দিয়েছেন। নিজে তাকে ইংরেজি পড়িয়েছেন।

স্বামী সাখাওয়াত মারা যাওয়ার সময় বেগম রোকেয়ার জন্যে কিছু টাকা রেখে গিয়েছিলেন। সে টাকায় বিহারের ভাগলপুরে বেগম রোকেয়া একটা স্কুল করেন। একটা বেঞ্চ। পাঁচ জন ছাত্রী।

লামার কোয়ান্টামমে যখন আমরা স্কুল শুরু করেছিলাম, তখন আমাদেরও তিন রুমের টিনের ঘর, একটা বেঞ্চ আর সাতটি শিশু-ছাত্র ছিল। সেই সাত জনের একজন আজকের ইঞ্জিনিয়ার থংইয়া।

তখনকার দিনে মুসলমান অভিজাত পরিবারগুলো মহিলাদের শিক্ষার জন্যে কোনো ব্যবস্থা করে নি। তারা বলত, শিক্ষিত হলে সব বেগানা হয়ে যাবে। বেগম রোকেয়া বোরকা পরে বাড়ি বাড়ি যেতেন ছাত্রী জোগাড় করার জন্যে। অভিজাত কারো বাড়ি গেলে বাড়ির মহিলারা, পুরুষরা দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলত, আমাদের বাড়িতে আপনি আসবেন না।

অবশেষে ভাগলপুরের স্কুল বন্ধ হয়ে গেল।

রোকেয়া স্বামীর দেয়া ৩০ হাজার টাকা সম্বল করে ভাগলপুর থেকে কলকাতা চলে এলেন। সেখানে তার আত্মীয়স্বজন কেউ ছিল না। দেখলেন যে, কলকাতায় তিনি একা কিছু করতে পারবেন না। বাড়ি বাড়ি গিয়ে মহিলাদের সাথে যোগাযোগ করে তিনি 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' নামে মুসলিম মহিলা সমিতি করলেন। তাদের নিয়ে একটা স্কুল শুরু করলেন।

দুইটা বেঞ্চ। এবার ছাত্রী হলো আট জন। তখনকার দিনে মহিলারা প্রকাশ্যে মুখমণ্ডল দেখিয়ে কথা বলতে পারত না। এজন্যে তিনি মিটিং করতেন পর্দার আড়াল থেকে। অর্থাৎ মিটিং হতো। যদি পুরুষ থাকত, তাহলে মাঝখানে পর্দা দেয়া থাকত।

তার বাইরে কাজ করার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। কিন্তু তার স্কুলে মেয়েরা শিক্ষিত হওয়া শুরু করল। তারাই বড় হয়ে পরবর্তী সময়ে মহিলা সমিতি করলেন। সেটি এখন মহিলা সমিতি, বেইলি রোড। এখন তো মহিলা সমিতির দোর্দণ্ডপ্রতাপ।

বেগম রোকেয়া সেই সময়ে *সুলতানার স্বপ্ন* দেখেছেন—মেয়েরা রাজত্ব করছে, নারী রাজত্ব। একদিন তিনি স্বপ্নে যা দেখেছিলেন, এখন সেটা বাস্তব।

রোকেয়া মারা যান রাত্রিবেলা। তখন তিনি লিখছিলেন। সাধারণত সারাদিন কাজ করে রাতে লিখতেন। টেবিলে বসে লিখছিলেন এবং লিখতে লিখতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার শেষ এবং অসমাপ্ত লেখাটির নাম ছিল *নারী অধিকার*।

বেগম রোকেয়া কিন্তু কোনো জায়গা সম্পত্তি রেখে যান নি। রোকেয়া কী

রেখে গিয়েছিলেন? সঙ্ঘ রেখে গিয়েছিলেন। মহিলা সমিতি। এই মহিলা সমিতি পরবর্তী সময়ে এদেশে মহিলাদের শিক্ষার ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। শিক্ষিত মহিলারা সবাই ওই মহিলা সমিতির তত্ত্বাবধানে এবং মহিলা সমিতির কাজের মধ্য দিয়েই এসেছেন।

নবাব ফয়জুন্নেসার দিয়ে যাওয়া এত এত সম্পত্তি, মানুষ তা লুটেপুটে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু বেগম রোকেয়া কোনো সম্পত্তি দিয়ে যান নি। দুজনই ভালো কাজ করেছেন। আর তা হচ্ছে—নারীকে দাঁড়াতে হবে। অথচ আজ নবাব ফয়জুন্নেসার নাম আপনারা কয়েকজন জানেন। কিন্তু বেগম রোকেয়ার নাম? আপনারা সবাই জানেন। এটাই হচ্ছে সঙ্ঘের বিশেষত্ব।

যখন দানটা সঙ্ঘবদ্ধ হয় তখন কী হয়? আপনি মারা যাওয়ার পরেও সেই দান এবং সেই কাজ চলতে থাকবে। যেভাবে মহিলা সমিতি চলছে। মহিলা সমিতির সমস্ত ভালো কাজ যেভাবে চলছে, সেভাবেই চলতে থাকবে।

এই কারণেই যত নবী-রসুল, যত মহামানবেরা এসেছেন, যত সফল মানুষ এসেছেন, তারা সবাই সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করেছেন। রসুলুল্লাহ (স) সঙ্ঘকে গুরুত্ব দিয়েছেন, সঙ্ঘবদ্ধ কাজকে গুরুত্ব দিয়েছেন। সঙ্ঘবদ্ধ দানকে বলেছেন ৭০ গুণ বেশি সওয়াবের। এমনি দান করলে যে সওয়াব হবে, তার চেয়ে ৭০ গুণ সওয়াব হবে সঙ্ঘে দান করলে। বুদ্ধমন্ত্রের তৃতীয় পয়েন্টটা কী? সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি অর্থাৎ সঙ্ঘের পথে চলতে হবে।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র কী করেছেন? সৎসঙ্গ গঠন করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ কী করেছেন? রামকৃষ্ণ মিশন করেছেন। আমাদের বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু—তিনি বসু বিজ্ঞান মন্দির (Bose Institute) করেছেন। তারা সবাই চলে গেছেন, কিন্তু তাদের সঙ্ঘ টিকে আছে। সঙ্ঘ টিকে থাকার ফলে ভালো কাজও টিকে আছে। এজন্যে আমরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করছি।

সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করলে কাজটা স্থায়ী হয়। যিনি সঙ্ঘ গড়লেন, তিনি চলে যাবেন কিন্তু তার জায়গায় তার উত্তরসূরি আসবে। তারপর তিনিও চলে যাবেন, তার উত্তরসূরি আসবে। এভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী চলতে থাকবে। আর যদি সঙ্ঘবদ্ধভাবে করা না হয়, একটা ভালো কাজ সেইখানেই শেষ!

আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ দানের—বরকতায়ন কার্যক্রমের ফোল্ডারটা সম্ভব হলে আপনারা সবাই পড়ে নেবেন। পড়লে বুঝবেন যে, সঙ্ঘবদ্ধ দান কেন দরকার, দান দিয়ে কী হতে পারে এবং সঙ্ঘবদ্ধ দানে আমরা কেন আল্লাহর রহমতে এত বাড়ছি? এত প্রবৃদ্ধি কেন আমাদের?

যেমন : গত বছর (২০১৮ সাল) আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ দানে মাটির ব্যাংক থেকে ৩০ কোটি টাকা এসেছে। কেউ ৫০ টাকা, কেউ ৩০ টাকা, কেউ ৭০ টাকা, কেউ ৫০০ টাকা, কেউ ৫,০০০ টাকা, কেউ লাখ টাকাও দিয়েছেন।

এখন, যিনি লাখ টাকা দান করছেন, তিনি সঙ্ঘবদ্ধ দানের ফলে সওয়াব পাচ্ছেন দানের ৭০ গুণ। একইভাবে যিনি ৫০ টাকা দান করছেন, তিনিও সঙ্ঘবদ্ধ দানের ফলে সওয়াব পাচ্ছেন দানের ৭০ গুণ। সেইসাথে দুজনই অতিরিক্ত হিসেবে পুরো ৩০ কোটি টাকা দানের সওয়াবও পাচ্ছেন।

আর এটা তো একবছরের দান নয়, বছর বছর ...।

ধরুন, একবছরে যদি ৩০ কোটি টাকা হয়, ১০ বছরে কত হবে? ৩০০ কোটি টাকা। ২০ বছরে কত হবে? ৬০০ কোটি টাকা। ১০০ বছরে কত হবে? ৩,০০০ কোটি টাকা। তো দাতা যদি ৫০ টাকা দান করার পরেই মারা যান ... আয়ু যার যতদিন আছে, ততদিনই তো বাঁচবে। কিন্তু তিনি এই ৩,০০০ কোটি টাকা, অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত এই কাজটা জারি থাকবে, চলতে থাকবে, যত মানুষ দান করবে, সমস্ত সওয়াব সকল দাতার পাশাপাশি তিনিও পেতে থাকবেন। এজন্যে সঙ্ঘবদ্ধ দানের এত উপকারিতা।

আমরা যত ভালো কাজ করছি, সৎকর্ম করছি, সবই করছি সঙ্ঘবদ্ধভাবে। কোয়ান্টাম একটা সৎসঙ্ঘ। আমাদের সবার প্রতিষ্ঠান। আজকে আমি চেয়ারম্যান। একটা সময় আসবে, আমি থাকব না। কিন্তু চেয়ার কি খালি থাকবে? আরেকজন চেয়ারম্যান আসবেন। তারপর তিনি থাকবেন না। আরেকজন চেয়ারম্যান আসবেন।

আমার তো খুব ভালো লাগে যে, আমি চার প্রজন্মের সাথে কাজ করেছি। এর মধ্যে দেখি—আমার সহকর্মীদের মধ্যে একজন, তার দাদীর বাবার সাথে আমি কাজ করেছি। তার দাদার সাথে কাজ করেছি। তার বাবার সাথে কাজ করেছি। এখন সে এসে আমার সাথে কাজ করছে। চার প্রজন্ম! এই যে আপনারা আছেন, আপনারা কী করবেন? আপনাদের বাবা-চাচারা যখন চলে যাবেন, তখন আপনারা নেতৃত্ব দেবেন ফাউন্ডেশনের। আপনারা চলে গেলে কী হবে? সামনে যে ছোটরা বসে আছে, এরা নেতৃত্ব দেবে। এরা চলে গেলে এদের ছেলেমেয়েরা নেতৃত্ব দেবে। অর্থাৎ সঙ্ঘ সবসময় চলমান।

আর্থিক দান একটা বড় দান। এটা ঠিক আছে। কিন্তু আমরা এই সঙ্ঘে যে যতটা মেহনত করছি, যতটা কাজ করছি ... ধরুন, আপনি এই স্থাপনায় একটা ইট লাগিয়েছেন। আরো ১০ বছর পরে অনেক টাকা আসবে। তখন

যারা আসবে, দেখা যাবে—এটার ওপর দিয়ে মার্বেল পাথর লাগিয়েছে। ২০ বছর পর দেখা যাবে—আরো অনেক কিছু করা হয়েছে। পুরো মেঝে কার্পেটিং করা হয়েছে ইত্যাদি।

এখন যত খরচ হোক না কেন, মার্বেল করুক, কাঠ করুক, এই ইটটা যিনি লাগিয়েছেন, যিনি এটার মধ্যে মেহনত দিয়েছেন, পরিশ্রম দিয়েছেন, তার সওয়াবটা কী হবে? তার সওয়াব কিন্তু বাড়তে থাকবে। এটার সাথে যিনি যতটুকু সংযুক্ত হবেন, যিনি যতটুকু কাজ করবেন, তার সওয়াবের পরিমাণ তত বাড়তে থাকবে। অর্থাৎ সৎসঙ্ঘে, কোয়ান্টামে যিনি যতটুকু কাজ করছেন, আরো ১০০ বছর, ২০০ বছর, হাজার বছর ... তার সওয়াব জারি অর্থাৎ চলমান থাকবে।

ধরুন, রসুলুল্লাহ (স) মদিনাতে যে মসজিদ তৈরি করেছিলেন—মসজিদে নববী, সেটি ছিল খেজুর গাছের খুঁটি আর খেজুর পাতার চালের তৈরি। আজকে তো সব মার্বেল পাথর। কিন্তু যিনি খেজুর গাছ দিয়ে এই খুঁটিটা বানিয়েছিলেন, তিনি এই সমস্ত কিছুরও সওয়াব পাচ্ছেন।

এটা হচ্ছে সঙ্ঘের ফজিলত, সঙ্ঘের উপকারিতা। যে কারণে বুদ্ধমন্ত্র—সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি; সঙ্ঘের পথে চলতে হবে। রসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। সবাই মিলে যখন কাজ করবেন তখন সবার পুণ্যের পরিমাণ, সওয়াবের পরিমাণ বাড়তে থাকবে। সমস্ত ধর্ম এই কারণে সঙ্ঘকে এত গুরুত্ব দিয়েছে; যে, সবাই মিলে কাজ করো।

বরকতায়নের এই ফোল্ডারটা দেখলেই বুঝতে পারবেন যে, কসমো স্কুলের প্রথম বছরের যে সাতটি শিশু, আজ তাদের একজন ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে। আর এবছর সম্ভবত ২৫-৩০ জন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছে। এবছর খুমি সম্প্রদায় থেকে প্রথমবারের মতো দুজন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় এই সংবাদ ছেপেছে। তারা দুজনই হচ্ছে কোয়ান্টাম কসমো কলেজের ছাত্র।

আমরা সবাই মিলে এই কাজটা করেছি বলে আজ দু-হাজার ছাত্রের জন্যে সবুজায়নে ক্যাম্পাস হচ্ছে। প্রত্যেক বছর ছাত্রের সংখ্যা বাড়তে থাকবে। এরপর এখানে কলেজ হবে, টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট হবে, বিশ্ববিদ্যালয় হবে। ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে এখান থেকে বেরোবে। তো এর সওয়াব কারা পেতে থাকবে? যাদের নেতৃত্বে, অর্থায়নে এবং অংশগ্রহণে এখানে ইট গাঁথা হয়েছে। হাজার বছর ধরে যত কাজ হবে, শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যারা এ-কাজে অংশ নিয়েছে, তাদের আত্মা বা রূহ এই সওয়াব

পেতে থাকবে। এটা হচ্ছে সজ্ঞবদ্ধ কাজের ফজিলত।

দেখুন, আমরা কাজ করার ফলে কী হয়েছে? রক্তদান কার্যক্রমের মাধ্যমে ১০ লক্ষ ইউনিট রক্ত আমরা সরবরাহ করতে পেরেছি। আট হাজার ছয় শত ৫৭ জন সুবিধাবঞ্চিত মা সুস্থ সন্তান জন্ম দিয়েছেন। চিকিৎসাসেবা পেয়েছেন দুই লক্ষ ৭৬ হাজার মানুষ।

কেন সম্ভব হয়েছে? আমরা সবাই মিলে সজ্ঞবদ্ধভাবে কাজ করেছি বলে এটা সম্ভব হয়েছে। সবাই মিলে যখন দান করা হয় ... অল্প অল্প দান একত্র হয়ে অনেক বড় দানে রূপান্তরিত হয়। তখন কী হচ্ছে? যারা দান করছেন, তাদের সওয়াবের পরিমাণ, তাদের পুণ্যের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। যতদিন এই কাজ চলতে থাকবে, সদকায়ে জারিয়া হিসেবে যিনি যতটুকু দিয়েছেন, সেই দানের সাথে সাথে সমস্ত দানের কল্যাণ তিনি পেতে থাকবেন। এর ফলে আমাদের জীবন বরকতময় হয়ে উঠবে।

ব্যক্তিগতভাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে দান করাটা কী? আমরা একটা উদাহরণ ব্যবহার করতে পারি—মরুভূমিতে কেউ এক বালতি পানি ঢালল। এক বালতি পানি কতটুকু যেতে পারে? কিছুক্ষণ পর কী হবে? শুকিয়ে যাবে। কিন্তু আমরা সবাই মিলে যদি এক বালতি করে পানি ঢালা শুরু করি, তাহলে কী হবে? ঝর্নার সৃষ্টি হবে। এই ঝর্নার প্রবাহ নদী হয়ে সমুদ্র পর্যন্ত চলে যাবে। একইভাবে আমরা সবাই মিলে নিয়মিতভাবে যেহেতু দান করছি, এই সজ্ঞবদ্ধ দান নদী হয়ে সমুদ্রের মতো বিশাল আকার ধারণ করবে।

আর একা একজনের এক বালতি পানি মরুভূমিতে যদি ঢালা হয়, কী হবে? বলেন? শুকিয়ে যাবে। তো একা দান করা আর সজ্ঞবদ্ধভাবে দান করার মধ্যে এটা হচ্ছে তফাত।

আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে সত্য জ্ঞান দিয়েছেন। আমরা দানের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে ও অনুভব করতে পেরেছি যে, দান কীভাবে আমাদের কল্যাণ করে। আমরা আল্লাহর কাছে একটাই প্রার্থনা করি—তুমি দাতার তালিকায় আমাদের নাম লিখে তারপর আমাদেরকে পৃথিবী থেকে নিয়ে যেও। দানের যে অনন্ত কল্যাণ, সেই অনন্ত কল্যাণ তুমি আমাদেরকে ইহকালে দিও, পরকালেও দিও।

আমরা যখন নিজের জন্যে ব্যয়ের নামে ফুটানি করি, তা তো অপচয় হয়ে শেষ হয়ে গেল। আপনি বাড়িঘর করে রেখে গেলেন। বাড়িঘর কিন্তু আপনার বিনিয়োগ হলো না। এটা ব্যয় হয়ে গেল। কারণ এটা আপনি নিয়ে যেতে পারবেন না।

অনেকে আমাকে বলে, আপনি বাড়ি করলেন না, ঘর করলেন না। ঢাকা শহরে আপনার তো ৩/৪টা বাড়ি থাকা উচিত ছিল। আমি বলি, কী করব বাড়ি করে? বাড়ি তো আমাকে রেখে যেতে হবে। আমি তো বিনিয়োগ করছি—দূরপ্রসারী বিনিয়োগ।

দান হচ্ছে একজন মানুষের জীবনের সবচেয়ে দূরপ্রসারী বিনিয়োগ। যেটার উপকার লাভ পুরস্কার সে ইহকালে পাবে এবং পরকালেও পাবে। পরম প্রভু দানের ইহকালীন পুরস্কার তাৎক্ষণিকভাবে বা যথাযথ সময়ে যেমন দেন, তেমনি পরকালের জন্যে আরো বহুগুণ প্রতিদান সঞ্চিত রাখেন। কারণ পরকাল হচ্ছে অনন্তকাল। ইহকাল হচ্ছে—আপনার আয়ু ৬০ বছর/ ৭০/ ৮০/ ১০০/ ১২০ বছর/ ১৫০ বছর ... তারপর শেষ! যা আপনাকে দেয়া হলো—শেষ। কিন্তু যেটা রেখে দেয়া হলো পরকালের জন্যে? পরকাল তো অনন্ত জীবন! অনন্ত জীবনের সুখের জন্যে আমরা বিনিয়োগ করছি।

অন্যদিকে—নিজের জন্যে আপনি যা ব্যয় করলেন, তা খরচ হয়ে গেল। যত দামি কাপড় কিনলেন, খরচ হয়ে গেল। হয়তো ৫,০০০ টাকা দিয়ে আপনি পোশাক কিনতে চাইবেন, যদি সামর্থ্য থাকে। সে পোশাক কয়েকদিন পরার পর পুরনো এবং ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যাবে। আবার আপনি ৩,০০০ টাকা পোশাকের পেছনে ব্যয় করলেন এবং ২,০০০ টাকা দান করলেন। এটা বিনিয়োগ হলো ইহকাল ও পরকালের কল্যাণে। বুদ্ধিমান মানুষ দূরপ্রসারী বিনিয়োগ করে। যার বুদ্ধি কম, সে 'খাও-দাও-ফুর্তি করো', তারপর শেষ হয়ে যাও ...। কারণ তার টাকা এখানেই শেষ।

আর যিনি দান করলেন, তিনি তার দানের পুরস্কার দুইকালেই পাবেন। দানটা যখন সঙ্ঘবদ্ধ হবে, তখন এই কল্যাণের কোনো শেষ নেই। আপনার অনন্ত কল্যাণ হবে। জীবন বরকতময় হবে।

সাদাকায়ন : ২০ ডিসেম্বর ২০১৯; কোয়ান্টামম

সংকট উত্তরণে মেডিটেশন

আজকের সাদাকায়নে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। বিশেষভাবে আমাদের সাংবাদিক সদস্য এবং তাদের পরিবার, যারা সুদূর ঢাকা থেকে সারারাত যাত্রা করে এখানে এসেছেন। স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের কোয়ান্টাদের, আমার সহকর্মী ও প্রতিবেশীদের, যারা আস্তে আস্তে ধ্যানের সাথে যুক্ত হচ্ছেন।

কোয়ান্টামমে শুক্রবার যখন আমি থাকি, সাদাকায়নে অংশগ্রহণটা আমার জন্যে খুব আনন্দের একটি বিষয়ে পরিণত হয়। খুব ভালো লাগে যখন দেখি যে, ২০ বছর আগে যা ছিল একটা পরিত্যক্ত 'ক্যাষ্টা' জায়গা, যেখানে ছন পর্যন্ত হতো না, চারপাশে লোকালয়ের কোনো গন্ধ ছিল না, সেখানে আজ প্রকৃতির মাঝে এরকম উন্মুক্ত মঞ্চে এত নারী ও পুরুষ—সবার সামনে দাঁড়িয়ে ধ্যানের কথা বলার সুযোগ পাচ্ছি। তখন পরম করুণাময়ের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মাথা নত হয়ে আসে।

জীবন যে-রকম স্রষ্টার দান, জীবনের সকল আনন্দও স্রষ্টারই দান। স্রষ্টার দান প্রকৃতিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। স্রষ্টার দান চোখ মেলে দেখতে হয় এবং তা সংগ্রহ করে জীবনকে সুন্দর করার কাজে ব্যবহার করতে হয়।

পরম করুণাময় মানুষকে যত কিছু দান করেছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় দান হচ্ছে জ্ঞান। আর সত্যিকারের জ্ঞানের পথ হচ্ছে ধ্যান। একজন মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত স্থির না হচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মনিমগ্ন না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে যথার্থ জ্ঞানী হতে পারে না। জীবনের সমস্যা, জীবনের সংকটকে আস্থার সাথে কাটিয়ে উঠতে পারে না।

আজকের সাদাকায়নে আলোচ্য বিষয় : *সংকট উত্তরণে মেডিটেশন*। সারাদেশে দুই শতাধিক ভেন্যুতে সাদাকায়ন হচ্ছে এই একই বিষয়ে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জীবনে যত সমস্যা ও সংকট, তা সৃষ্টি হয় কিন্তু আমাদের দ্বারাই। সমস্যা ছাড়া কোনো জীবন নেই। জীবন মানেই হচ্ছে—একটার পর একটা ক্রমাগত সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ আসবে আর আপনি তা ফেইস করবেন। যেদিন সমস্যা শেষ হয়ে যাবে, বুঝবেন যে, ইউ আর নো মোর। পৃথিবীতে আপনার আর প্রয়োজন নেই।

যারা প্রবীণ, হয়তো অনেকে জানেন যে, আমি একসময় অ্যাস্ট্রলজার ছিলাম। আমার কাছে মানুষ আসতই সমস্যা নিয়ে। একবার একজন এসে বললেন, আপনি আমাকে এমন একটা জায়গার সন্ধান দেন, যেখানে কোনো সমস্যা নেই। আমি সেখানেই চলে যাব। সমস্যা আমার আর ভালো লাগছে না। সমস্যা আমি আর সহ্য করতে পারছি না। তখন রাত হয়েছে। আটটা বাজে। চেম্বার বন্ধ করে আমার ওঠারও সময়। আমি ভাবলাম যে, ঠিক আছে। একটু মজা করা যাক!

সেটা সত্তরের দশকের শেষের কথা। আমি বললাম, চলুন। আপনাকে সেই জায়গায় নিয়ে যাব। আমিও যাব আপনার সাথে। আপনি যেহেতু জানেন যে, 'জীবনে কোনো সমস্যা নেই' এরকম জায়গার সন্ধান আমি জানি! তো চলুন।

তিনি খুব খুশি। তাকে নিয়ে রিকশায় উঠলাম। যেতে যেতে আজিমপুর কবরস্থানে চলে গেলাম। সেখানে নেমে তাকে নিয়ে কবরস্থানের ভেতরে হাঁটতে শুরু করলাম।

অন্ধকার রাত। কবরস্থান তো এমনিতেও সুনসান। কোনো সাড়া-শব্দ নেই। ভেতরে গিয়ে আমি বললাম, এইবার আপনি এইখানে থাকেন। এখানে কোনো সমস্যা নেই। আরো সমস্যা থাকবে না, যদি কোনো ভাঙা কবর পান। ওই কবরের মধ্যে ঢুকে যদি বসে থাকতে পারেন।

তিনি বললেন, বলেন কী! আমার তো এখনই ভয় লাগছে। আপনি কি আমাকে রেখে চলে যাবেন? আমি বললাম, আপনি সমস্যামুক্ত জায়গায় যদি থাকতে চান, তাহলে আপনাকে রেখে যাব। আর সমস্যাযুক্ত জায়গায় যদি থাকতে চান, তাহলে চলুন আমার সাথে—জীবনের পথে। কারণ জীবন যতদিন আছে, সমস্যা আসবে এন্ড ইউ হ্যাভ টু ফেইস ইট। সমস্যা থেকে

ক্রমাগত উত্তরণের নাম হচ্ছে জীবন। বলেন, এখন কোন পথে যাবেন?

তিনি বললেন, আমি আপনার সাথে যাব।

জীবন যতদিন আছে সমস্যা থাকবে। আমাদের সমস্যাটা কোথায়? আমরা সমস্যা নিয়ে চিন্তা করি বেশি। সমাধান নিয়ে চিন্তা করি কম। যার ফলে অস্থির হয়ে যাই। আপনি একটা জিনিস নিয়ে যত চিন্তা করবেন, এটা কিন্তু ডালপালা ছড়াতে থাকবে। ... আচ্ছা, কী হতে পারে? আমি রাস্তা দিয়ে যাব, যদি কোনো ছিনতাইকারী আক্রমণ করে তো কী হবে? টাকাপয়সা নিয়ে যাবে! আচ্ছা, যদি ছুরি মারে তাহলে কী হতে পারে? আমি যদি আহত হই তাহলে কী হতে পারে?

এভাবেই সমস্যা নিয়ে যত চিন্তা করবেন, সমস্যা তত বাড়তে থাকবে। সমাধান জটিল হতে থাকবে; সমস্যা ধীরে ধীরে সংকটে রূপান্তরিত হবে।

আমরা সাধারণত সমাধান নিয়ে চিন্তা করি না। চিন্তা করি সমস্যা নিয়ে। আমরা সমস্যার অংশ হয়ে যাই। সমাধানের অংশ হই না। যার ফলে আমাদের জীবন সমস্যা ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। জীবন যখন সমস্যা ভারাক্রান্ত হবে, তখন সমস্যাটা সংকটে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। সুতরাং জীবনে সংকট আসলে আমরাই সৃষ্টি করি।

আপনারা অনেকে বালিয়াড়িতে চোরাবালির কথা শুনেছেন। চর অথবা সমুদ্র তীরবর্তী বালিয়াড়িতে অনেক সময় ওপর দিয়ে বালু আর তার নিচে পানি থাকে। ওখানে বালুটা মনে হয় একেবারে সমান। কিন্তু সেই বালুর ওপরে আপনি যদি পা রাখেন তাহলে কী হয়? আস্তে আস্তে সেই বালুতে তলিয়ে যাবেন আপনি। চোরাবালিতে তলিয়ে যেতে যেতে আপনি যত অস্থির হবেন, যত হাত-পা ছুড়বেন, তত দ্রুত আরো তলিয়ে যেতে থাকবেন।

চোরাবালিতে পড়লে নড়াচড়া যত কম করবেন, আপনি তত ভেসে থাকতে পারবেন। মাথাটাকে ঠান্ডা রেখে কোনোরকমে তখন ভেসে থাকার চেষ্টা করতে হবে। নড়াচড়া যত বেশি করবেন তত আপনি ডুবে যাবেন।

এই সংকটটাই হচ্ছে চোরাবালি। সমস্যা নিয়ে যখনই বেশি চিন্তা করছেন, আপনি চোরাবালির মধ্যে ডুবে যাচ্ছেন। তাহলে আমরা দেখছি, সমস্যা সংকটে রূপান্তরিত হয় আমাদের ভুল দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। সমস্যাকে আমরা উপভোগ করতে পারি না। সমস্যাকে স্বাভাবিকভাবে নিতে পারি না।

কেন? কারণ আমরা অস্থির। এক্ষুণি সমাধান চাই। অথচ প্রত্যেকটা সমস্যা সমাধানের একটা সময়-কাল আছে। ওই কাল অতিক্রম না করা পর্যন্ত

সমাধান হবে না। যেমন : ভাইরাস যদি আক্রমণ করে, যদি জ্বর হয়, তাহলে সাধারণত তিন থেকে সাত দিন লাগে সুস্থ হতে। একেকটা রোগের নিরাময়ে একেক রকম সময়-কাল আছে।

ঠিক তেমনি—আমি চাইলেই রাতারাতি সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারব না। সমস্যা সমাধানের জন্যে সময় দিতে হবে। কারণ সমস্যাটা যেমন একদিনে আসে নি, তার সমাধানও একদিনে হবে না। আমাদের অস্থিরতাই আসলে সমস্যাকে সংকটে রূপান্তরিত করে। তাই আপনি যত ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে পারবেন, যত ডিপ্লোম্যাটিক হবেন, যত বুদ্ধি এবং কৌশল প্রয়োগ করতে পারবেন, সমস্যার সমাধান তত দ্রুত হবে।

অধিকাংশ পরিবারে কখনো না কখনো স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া হয়। এখন আপনি যদি উত্তেজিত হয়ে যান, ঝগড়াটা প্রলম্বিত হবে। আর আপনি যদি বোঝেন যে, স্ত্রী এখন উত্তেজিত। ঠিক আছে, লেট মি ওয়েট। আপনি জানেন যে, একটু পরেই তিনি শান্ত হয়ে যাবেন। তখন তাকে বলতে দিন না! বরং আরো উৎসাহিত করুন; যে, আসলে তো তোমার অনেক কষ্ট। বলো বলো বলো। আমাকে তো বলাই উচিত। আমাকে না বললে কাকে বলবে? দেখবেন যে, তার বলার আগ্রহটা কমে গেছে।

আর আপনি যখন বলবেন, অ্যাই, তুমি কী বলছ! এতদিনের সংসার! তোমার জন্যে আমি এই করলাম, এই করলাম, এই করলাম ... বাড়ি কিনে দিলাম, গাড়ি কিনে দিলাম। আর তুমি এই কথা বলছ? আপনার স্ত্রী তখন কী করবেন? আপনি যে তার জন্যে কিছুই করেন নি, সেটা প্রমাণ না করা পর্যন্ত তিনি ক্ষান্ত হবেন না।

অর্থাৎ যখনই আপনি ঠান্ডা মাথায় কুশলতার সাথে বুদ্ধি প্রয়োগ করবেন; যে, আচ্ছা, স্ত্রীকে কী বললে তিনি খুশি হবেন, তখন আপনি সমস্যাটাকে আপনার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পারবেন। সমস্যা তখন সমাধানের প্রক্রিয়ার মধ্যে ঢুকে যাবে। আর এই কাজটাই করে মেডিটেশন।

ধ্যান সম্পর্কে আমাদের এত ভুল ধারণা, অথচ ধ্যানের জন্মভূমি হচ্ছে এই বাংলা। ধ্যানের বিকাশভূমি হচ্ছে এই বাংলা। মহামতি বুদ্ধ সেই আড়াই হাজার বছর আগে ... এবং তারও আগে আমাদের মুনি-ঋষিরা যোগ এবং ধ্যানচর্চা করেছেন।

কেন করেছেন? মাথাটাকে ঠান্ডা আর শরীরটাকে ফিট রাখার জন্যে। কারণ তারা জানতেন—দেহ হচ্ছে আত্মার বাহন। দেহ হচ্ছে উপাসনালয়। আত্মাকে যদি পরমাত্মার সাথে সংযুক্ত করতে হয়, তাহলে উপাসনালয়টিকে পবিত্র করতে হবে। পরিচ্ছন্ন করতে হবে। তাহলে আত্মা প্রশান্তি পাবে। পরমাত্মার সাথে সংযুক্ত হবে। সেখান থেকেই যোগধ্যানের উদ্ভব।

যোগধ্যানের প্রক্রিয়া তারা চার হাজার-পাঁচ হাজার বছর আগে আবিষ্কার করেছেন। সেটা তারা নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করেছেন। জীবনকে সহজ এবং প্রশান্তিময় করার জন্যে এর চেয়ে ভালো কোনো প্রক্রিয়া আজ পর্যন্ত বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে পারে নি।

স্বাস্থ্যবিজ্ঞানও বলছে—ধ্যান বা মেডিটেশন এবং যোগ হচ্ছে নিজেকে শান্ত করার, ধীর ও স্থির করার, আত্মপ্রত্যয়ী ও সমমর্মী করার সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি। একটা সমস্যা সংকটে তখনই রূপান্তরিত হয়, যখন আমরা অস্থির হয়ে যাই, যখন আমাদের মধ্যে আস্থার অভাব ঘটে।

এই বাংলায় মেডিটেশনের সবচেয়ে বিস্তার ঘটেছে মহামতি বুদ্ধের সময়। বুদ্ধ ধ্যানকে বাংলার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এই ধ্যান বাংলা থেকে চীনে গেল। চীন থেকে জাপানে গেল। ইউরোপ-আমেরিকাতে এখন 'জেন' শব্দটি প্রচলিত। জাপানে ধ্যানকে জেন বলে। জেন শব্দটি বাংলার ধ্যান শব্দেরই পরিবর্তিত রূপ। ধ্যান জাপানে গিয়ে হয়ে গেল জেন। চীনে গিয়ে হয়ে গেল 'চেন'। কিন্তু মূল শব্দটি হচ্ছে ধ্যান।

মেডিটেশন কী? মেডিটেশনকে আমরা কোয়ান্টাম পরিভাষায় বলি, মনের ক্লিনিং সিস্টেম এবং মস্তিষ্কের কুলিং সিস্টেম। মাথাটাকে ঠান্ডা করা এবং মনটাকে পরিচ্ছন্ন করা, আবর্জনা মুক্ত করার নাম হচ্ছে মেডিটেশন। মেডিটেশন বলি, মোরাকাবা বলি, ধ্যান বলি—একই বিষয়। ইংরেজিতে মেডিটেশন, বাংলায় ধ্যান, আরবি-ফারসিতে মোরাকাবা-মোশাহেদা। একই বিষয়। প্রক্রিয়াগত কিছু কিছু পার্থক্য আছে। কিন্তু মূল জিনিসটা এক।

মেডিটেশন অলৌকিক কিছু না। মেডিটেশন যে-কেউ করতে পারেন। এটা পুরোটাই বিজ্ঞান। অলৌকিকত্ব এবং বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? অলৌকিক যে-কোনো কিছু যে-কোনো সময় ঘটতে পারে। অলৌকিক জিনিসের রিপিট করা যায় না। কিন্তু বিজ্ঞানকে রিপিট করা যায় যতবার খুশি। এটাই বিজ্ঞানের বিশেষত্ব।

মেডিটেশনের মূল পয়েন্ট হচ্ছে পাঁচটা। এক. দেহের স্নায়ু ও পেশিকে শিথিল করা। শিথিল করা মানে স্থির করা, ধীর করা।

আমাদের জীবনে যত নেতিবাচক আবেগ—রাগ ক্ষোভ অভিমান ঘৃণা ঈর্ষা ইত্যাদি আমাদেরকে ভুল করতে বাধ্য করে। যেমন : আপনি যখন রেগে যান, রাগারাগি শেষ হয়ে গেলে আপনি কী করেন? পরে আবার নিজেই অনুশোচনা করেন। বলেন, স্যরি ভাই/ আপা/ ভাবি, মাফ কইরা দিয়েন। তার মানেটা কী? যখনই আপনি রেগে যাচ্ছেন, মনের নেতিবাচক আবেগ যখন আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলছে। তখন আপনি এমন কাজ করছেন যার জন্যে আপনাকে অনুতপ্ত হতে হচ্ছে।

মেডিটেশনের দু-নম্বর পয়েন্ট : অস্থির মনটাকে স্থির করা।

তিন নম্বর পয়েন্ট : মনোযোগায়ন। আমাদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত থাকে। বিক্ষিপ্ত মনোযোগকে এক জায়গায় স্থির করার নাম হচ্ছে মনোযোগায়ন। মনোযোগায়ন মানে মনোযোগকে একাগ্র করা।

আজকে সারা পৃথিবী, বিশেষত ওয়েস্ট, ভার্চুয়াল ভাইরাসে (ডিজিটাল আসক্তিতে) আক্রান্ত হয়েছে। আমরা এখন আক্রান্ত হচ্ছি। ফলে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। কোনোকিছুর প্রতিই মনোযোগ নেই। মনোযোগ কীসের প্রতি নেই? নিজের প্রতিও না, অন্য কারোর প্রতিও না। মনোযোগহীনতার কারণে পাশ্চাত্যে এখন ধ্যান সবচেয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করছে।

ধ্যানের একটি পদ্ধতিকে বলা হয় মাইন্ডফুলনেস। এর মধ্যে বই বেরিয়েছে, যেখানে তারা বলছে যে, এটা একটা বিপ্লব। আর আমরা আনন্দিত; যে, আমাদের প্রাচ্য আড়াই হাজার বছর আগে এই বিপ্লব করে ফেলেছে। তোমরা এখন বিপ্লব করছ। ধ্যানের ক্ষেত্রে তোমরা আমাদের চেয়ে আড়াই হাজার বছর পেছনে পড়ে আছ। আর প্রাচ্যের ধ্যান-পদ্ধতির চেয়ে ভালো কোনো পদ্ধতি তোমরা এখনো দিতে পারো নি।

যখনই এই তিনটা পয়েন্ট—দেহের স্নায়ু-পেশি শিথিল হলো; মনটা স্থির হলো; মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হলো এক বিন্দুতে, তখনই আপনি (চার নম্বর পয়েন্ট) মস্তিষ্ককে বেশি পরিমাণে ব্যবহার করতে পারবেন। মানুষের জীবনে যত সমস্যা এসেছে, মানুষ মস্তিষ্ককে ব্যবহার করে সমাধান করেছে। যখনই মাথা ঠান্ডা রাখতে পারবেন, আপনার জীবনে যত সমস্যা আসুক, সমস্যাকে আপনি নতুন সম্ভাবনায় রূপান্তরিত করতে পারবেন। মানুষ যখনই সমস্যায়

পড়েছে, তখনই সে মস্তিষ্ককে ব্যবহার করেছে এবং সমস্যাকে জয় করেছে।

যখন মানুষ দেখল যে, সে ঘোড়ার মতো দৌড়াতে পারে না, সে কী করল? বুদ্ধি করে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল; যে, তুই দৌড়া, আমি বসে থাকি। যখন দেখল ওটাতেও অত আরাম নেই, চাকা বানাল। দুটা চারটা আটটা চাকা লাগিয়ে দিলো ঘোড়ার গাড়িতে। মানুষ দেখল যে, সে পাথর ভাঙতে পারে না। হাতুড়ি বানাল, পাথর গুঁড়া করে ফেলল। পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে সামনে, সে যেতে পারছে না। ডিনামাইট বানাল। পাহাড় গুঁড়িয়ে, সুড়ঙ্গ-পথ তৈরি করে নিল।

অর্থাৎ মানুষ তার সমস্ত সীমাবদ্ধতাকে জয় করেছে মস্তিষ্ককে ব্যবহার করে। মেডিটেশন মস্তিষ্ককে ঠান্ডা রাখে। মস্তিষ্ককে বেশি বেশি ব্যবহার করার পথ করে দেয়। যখন আপনি মস্তিষ্ককে বেশি বেশি ব্যবহার করতে পারছেন, আপনার সমস্যা নতুন সম্ভাবনায় রূপান্তরিত হচ্ছে।

যে কারণে আমরা বলি—যখন আপনি সমস্যার সাথে টেনশন বা অস্থিরতা যোগ করবেন, তখন তা সংকটে রূপান্তরিত হবে। যখন সমস্যার সাথে মেডিটেশন যোগ করবেন, এটা নতুন সম্ভাবনায় রূপান্তরিত হবে।

মেডিটেশনের পাঁচ নম্বর পয়েন্ট : মনকে স্থির করতে করতে আত্মার সাথে সংযুক্ত করা। মন যখন আত্মার সাথে সংযুক্ত হয় তখন মানুষ আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে ওঠে। এই আত্মপ্রত্যয় বা আত্মবিশ্বাস থেকে আস্থার সৃষ্টি হয়। যে-কোনো সমস্যা আসুক—আপনি যদি আত্মপ্রত্যয়ী থাকেন, যদি মাথা ঠান্ডা রাখতে পারেন, তাহলে সমস্যাকে আপনি নতুন সম্ভাবনায় রূপান্তরিত করতে পারবেন।

এজন্যেই মেডিটেশন প্রয়োজন। তাই যখনই সময়-সুযোগ পাবেন, মেডিটেশন করবেন। দুবেলা করতে পারলে খুব ভালো। দুবার যদি করতে না পারেন দিনে অন্তত একবার মেডিটেশন করবেন। সকালবেলা দিন শুরু করুন মেডিটেশন করে। মাথা ঠান্ডা থাকবে। মনটা স্থির থাকবে।

ধরুন, আপনার একটা সুপার কম্পিউটার আছে। ওখানে যে-কোনো ডাটা দিন, মুহূর্তে প্রসেস করে আপনাকে সলিউশন দিয়ে দেবে। আপনার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেবে। কিন্তু এই সুপার কম্পিউটারের কুলিং সিস্টেমটা যদি নষ্ট হয়ে যায়, সেটা কি কোনো কাজ করবে? কাজ করবে না।

ব্রেন হচ্ছে এক সুপার সুপার সুপার কম্পিউটার আর মেডিটেশন হচ্ছে

এর কুলিং সিস্টেম। এই কুলিং সিস্টেমটাকে ঠিক রাখার জন্যেই দরকার মেডিটেশন, যাতে আপনি ব্রেনকে বেশি বেশি কাজে লাগাতে পারেন।

আবার যারা আত্মিকভাবে অগ্রসর হতে চান, আত্মিকভাবে এক নতুন দিগন্তে যেতে চান, তারাও মেডিটেশনকে কাজে লাগাতে পারেন। কিন্তু আমরা যারা সংসারী, আমাদের জন্যে প্রাইমারিলি মেডিটেশন হচ্ছে এই ব্রেনটাকে বেশি পরিমাণে ব্যবহার করার প্রক্রিয়া। যাতে আমি আস্থার সাথে, কৌশলের সাথে, কুশলতার সাথে জীবনের যে-কোনো সমস্যা মোকাবেলা করতে পারি এবং জীবনকে নতুন একটা স্তরে নিয়ে যেতে পারি।

কোয়ান্টাম হচ্ছে মেডিটেশনের সবচেয়ে সহজ প্রক্রিয়া। ২৭ বছর পূর্ণ হয়ে এবার ২৮ বছরে পা দিয়েছে কোয়ান্টাম। ২৮ তম বছরে প্রথম আমি আপনাদের সাথে সাদাকায়ন করার সুযোগ পেয়েছি। এজন্যে পরম করুণাময়ের শুকরিয়া আদায় করছি। আরো শুকরিয়া আদায় করছি, তিনি মেডিটেশনের সহজতম পদ্ধতি উদ্ভাবন করার সুযোগ আমাদের দিয়েছেন। মেডিটেশনের হাজারটা পদ্ধতি আছে। প্রত্যেক পদ্ধতিতে মেডিটেশন হবে। কিন্তু সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি উদ্ভাবন করার সুযোগ দিয়েছেন বাংলাদেশের একজন বাঙালিকে।

যখন আপনি মেডিটেশন করবেন, দেখবেন—আপনার মাথা ঠান্ডা হয়েছে, মনটা স্বচ্ছ হয়ে গেছে। মনের আবর্জনা রাগ-ক্ষোভ-ঘৃণা দূর হয়েছে। তখন আপনার মধ্যে সমমর্মিতা সৃষ্টি হবে। যখনই সমমর্মিতা সৃষ্টি হবে, রাগ-ক্ষোভ কমে যাবে। আপনি খুব শান্তভাবে যে-কোনো পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করতে পারবেন। একটা পরিস্থিতি যদি বস্তুনিষ্ঠভাবে আপনি বিশ্লেষণ করেন, দেখবেন—সমস্যার মূল কারণটা আপনি বের করে ফেলতে পারছেন এবং তা সমাধান হয়ে যাচ্ছে।

সাদাকায়ন : ১০ জানুয়ারি ২০২০; কোয়ান্টামম

ভালবাসুন আপনার পরিবারকে

সবার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর্ডেন্টিয়ার ওয়ার্কশপে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। ওয়ার্কশপ আমরা শুরু করব সাদাকায়নের আলোচনা দিয়ে। আজ সাদাকায়নের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, *ভালবাসুন আপনার পরিবারকে*। ওয়ার্কশপে আমরা সবার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করতে চাই একটি গল্প দিয়ে। সেটা হচ্ছে এক বাবার গল্প।

যে-কোনো গল্পের একটা মজা আছে। সেই গল্পই কালকে জয় করে যেটা শুনতে ভালো লাগে, হৃদয়কে স্পর্শ করে। সেটা বলার ভঙ্গিতে হোক অথবা লেখার ভঙ্গিতে হোক। গল্প যদি প্রবন্ধের ভঙ্গিতে লেখা হয়, তাহলে সেই গল্প কখনো হৃদয়কে স্পর্শ করে না। গল্প বলার ভঙ্গিতেই গল্প লিখতে হয়। তাহলেই সেটা হৃদয়কে স্পর্শ করে।

একটা কালজয়ী গল্প। গল্পটা সুফিদের; সুফিরা গল্পের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দিতেন। এই গল্পটি বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রচলিত।

বাবা বৃদ্ধ হয়েছেন। তেমন চলাফেরা করতে পারেন না। যৌবনের যে শক্তি, স্বাভাবিকভাবে সেই শক্তি আর নেই। ছেলে টগবগে যুবক। ছেলের মধ্যেই বাবা তার যৌবনের প্রতিচ্ছবি কল্পনা করেন এবং খুব তৃপ্তি পান যে, আমার ছেলে আমার মতোই। আমি এই বয়সে যে-রকম ছিলাম, মনে হয়—সে আমার চেয়েও এক ডিগ্রি উঁচু।

একদিন বাবা খেতে বসেছেন। পরিবারের আরো সবাই আছেন। খেতে বসে গল্প হয়, কথা হয় সবচেয়ে বেশি। পরিবারের মানুষেরা সারাদিন নানান কাজে ব্যস্ত ছিল। নাতি ব্যস্ত। পুত্রবধূ ব্যস্ত। ছেলে ব্যস্ত। অনেক ব্যস্ততা,

অনেক কাজ শেষে ছেলে এসেছে রাতের বেলা। ক্লান্ত। কাজ থেকে ফিরে আসার পর অনেক সময় ক্লান্তির সাথে থাকে বিরক্তি। সারাদিন যে এত কাজ করেছি—এটাই বিরক্তির একটা কারণ। এত কাজ কেন করতে হয়? কাজ যে কত গুরুত্বপূর্ণ ও আনন্দের—যখন কেউ রিটায়ারমেন্টে যান তখন বোঝেন।

সবাই খেতে বসেছে। বাবার বয়স হয়েছে। হাত একটু কাঁপে। তিনি খাচ্ছেন। খেতে খেতে বাবার হঠাৎ মনে হলো, আজকে কী বার? ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন। ছেলে হচ্ছে তার সবচেয়ে আদরের। ছেলে বলল, সোমবার। খেতে খেতে কিছুক্ষণের মধ্যেই বাবা ভুলে গেলেন। আবার ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, আজকে কী বার? ছেলে বলল, সোমবার।

বাবা একটু পরে আবার ভুলে গেলেন। ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, আজকে না কী বার! ছেলে তখন একটু জোরেই বলল, সোমবার! কিছুক্ষণ পরে বাবা আবার ভুলে গেলেন! জিজ্ঞেস করলেন, কী বার যেন বললি? ছেলে এবার খুব রাগত স্বরে বলল—বাবা, বললাম না, সোমবার! কতবার বললাম আজকে সোমবার সোমবার সোমবার! তোমার মনে থাকে না! বার দিয়ে তোমার দরকারটা কী? তুমি কি বাইরে যাবে? তুমি কাজ করতে পারো? তোমার বার দিয়ে এত কী দরকার!

ছেলেও বাবাকে ভালবাসত। কিন্তু অফিসের কাজের যে চাপ, সেখানে হয়তো বিরক্তি প্রকাশ করতে পারে নি। বিরক্তিটা পুরো এসে সোমবারের ওপরে, মানে বাবার ওপরে পড়েছে। ছেলে যখন খুব ক্ষুব্ধ, বাবা একেবারে চুপ। যতক্ষণ খাওয়াদাওয়া করেছেন, আর কোনো কথা বলেন নি। চুপ।

এর মধ্যে ছেলের সাথে বাবার আর কথা হয় নি। দু-তিন দিন পর বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং মারা গেলেন। হাসপাতালে নেয়ারও সময় পাওয়া যায় নি।

স্বাভাবিকভাবে বাবার কাফন-দাফনসহ যা যা করার, ছেলে করেছে।

একদিন ছেলে বাবার রেখে যাওয়া জিনিসপত্র ঘাঁটছে; যে, আচ্ছা, বাবার কী আছে? সে বাবার লেখা পুরনো ডায়েরি খুঁজে পেল। বাবার ডায়েরি লেখার অভ্যাস ছিল—সে জানত। প্রত্যেক বছরের জন্যে একেকটা ডায়েরি। ডায়েরি ঘাঁটতে ঘাঁটতে ৪০ বছর আগের একটা ডায়েরি সে উল্টাচ্ছে। দেখে, একদিনের ঘটনা লিখেছেন বাবা।

দিনটা সোমবার। খোকার বয়স আজ দু-বছর পুরো হলো। অদ্ভুত এক আনন্দের ঘটনা ঘটেছে আজ। খোকা আমার সাথে হাঁটছে! ঘরের উঠানে

আমার আঙুল ধরে হাঁটতে হাঁটতে খুব মজা পাচ্ছে সে। হঠাৎ দূরে দেয়ালের ওপারে গাছে একটা কাক এসে বসল। খোকা সেদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, বাবা, এটা কী? আমি বললাম, কাক। খোকাও উচ্চারণ করল—কাক!

আবার একটু পরে খোকা আমাকে জিজ্ঞেস করছে, এটা কী? আমি বলি, কাক। সাথে সাথে খোকাও বলে—কাক! একটু পরে আবার জিজ্ঞেস করছে, বাবা, এটা কী? আমি বলি, কাক! খোকাও আমাকে জড়িয়ে ধরে বলে—কাক! একটু পরে আমাকে ছেড়ে আবার জিজ্ঞেস করে—এটা কী? আমি বলি, কাক! খোকাও 'কাক!' বলে আমাকে জড়িয়ে ধরে। ৩০ বার তাকে আমি 'কাক' বলেছি এবং প্রত্যেকবারই সে 'কাক!' বলে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। এই বয়সে এত আনন্দ এর আগে কখনো পাই নি। বার বার সে জিজ্ঞেস করছে এটা কী? আমি বলি—কাক। সে-ও বলে ওঠে—কাক!

এটা যখন সে পড়ছে, দরদর দরদর করে তার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে যে, এতবার 'কাক' বলার পরও বাবার কোনো বিরক্তি ছিল না। আর আমি চার-পাঁচ বার 'সোমবার' বলতে গিয়ে বাবাকে ধমক দিয়েছি! বাবার সাথে দুর্ব্যবহার করেছি। বাবাকে যে এত ভালবাসি, এই ভালবাসার স্মৃতি নিয়ে তো বাবা আমার কাছ থেকে যান নি। বিরক্তির স্মৃতি নিয়ে গেলেন!

আমাদের জন্ম এবং বড় হয়ে ওঠা আমাদের পরিবারে। কোয়ান্টাম মেথড কোর্স ম্যাটেরিয়ালের একটা বড় অংশ হচ্ছে পরিবার। তৃতীয় দিনের শেষ আলোচনা এবং চতুর্থ দিনের প্রথম আলোচনার পুরোটাই পরিবারকে নিয়ে; যে, পরিবার কীভাবে সুন্দর করা যায়।

আজ যে আমরা এতকিছু জানি, এতকিছু পারি, মা-বাবার অম্লমধুর ভালবাসা-মমতা ছাড়া আমাদের এই অর্জন সম্ভব হতো না। মা-বাবা শুধু 'কাক' বলা শেখান নি, আমাদের সকল শিক্ষার শুরুই হচ্ছে মা এবং বাবা। আমাদের পরিচয়ের শুরুটাই হচ্ছে মা এবং বাবা—আমাদের পরিবার।

আমরা আজ যে যে অবস্থানে আছি, এই অবস্থানের পেছনে আমাদের পরিবারের ভূমিকাটা কী? যাদের ছোট বয়সে মা অথবা বাবা মারা গেছেন, তাদের বিষয়টা আলাদা। তারা বোঝে যে, আসলে মা-বাবার অভাবটা কী! যারা বাবার স্নেহে লালিত হয়েছে, মায়ের কোলে লালিত হয়েছে এবং ৩০ বছর, ৪০ বছর পর্যন্ত 'খোকা' থেকেছে, মা-বাবার আদরটা যে কী, যত্নটা যে কী—এটা তারা বুঝতে পারবেন না। মা-বাবা হচ্ছেন পরিবারের শুরু।

তারপরে আমরা। আমি এবং আমার স্ত্রী অথবা আমি এবং আমার স্বামী। শুধু এটুকুই পরিবার নয়, আমার মা-বাবা হচ্ছেন আমার পরিবারের শুরু।

পরিবারটা কী? আমাদের পরিবার কেমন হওয়া উচিত? আমার মা-বাবা আমার স্ত্রীর মা-বাবা। আমার মা-বাবা আমার স্বামীর মা-বাবা। তারপরে আমাদের সন্তান। সন্তানের চেয়েও আমার ওপর বেশি অধিকার আমার মায়ের, আমার বাবার। একজন পুরুষের ওপরে তার স্ত্রীর চেয়ে বেশি অধিকার মায়ের। এটা আল্লাহর রসুলের (স) শিক্ষা। স্বামীর অবশ্যই স্ত্রীর ওপর অধিকার রয়েছে। স্ত্রীর অবশ্যই স্বামীর ওপর অধিকার রয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি অধিকার মায়ের, তারপর বাবার। সেবা পাওয়ার সবচেয়ে বেশি অধিকার মায়ের, তারপর বাবার।

মোয়াবিয়া ইবনে হায়দা (রা) বর্ণিত হাদীস : 'আমি নবীজীকে (স) জিজ্ঞেস করলাম, আমার কাছ থেকে সুন্দর ব্যবহার ও সেবা পাওয়ার অধিকার কার সবচেয়ে বেশি? নবীজী (স) উত্তর দিলেন, তোমার মা। আমি আবার প্রশ্ন করলাম, তারপর? উত্তর : তোমার মা। আবার প্রশ্ন করলাম, তারপর? এবারও উত্তর : তোমার মা। চতুর্থ বার প্রশ্ন করলাম, তারপর কার? এবার উত্তর দিলেন, তোমার বাবা।' *[মুফরাদ, তিরমিজী]*

প্রথম তিন বার 'মা'। 'বাবা' এসেছেন চতুর্থ বারে। কারণ মায়ের ত্যাগ শ্রম ভালবাসা মমতা বাবার ত্যাগ শ্রম ভালবাসা মমতার চেয়ে বেশি।

সন্তানের জন্যে আমাদের যে আকুতি, এই আকুতিটা খুব ভালো। কিন্তু এখনকার সন্তানের কেন এই আকুতিটা আমাদের জন্যে কাজ করছে না? কারণ আমাদের মা-বাবার প্রতি সেই আকুতি আমরা অনুভব করছি না। সন্তান যদি দেখে যে, আপনি আপনার মা-বাবাকে ভালবাসছেন, আপনি আপনার মা-বাবার ওপর বিরক্ত হচ্ছেন না, আপনি আপনার মা-বাবার সাথে সবসময় সদাচরণ করেছেন, আপনার সন্তান এটাকেই উদাহরণ হিসেবে নেবে এবং সে এটা অনুসরণ করবে।

সন্তানকে বক্তৃতা দিলে সন্তান সেটা অনুসরণ করে না। সন্তান দেখে যে, আমার মা, আমার বাবা কী করছে। যেটা সে দেখে, সেটা-ই সে অনুসরণ করে। অতএব আপনি যদি চান সন্তান আপনার কথা শুনুক, তাহলে আপনি আপনার মা এবং বাবার কোনোকিছুতে বিরক্ত হবেন না। আপনার শিশুসন্তান বার বার একই কথা জিজ্ঞেস করলে যদি বিরক্ত না হন, তাহলে আপনার মা অথবা বাবা একই প্রশ্ন বার বার জিজ্ঞেস করলে কেন বিরক্ত হবেন!

মা-বাবার প্রতি বিরক্ত হওয়াটা কখনোই জাস্টিফাইড না। কারণ জীবনে মা-বাবার দোয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনি মা-বাবার দোয়া থেকে যদি বঞ্চিত হন, আপনার সন্তানের জন্যে দোয়া করে কোনো লাভ হবে না। কারণ আপনি তা-ই পাবেন, যা আপনি করেছেন। তা-ই পাবেন, যা আপনি দিয়েছেন। মা-বাবাকে যা দেবেন, আপনার সন্তানও আপনাকে তা-ই দেবে।

সন্তানের প্রকৃত মডেল হচ্ছেন তার মা ও বাবা। ভালো হলেও মা-বাবা, খারাপ হলেও মা-বাবা। মা-বাবার খারাপটা দেখে সন্তান ওই খারাপটাকেই অনুসরণ করবে। মা-বাবার মুখের ভালো ভালো কথা অনুসরণ করবে না। আপনি বাইরে থেকে ঘরে ফিরেই যদি টিভি সিরিয়াল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, তাহলে আপনার সন্তান আর কী করবে? আপনি সন্তানকে ডিজিটাল আসক্তিমুক্ত রাখতে চাইবেন, হবে না। সন্তানকে ডিজিটাল আসক্তিমুক্ত রাখতে চাইলে আগে মা-বাবাকে ডিজিটাল আসক্তিমুক্ত থাকতে হবে।

আমরা আমাদের মা-বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আসলে মা-বাবার দোয়া কোনো না কোনোভাবে আমাদের ওপর ছিল বলেই আমরা কল্যাণের পথে আসতে পেরেছি, শান্তির পথে আসতে পেরেছি, আল্লাহর পথে আসতে পেরেছি। মা-বাবার দোয়ার চেয়ে বড় জিনিস আর হয় না। এর চেয়ে ভালো জিনিস আর হয় না।

অতএব পরিবারের শুরু হচ্ছে মা-বাবা। এরপর আপনার স্ত্রী বা আপনার স্বামী। এরপর আপনার সন্তান। যদি এই ধারাটা বজায় রাখতে পারেন, তাহলে মমতার দিক থেকে, কর্মের দিক থেকে আপনার সন্তান সুসন্তান হবে। আপনার সন্তানও ঠিক একইভাবে আপনাকে দেখবে, যেভাবে আপনি আপনার মা-বাবাকে দেখেছেন।

আমি এক বাবার কথা জানি। ধরুন, তার নাম জাহিদ। তার মা মারা গেছেন। মায়ের অসিয়ত ছিল যে, স্বামীর কবরের পাশেই যেন তাকে কবর দেয়া হয়। মারা গেছে সকালবেলা। মায়ের লাশ যদি নিয়ে যেতে হয়, তাহলে জাহিদকে এখনই রওনা দিতে হবে। এদিকে তার ছেলেও তখন স্কুলে। পাশের বাসার প্রতিবেশীকে বলে গেলেন, আমার ছেলে স্কুল থেকে ফিরলে তাকে একটু দেখে রাখবেন।

জাহিদ ছেলেকে রেখেই মায়ের মৃতদেহ নিয়ে রওনা দিলেন। নদীপথে পাঁচ-ছয় ঘণ্টার পথ। বুড়িগঙ্গায় গিয়েছেন। মাঝি বলল—না, আমি লাশ নিয়ে যাব না। শেষ পর্যন্ত মাঝিকে তিনি রাজি করালেন। বললেন, ঠিক আছে,

আমি নৌকা বাইব। তুমি বসে থেকো। জাহিদ নিজে নৌকা বেয়ে মায়ের লাশ নিয়ে গেলেন। তার ছেলে স্কুল থেকে ফিরে দেখল যে, বাসায় কেউ নেই। প্রতিবেশী এসে তাকে নিয়ে গেল। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করল। আগেকার দিনে প্রতিবেশীরা প্রতিবেশীর খোঁজ রাখত। এখন তো একদিকে প্রতিবেশী মারা গেছে, আর পাশের বাসায় লারেলাপ্পা গান হচ্ছে উচ্চস্বরে!

জাহিদ ফিরে এলে ছেলে তাকে জিজ্ঞেস করল, আমাকে রেখে গেলে কেন? তিনি বললেন—দেখ, তোমার দাদির শেষ ইচ্ছা ছিল তার কবর যেন তোমার দাদার কবরের পাশে হয়। আমি যদি তখন না যেতাম, তাহলে তোমার দাদির এই শেষ ইচ্ছা পূরণ হতো না। এরপর বাবা পুরো ঘটনা বললেন ছেলেকে—কীভাবে মায়ের মৃতদেহ নিয়ে গেছেন দেশের বাড়িতে।

ছেলে সেটা মনে রেখেছে যে, তার বাবার কাছে দাদি কত প্রিয় ছিল। সে-ও তার মা-বাবাকে কখনো উহ্ আহ্ শব্দ পর্যন্ত করতে দেয় নি। একজন কর্মজীবী মানুষ, যার নৌকা বাওয়ার অভ্যাস নেই, মাঝি রাজি হচ্ছিল না বলে তিনি নিজে ছয় ঘণ্টা নৌকা বেয়ে নদী পাড়ি দিয়ে মায়ের লাশ নিয়ে গেছেন তার স্বামীর কবরের পাশে কবর দিতে। এ ঘটনা ছেলেটি ভুলে যায় নি। ছেলেও তার মা-বাবাকে সেভাবে সম্মান করেছে। শেষ বয়সেও তাদের সেইভাবে দেখেছে, যেভাবে তার বাবা তার দাদিকে দেখেছিল।

অতএব আপনি আপনার মা-বাবাকে যেভাবে স্মরণ করবেন, লালন করবেন, তাদের সাথে যে ব্যবহার করবেন, যে আচরণ করবেন, আপনার সন্তান কিন্তু খেয়াল করছে, দেখছে। সন্তানের কোনো দুঃখ ছিল না যে, তাকে একা রেখে তার বাবা চলে গেছে দাদির মৃতদেহ নিয়ে। দাদির ইচ্ছা যে বাবা পূরণ করেছে, এতেই সে গর্ববোধ করত যে, আমার বাবা এরকম ছিল!

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করব। যাদের মা-বাবা এখনো জীবিত আছেন, তাদের দোয়া নিয়ে যেন আমরা পৃথিবী থেকে যেতে পারি। আর যাদের মা-বাবা পৃথিবীর জীবন শেষ করে চলে গেছেন, সেই মৃত মা-বাবার জন্যে আমরা যেন দোয়া করতে পারি।

আর্ডেন্টিয়ার ওয়ার্কশপ সাদাকায়ন : ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০; আইডিইবি, ঢাকা

সুবচনের চর্চা বাড়াবে আপনার কথার প্রভাব

আসসালামু আলাইকুম। আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক!

আজ ২১শে ফেব্রুয়ারি। আজ শুধু আমাদের শহিদ দিবস নয়, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। যাদের ত্যাগে পৃথিবীব্যাপী একটি দিবস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই ভাষা শহিদদের প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনটা তখনই সফল হবে যখন সারা পৃথিবীর মানুষ, তিনি যে ভাষারই হোন এবং যত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীই হোন, সবাই নিজ নিজ মাতৃভাষায় গর্বের সাথে কথা বলতে পারবে। নিজ নিজ মাতৃভাষায় লিখতে পারবে ও মাতৃভাষা চর্চা করতে পারবে। সেদিনই ভাষার জন্যে শহিদদের ত্যাগ সার্থক হবে। আমরা প্রার্থনা করব যে, পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তে যে-কোনো জনগোষ্ঠী, যে-কোনো মানুষ, সে যেন তার মায়ের ভাষায় নির্ভয়ে নির্ভাবনায় কথা বলতে পারে, লিখতে পারে এবং নির্ভাবনায় মায়ের ভাষা চর্চা করতে পারে।

আজকে আমাদের সাদাকায়নের বিষয় হচ্ছে, *সুবচনের চর্চা বাড়াবে আপনার কথার প্রভাব*। অর্থাৎ কথাটা যদি সুন্দর হয়, প্রভাবটা সুন্দর হবে এবং সেই কথার প্রভাব দূরপ্রসারী হবে।

সুন্দর কথা, সুন্দর বচন মানুষকে আকৃষ্ট করে। অনুপ্রাণিত করে। আর খারাপ কথা বা বচন, খারাপ বাক্য মানুষকে মানুষ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। একটা বিশ্রী বচন, বিশ্রী ভাষা, গালাগালি মানুষকে দুঃখিত ব্যথিত করে। হতাশও করে ফেলে।

সুন্দর কথা যে-রকম ভালো কথা, সুন্দর কথা একইভাবে সত্য কথা। কারণ সত্য ছাড়া সুন্দর হয় না। মিথ্যা কখনো সুন্দর হয় না। সুবচন বা কুবচন সবসময় গড়ে ওঠে সঙ্গের প্রভাবে। বন্ধুবান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়দের প্রভাব বচনের ওপরে সবচেয়ে বেশি পড়ে।

বস্তিতে যে শিশুটি বড় হয়ে ওঠে, সে ছোটবেলা থেকেই বকাবকি বা গালিগালাজ শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আবার পরিশীলিত পরিবেশে যে শিশু বড় হয়, সে সুশীল এবং সুবচনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

আমরা একটি প্রাচীন গল্প দিয়ে শুরু করতে পারি যে, সঙ্গ কীভাবে সুভাষী করে। আবার সঙ্গ কীভাবে কুভাষী করে। গল্পটা বৈদিক যুগের। তখনকার দিনে তিনটি পেশা জনপ্রিয় ছিল। এক হচ্ছে কৃষি। তারপর জেলে, তারা মাছ ধরত। আর একদল শিকারি ছিল, যারা বন্য পশু শিকার করে তার মাংস বিক্রি করত।

এক গ্রামের একজন ভদ্রলোক—তিনি এক শিকারির বাড়িতে ভোরবেলা গেছেন মাংস কেনার জন্যে। শিকারির বাসায় ঢুকতেই দেখেন একটা কাকাতুয়া। আমরা অধিকাংশই হয়তো ছবিতে কাকাতুয়া দেখেছি। বাস্তবে দেখার সুযোগ আমাদের খুব কম হয়েছে। পাখিটি টিয়ার মতোই। আরো সুন্দর এবং কিছুটা বড়। শেখালে সে যা শোনে, তা মনে রাখতে পারে। মানুষের মতো বলতেও পারে।

এত সুন্দর কাকাতুয়া দেখে লোকটি খুব উল্লসিত হলেন। কাকাতুয়ার খুব প্রশংসা করে বললেন, বাহ! তুমি কত সুন্দর! কিন্তু প্রশংসা শোনার সাথে সাথে কাকাতুয়াটি তাকে গালিগালাজ শুরু করল অশ্রাব্য ভাষায়!

তিনি খুব বিস্মিত হলেন। এত সুন্দর পাখি আর এত বিশ্রী তার ভাষা! তিনি দ্রুত ওখান থেকে ফিরে গেলেন। তার মন খুব খারাপ হয়ে গেল; যে, এত সুন্দর পাখি এরকম গালিগালাজ করতে পারল!

সাতসকালে এরকম একটা ঘটনা ঘটল! মন খুব বিষণ্ন। যারা গালি শুনে অভ্যস্ত নয়, তাদের কাছে গালিটা খুব উত্তেজক মনে হয়। কারণ সব তো কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট না যে, গালি দিলেও কোনোরকম রি-একশন হয় না। আরো সোজা বাংলায় বললে, কোনো বোধশোধ নেই।

মন ভালো করার জন্যে তিনি ভাবলেন যে, এই সকালবেলা যখন এরকম একটা বাজে ঘটনা ঘটল, সামনেই সাধুর বাড়ি। সাধুর সাথে একটু দেখা করে আসি। সাধুর বাসায় যখন ঢুকবেন, দরজাতে পা দিয়েই দেখেন যে,

একই রকম সুন্দর আরেক কাকাতুয়া বসে আছে। এর আগে কাকাতুয়ার গালি খেয়েছেন। বুঝতেই পারছেন, কাকাতুয়া দেখার সাথে সাথে কোনো কথা না বলে উল্টো দিকে হাঁটা শুরু করেছেন।

কাকাতুয়াটি খুব সুন্দরভাবে পেছন থেকে বলে উঠল, আদাব! আদাব! আপনি যাবেন না। আপনি আসুন। সাধুবাবা বাড়ি আছেন। আপনি আসুন।

তিনি তো অবাক! এক কাকাতুয়ার বকার চোটে আমি বেরিয়ে এলাম, আর এদিকে আমি ফিরে যাচ্ছি দেখে আরেক কাকাতুয়া আমাকে আদাব আদাব বলে ডাকছে! আসুন, বসুন বলছে! তিনি থামলেন এবং বিস্মিত হয়ে সেই কাকাতুয়ার দিকে তাকালেন। বললেন, দেখো, আমি তো বুঝতে পারছি না—তোমারই মতো এক কাকাতুয়া আমাকে দেখে কী গালিগালাজ না করল একটু আগে। আর তুমি আমাকে এত সুন্দরভাবে আহ্বান করছ! বসার জন্যে আমন্ত্রণ জানাচ্ছ। অদ্ভুত ব্যাপার!

সাধুর কাকাতুয়া তো। সে-ও মোটামুটি কাউন্সেলিং বোঝে। কারণ সৎসঙ্গে স্বর্গবাস। অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। কাকাতুয়া হেসে বলল, আসলে দোষ ওই কাকাতুয়ার না। দোষ সঙ্গের।

আমরা একই মায়ের পেটের দুই ভাই। ভাগ্যক্রমে আমি সাধুবাবার হাতে এসে পড়েছি। আর ও পড়েছে শিকারির হাতে। প্রত্যেকদিন ভোর থেকে শিকারির গালিগালাজ শুরু হয় এবং সে ওই গালিই শিখেছে। আর আমার ভোর শুরু হয় সাধুবাবার বেদের গান শুনে। সুন্দর সুন্দর কথা শুনে। উপদেশ শুনে। দোষ ওর নয়। দোষ সঙ্গের।

আসলে একজনের ভাষা, একজনের বচন তার সঙ্গকে প্রতিনিধিত্ব করে। আপনার বচন আপনার সঙ্গকে প্রতিনিধিত্ব করবে। আপনার পরিবারকে প্রতিনিধিত্ব করবে। আপনার সমাজকে প্রতিনিধিত্ব করবে। আপনার দেশকে প্রতিনিধিত্ব করবে। এজন্যে প্রভু সুবচনকে এত গুরুত্ব দিয়েছেন।

আপনি দেখুন, সনাতন ধর্মের সবচেয়ে বড় পবিত্র গ্রন্থ হচ্ছে বেদ। ঋগ্‌বেদে বলা হয়েছে, তোমার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদের মধ্যে একটি হচ্ছে মধুর বচন এবং প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে, 'হে প্রভু! আমাদের সর্বোত্তম সম্পদ দান করো; দান করো কালজয়ী মন, আত্মিক সুষমা, অনন্ত যৌবন, আলোকোজ্জ্বল রূপ আর মধুর বচন।' *[ঋগ্‌বেদ : ২.২১.৬]*

সেই কত হাজার বছর আগের কথা! মহামতি বুদ্ধ—বাংলার মহামানব। সারা পৃথিবীতেই তাঁর অনুসারী রয়েছে। তিনি ধম্মপদে খুব পরিষ্কারভাবে

বলেছেন, 'কাউকে কটুকথা বলবে না, কারণ সে-ও কটু প্রত্যুত্তর দিতে পারে। উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় তোমার জন্যেও কষ্টদায়ক হবে। দণ্ডের প্রতিদণ্ড তোমাকেও স্পর্শ করবে।' *[দণ্ডবগ্‌গো : ১৩৩]*

২৬০০ বছর আগে মহামতি বুদ্ধের বাণী এবং ২০০০ বছর আগে যীশু ঈশ্বরের যে বাণী শুনিয়েছেন, তার মূল সুর একই। পবিত্র বাইবেলে বলা হয়েছে, 'যে নিজের ওষ্ঠ সংযত রাখে, সে নিজের জীবনকেই সংরক্ষিত করে। আর যে রূঢ় কথা বলে, সে নিজের সর্বনাশের পথ উন্মোচিত করে।' *[হিতোপদেশ ১৩.৩]*

সুবচন এত গুরুত্বপূর্ণ বলেই কোরআনে সূরা বনি ইসরাইলের ৫৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন যে, '... মানুষের সাথে ভালো কথা বলো। সুন্দর কথা বলো। ...'

অতএব আপনি যখন খারাপ কথা বলছেন, গালিগালাজ করছেন, অমুকের শিশু বলছেন বা অমুকের ছানা বলছেন ... আমি একটু সুন্দর করে বললাম! কারণ বাচ্চা শব্দটা চালু। হিন্দি এবং উর্দুতে বাচ্চা শব্দটা খুব আদর করে বলা হয়। কিন্তু বাংলায় সাধারণত বাচ্চা শব্দটা আদর করে বলা হয় না।

সুন্দর বচন, সুন্দর কথা এত গুরুত্বপূর্ণ বলেই কিন্তু আমরা সুবচন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছি। কারণ সুন্দর কথা যে মানুষকে আশাবাদী করে, ভেতরে আশার সঞ্চার করে—এটা শুধু আমরা কোয়ান্টামে বলি না, সারা পৃথিবীর চিন্তাশীল মানুষ, ভাবুক মানুষ, কল্যাণকামী মানুষেরা এই কথা বলেন। তীর্যক এবং বিদ্রুপাত্মক কথা যেমন একজনকে বহুদিনের জন্যে নিরাশ করে ফেলতে পারে, হতাশায় নিমজ্জিত করে ফেলতে পারে, তেমনি একটি ভালো কথা বদলে দিতে পারে একজন মানুষের জীবন। জীবন বদলে দিতে পারে বলেই ভালো কথার এত গুরুত্ব।

তাইওয়ানের একজন খ্যাতিমান লেখক লিন কিং হুয়ান। হাই স্কুলে পড়ার সময় খারাপ ছাত্র হিসেবে তার 'সুনাম' ছিল! তিনি সবসময় টেনেটুনে কোনোরকমে পাশ করতেন। স্কুলের নিয়মকানুন কিছুই মানতেন না। স্কুলে তিনি পরিচিত ছিলেন ঘাড়ত্যাড়া বাজে ছাত্র হিসেবেই। কিন্তু তার শিক্ষক হাল ছাড়লেন না। যে-রকম আমরা কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট কোয়ান্টিয়ার আর্ডেন্টিয়াররা কখনো হাল ছাড়ি না। যে যা বলে বলুক! তার শিক্ষকও আত্মিকভাবে হয়তো কোয়ান্টামের আলো বা আশাবাদের আলো পেয়েছিলেন! প্রায়ই ওই ছাত্রকে তার বাসায় খাবার খেতে ডাকতেন এবং পড়াতেন।

একদিন শিক্ষক বললেন, শোনো! ৫০ বছর ধরে আমি ছাত্র পড়াই। একবার তাকিয়েই বলতে পারি—কার মধ্যে জীবনে বড় হওয়ার শক্তি আছে। অল অন আ সাডেন কথাটা লিনের ব্রেনে ঢুকে গেল এবং তিনি জীবনের একটা লক্ষ্য খুঁজে পেলেন। পড়াশোনার পেছনে তিনি লেগে গেলেন। ভাবলেন, স্যার যখন বলছেন, তাহলে নিশ্চয়ই আমার বড় কিছু করার শক্তি আছে। কয়েক বছরের মধ্যেই একজন সাংবাদিক হিসেবে ভালো পত্রিকায় ভালো বেতনে কাজও পেয়ে গেলেন।

একদিন এক চুরির ঘটনা দেখে এসে তিনি রিপোর্ট করলেন। চুরির পুরো ঘটনা লিখলেন। চুরিতে এই এই হয়েছে ...। রিপোর্ট শেষে একটা মন্তব্য করলেন যে, চুরির জন্যে এত নিখুঁত এবং এত সুন্দর পরিকল্পনার বাস্তবায়ন যে-লোক করতে পারে, সে যে-কোনো কাজে সফল হতে পারে।

ঘটনাচক্রে পত্রিকার রিপোর্টটি ওই চোরও পড়েছিল। পড়ার পরে তার ব্রেনের ওয়ার্কিং স্ট্রাকচার চেইঞ্জ হয়ে গেল। সে ভাবল যে, আমি তো চাইলে যে-কোনো ভালো কাজ করতে পারি, তাহলে কেন চুরি করব!

২০ বছর পরে সেই লোকটি এসে লেখক লিনের সাথে দেখা করল। লিন তখন তাইওয়ানের সবচেয়ে বড় লেখক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। লোকটি লিনকে বলল, আপনার একটি ভালো কথা—ওই যে চুরির রিপোর্টের শেষ লাইনটা—আমার জীবন বদলে দিয়েছে। চুরি ছাড়াও যে আমি বড় কিছু করতে পারি, এই বিশ্বাসটা সেদিন আমার সৃষ্টি হয়েছে। আমি এখন একজন ব্যবসায়ী। মিলিয়নেয়ার ধনকুবের।

এজন্যেই সূরা ইব্রাহিমের ২৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, '... একটি ভালো কথা এমন একটি ভালো গাছের মতো, যার শিকড় রয়েছে মাটির গভীরে আর শাখাপ্রশাখার বিস্তার দিগন্তব্যাপী। ...'

চিন্তা করুন, একটা ভালো কথাকে আল্লাহ কত গুরুত্ব দিয়েছেন!

আমরা দেখলাম যে, ভালো কথা কীভাবে জীবন বদলে দিতে পারে। পিছিয়ে পড়া ছাত্রকে বড় লেখক বানাতে পারে। চোরকে বড় ব্যবসায়ী বানাতে পারে। একজন ডাকাতকেও বড় মানুষ বানাতে পারে। বাল্মীকির কী নাম ছিল? রত্নাকর দস্যু। যেভাবে রত্নাকর দস্যু বাল্মীকি হয়ে গেলেন শুধু ভালো কথা বলে। এজন্যে সবসময় ভালো কথা বলবেন।

ভালো কথা আপনি তখনই বলতে পারবেন, যখন আপনার আচার ভালো হবে। অর্থাৎ আপনি যখন শুদ্ধাচারী হবেন, তখন আপনার কথা ভালো হবে।

সাধুর কথা কেন প্রভাবিত করেছিল ওই কাকাতুয়াকে? কারণ সাধু শুদ্ধাচারী ছিলেন। শিক্ষকের কথা কেন সেই পিছিয়ে পড়া ছাত্রকে প্রভাবিত করেছিল? কারণ শিক্ষক শুদ্ধাচারী ছিলেন। লিনের কথা চোরকে প্রভাবিত করেছিল কেন? কারণ লিন তখন বুঝেছেন যে, ভালো কাজ করা, ভালো হওয়ার গুরুত্ব কত! তিনি খারাপ ছাত্র থেকে ভালো ছাত্র হয়েছেন এবং তার সেই ভালো কথা একজন চোরকে ভালো মানুষ হতে অনুপ্রাণিত করেছে।

এজন্যে আমাদের কী করতে হবে? সুবচনটাকে নিজের জীবনের অঙ্গে পরিণত করার জন্যে, নিজের স্বভাবের অঙ্গে পরিণত করার জন্যে, সুবচন যেন আমাদের সেকেন্ড নেচার হয়—এজন্যে আমাদেরকে শুদ্ধাচারী হতে হবে। আর শুদ্ধাচারী হওয়ার জন্যে এই ফেব্রুয়ারিতে আমরা খুব চমৎকার সুযোগ পেয়েছি। সেটা কী? সেটা হচ্ছে *শুদ্ধাচার* বই।

এখন শুদ্ধাচার চর্চা করা খুব সহজ। শুধু কী করবেন? এই বইটার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে ফেলবেন। যত পড়বেন, নিজের জীবনে প্রয়োগ করাটা, শুদ্ধাচার চর্চা করাটা, শুদ্ধাচারী হওয়াটা খুব সহজ হবে।

অবশ্য শুদ্ধাচারের ওপর এরকম পূর্ণাঙ্গ বই দুই বাংলায় এটাই প্রথম। এটা আমাদের জন্যে সৌভাগ্য। এই বইয়ের রচয়িতা কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি না। বইটির রচয়িতা আপনারা সবাই। গত ৩০ বছর ধরে আপনাদের আচার-ব্যবহার, আপনাদের কথা—তা-ই প্রতিফলিত হয়েছে এই বইয়ে।

এই বইয়ের শুরুই হচ্ছে—আসসালামু আলাইকুম। আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমরা বলতে পারি যে, এরকম শুরু এ পর্যন্ত আর কোনো বইয়ে হয় নি। সকল শুদ্ধাচারের মূল সূত্র হচ্ছে—আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক! আসসালামু আলাইকুম। 'শান্তি' শব্দটির বিশাল শক্তি রয়েছে। এই শান্তির বাণীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই আমাদের শুদ্ধাচারী হতে হবে, বাড়াতে হবে সুবচনের চর্চা।

সাদাকায়ন : ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২০; কোয়ান্টামম

নিয়মিত দান রক্ষা করবে ৭০টি অকল্যাণ থেকে

সাদাকায়নে আজ আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে, *নিয়মিত দান রক্ষা করবে ৭০টি অকল্যাণ থেকে*। আসলে সাদাকা শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ অনেকগুলো। সেবা সহযোগিতা সৎকর্ম দান—এগুলোর সম্মিলিত রূপ সাদাকা। যত কল্যাণকর কাজ আছে, সমস্ত কল্যাণকর কাজ একটা শব্দ দিয়ে বলা হয়েছে—সাদাকা।

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (স) বলেছেন, 'সাদাকা অকল্যাণের ৭০টি দরজা বন্ধ করে'। *[বুরাইদা ইবনে হাসিব (রা); আহমদ]*

সাদাকা বা দান কীভাবে অকল্যাণের দরজা বন্ধ করে কল্যাণের দরজা খুলে দেয় সেটা আমরা গত ২০ বছর ধরে প্রত্যক্ষ করেছি। আগে শুধু শুনতাম, ঠিক সেইভাবে দেখি নি। সেগুলো আমাদের কাছে ঘটনা ছিল, উদাহরণ ছিল, কাহিনী ছিল। কিন্তু কোয়ান্টামকালে অর্থাৎ গত ২০ বছরে যখন আমরা ব্যাপকভাবে সাদাকা শুরু করলাম, আমাদের নিজেদের জীবনেই অসংখ্য উদাহরণ, অসংখ্য ঘটনা, অসংখ্য কাহিনী সৃষ্টি হলো। কোনো কোনোটি অনেকের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। বিশ্বাস করা কঠিন বিশেষজ্ঞদের পক্ষেও; যে, এভাবে অকল্যাণ দূর হয়ে যেতে পারে!

বিপদ-বাধা, বালা-মুসিবত, ঝামেলা আসে তুফানের মতো। উবে যায় বুদবুদের মতো। এর মূল কারণ হচ্ছে এই সাদাকা, সেবা এবং কল্যাণচিন্তা।

একটি ঘটনা বিশেষভাবে মনে পড়ে।

আমাদের এক গ্রাজুয়েট। তার স্ত্রী ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র প্রফেসর এবং কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের

প্রধান। খুব ভালো মানুষ। তাদের নাতির জন্মের সময় দুটো পায়েই ত্রুটি ছিল। তাই দূর হওয়া খুব কঠিন।

কানাডাতে ডাক্তাররা বলে দিলেন যে, এটা দুরারোগ্য ব্যাধি। ভালো হবে না। কিন্তু স্রষ্টার ওপর সেই পরিবারের বিশ্বাস ছিল অগাধ। তারা নিয়মিত দান শুরু করলেন নাতির কল্যাণ কামনায়। সদকা হিলিং শুরু হলো। ডাক্তারদের অবাক করে কয়েক মাসে শিশুটির দুটো পা-ই ভালো হয়ে গেল।

সর্বাধুনিক হাসপাতালের ডাক্তাররা যেখানে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন, সেখানে পরম করুণাময়ের রহমতে দান ও দোয়ার বরকতে সে শুধু স্বাভাবিকভাবে হাঁটা এবং দৌড়ানো নয়, অত্যন্ত মেধাবী কিশোর হিসেবে বেড়ে উঠল। ক্লাসে তার টিচাররা তাকে ডাকতে শুরু করলেন এক্সট্রা অর্ডিনারি জিনিয়াস বয়।

যদি জিজ্ঞেস করেন—বৈজ্ঞানিক সূত্রটা কী? সূত্র খুব সহজ। নিউটনের থার্ড ল' আমরা সবাই জানি। For every action there is an equal and opposite reaction. এটা বৈজ্ঞানিক সূত্র। আর সাদাকার ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম নিয়ম হচ্ছে আল্লাহর সরাসরি নিয়ম। সেখানে ইকুয়াল রি-একশন নয়, এক্সট্রা অরডিনারি রি-একশন হয়। অর্থাৎ সৎ দানের বরকত ৭০০ গুণ, এটা ইকুয়াল নয়। আল্লাহর মাপ এবং মানুষের মাপের মধ্যে অনেক তফাত।

প্রকৃতির নিয়ম হচ্ছে, যদি আপনি কিছু পেতে চান, আপনাকে তা আগে দিতে হবে। না দিয়ে আপনি কিছু পাবেন না। আপনি যা দেবেন সেটা প্রকৃতিতে জমা হতে থাকবে। যখন আপনার পাওয়ার সময় আসবে তখন আপনাকে প্রকৃতি উজাড় করে দেবে।

সাদাকা মানে শুধু অর্থ দান নয়; প্রতিটি ভালো কাজ হচ্ছে সাদাকা। হাসিমুখে কথা বলা সাদাকা। পারিবারিক কাজে স্ত্রীকে সহযোগিতা করা সাদাকা। এতিম-মিসকিন, অসহায়, বিধবাদের সেবাযত্ন করা সাদাকা, তাদের লালন করা সাদাকা। কাউকে সৎ পরামর্শ দিলেন—এটা সাদাকা। ক্ষুধার্তকে আহার দেয়া সাদাকা। তৃষিতকে পানি পান করানো সাদাকা।

পানির আরেক নাম জীবন। পানি সরবরাহ করা—এই সাদাকা যে কত বরকতময় হতে পারে! সাদাকার মধ্যে সেরা হচ্ছে 'সদকায়ে জারিয়া' অর্থাৎ বহমান সৎকর্ম। আপনারা জানেন, বিশেষত যারা সিরাত পড়েছেন তারা সবাই জানেন—মক্কায় কোরাইশদের নিপীড়নের ফলে নবীজী (স) এবং

সেখানে যত মুসলমান ছিলেন তারা দেশত্যাগ করে মদিনায় চলে গেলেন। শরণার্থীদের জীবন অত্যন্ত কষ্টের। যাদেরকে আমরা মুহাজের অর্থাৎ হিজরতকারী বলি। শরণার্থী বাংলা শব্দ। মুহাজের আরবি শব্দ। মুহাজেররা যখন মদিনায় পৌঁছলেন, তখন তাদের সবচেয়ে বড় অভাব ছিল পানির।

যে বছর তারা হিজরত করলেন, সে বছর প্রচণ্ড খরা হলো। মদিনার আশেপাশে যত কূপ ছিল, সব কূপের পানি শুকিয়ে গেল। শুধু একটি কূপে পানি ছিল, যেটাকে বলা হতো বীরে রুমা। বীর মানে হচ্ছে কূপ। কূপটির মালিক এক ইহুদি। যখন পানির অভাব হলো তখন সে দেখল, এই সুযোগ!

কিছু কিছু ব্যবসায়ী পণ্যের কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টি করে দাম বাড়ায়। পণ্য সরবরাহে ঘাটতি হলে সেসব ব্যবসায়ীর তো পোয়াবারো! ক্রেতার মুখের হাসি শুকিয়ে যায় আর বিক্রেতার মুখে হাসি ফোটে।

সেই ইহুদিও পানির দাম বাড়িয়ে দিলো অস্বাভাবিক রকম। পানির অভাবে মুসলমানদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল। ইহুদিরা আহলে কিতাব—বেহেশত-দোজখ বিশ্বাস করে। পরিস্থিতি দেখে নবীজী (স) ইহুদিকে প্রস্তাব দিলেন যে, জান্নাতে একটা ঝর্নার বিনিময়ে তুমি এই কূপটা দিতে রাজি আছ কি? ইহুদি রাজি হলো না। সে বলল, নগদ টাকা দিলে রাজি আছি, জান্নাতের ঝর্নার বিনিময়ে নয়।

এই ঘটনা উসমান ইবনে আফফান (রা), যিনি পরবর্তীকালে তৃতীয় খলিফা হয়েছিলেন, তার কানে গেল। উসমান (রা) ধনাঢ্য কোরাইশ ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান ছিলেন। ব্যবসা তিনি খুব ভালো বুঝতেন। উসমান (রা) যখন খলিফা হলেন, তার ব্যবসায়িক বুদ্ধির কারণে তিনি আরবে প্রথম মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু করলেন। আরবে কোনো অভাব আর থাকল না।

চেক পদ্ধতি তখন থেকে শুরু। তখন আরবিতে চেক-কে বলা হতো শাক। শাক পরবর্তীকালে হয়ে গেল ব্যাংকের চেক। অর্থাৎ কাগজে লিখে দেয়া যে, তাকে টাকা দিয়ে দাও। ব্যবসায়িক স্বাক্ষর থাকলে এটাই হলো টাকা। সেই সময় তিনি এই পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। মদিনাতেও খুব অল্প সময়ে তিনি ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন।

তিনি নবীজীর (স) কাছে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমি যদি মুসলমানদের জন্যে এই কূপটি কিনে নিই, তাহলে জান্নাতে আমাকে কি একটা ঝর্না দেয়া হবে? নবীজী (স) বললেন, হাঁ, দেয়া হবে। উসমান (রা) তখন ইহুদির কাছ থেকে কূপটি কিনে নেয়ার প্রস্তাব করলেন। মশক মশক পানি বিক্রি করে

ইহুদির তখন এত লাভ হচ্ছে যে, উসমানের প্রস্তাব সে প্রত্যাখ্যান করল।

উসমান (রা) আবার প্রস্তাব করলেন যে, ঠিক আছে। কূপের অর্ধেক বিক্রি করো। আধাআধি। ইহুদিও হিসাবে পাকা। সে ভাবল যে, আধাআধি দিলে তো একসাথে অনেক টাকা পাচ্ছি। আবার কূপের অর্ধেক মালিকানাও আমার থাকছে। সে আধাআধিতে রাজি হয়ে গেল। আধা বিক্রি করে দিলো। এরপর ঠিক হলো, একদিনের পানির দাম পাবে উসমান (রা)। আরেকদিনের পানির দাম পাবে ইহুদি। একদিন পর একদিন।

উসমান (রা) কূপ কিনেই পানি ফ্রি করে দিলেন। বললেন, মুসলমানরা! যত ইচ্ছা পানি নিয়ে যাও। মুসলমানরা দেখল যে, পরের দিন ইহুদির কাছ থেকে পানি কেনার দরকার কী! তারা উসমানের (রা) বরাদ্দের দিনে বিনামূল্যে পানি তুলে নিত। পরদিন ইহুদি বসে থাকে। সেদিন কেউ পানি নিতে যায় না। এরপরের দিন আবার উসমানের (রা) দিন।

ইহুদি দেখল যে, ইয়া আল্লাহ! অর্ধেক দামে অর্ধেক কূপ বিক্রি করলাম একসাথে অনেক টাকা পাওয়ার আশায়। এখান থেকে তো আর কোনো আয় নেই! এজন্যে ইহুদি পুরো কূপই বিক্রি করে দিলো ২০ হাজার দিরহামে। তখনকার দিনে ২০ হাজার দিরহাম মানে বিপুল অর্থ! ১৪শ বছর ধরে সেই কুয়ার পানি কখনো শুকায় নি। নবীজীর (স) যুগে মদিনায় যত কূপ ছিল, তার মধ্যে বীরে রুমাই এখন পর্যন্ত টিকে আছে। সেই কালের আর কোনো কূপ এখন টিকে নেই। এই কূপটিই 'বীরে উসমান' নামে বিখ্যাত।

সবসময় মনে রাখবেন, ব্যবসায়ীদের বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর। হিসাবটা তারা খুব ভালো বোঝে। উসমান (রা) কূপটি পুরোপুরি কিনে নিলেন এবং তা ওয়াকফ করে দিলেন। ওয়াকফ মানে জনকল্যাণার্থে দান। সদকায়ে জারিয়া।

উসমানের (রা) মৃত্যুর পরে কূপের আশেপাশে খেজুর বাগান গড়ে ওঠে। যখন তুরস্ক উসমানিয়া খেলাফতের অধীন হলো, তখন তুর্কিরা মদিনার এই খেজুর বাগানকে আরো বড় করল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে উসমানিয়া খেলাফত বিলুপ্ত হলে সৌদি সরকার এটার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করল। তারা বীরে উসমান এবং সমগ্র খেজুরবাগানের মোতাওয়াল্লি হয়ে গেল। তাদের পরিচর্যায় খেজুরবাগান বাড়তে লাগল। যে খেজুর উৎপাদন হতো, ওয়াকফ মোতাওয়াল্লিরা সেটা দুই ভাগ করতেন। অর্ধেক এতিম এবং দরিদ্রের কল্যাণে ব্যয় হতো। আর অর্ধেক ফান্ডে সংরক্ষণ হতো।

ফান্ড সংরক্ষণ করার জন্যে উসমান ইবনে আফফান নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করা হলো এবং সে অ্যাকাউন্টে অর্থ জমা হতে লাগল। যখন জমি কেনার মতো টাকা জমা হলো, মদিনার একেবারে কেন্দ্রস্থলে জমি কেনা হলো এবং সেখানে এখন ফাইভ স্টার হোটেল নির্মিত হয়েছে। সেই হোটেল থেকে যে আয় হয়, বছরে তার পরিমাণ পাঁচ কোটি সৌদি রিয়াল, যা আমাদের টাকায় ১০০ কোটি টাকা। এর অর্ধেক দুস্থ-বঞ্চিতদের জন্যে ব্যয় করা হবে এবং বাকি অর্ধেক সেই ওয়াকফের অ্যাকাউন্টে জমা হতে থাকবে।

১৪শ বছর আগে করা একটা সাদাকা, একটা দান, ওয়াকফ—সেটার বার্ষিক আয় এখন আমাদের টাকায় ১০০ কোটি টাকা! উসমানের (রা) মৃত্যুর এত বছর পরেও তার নামে দান হচ্ছে, জমি কেনা হচ্ছে, ব্যাংকে টাকা জমা হচ্ছে। আর জান্নাতে একটা ঝর্নার প্রতিশ্রুতি তো তিনি আগেই পেয়েছেন।

দানের প্রতিদান স্রষ্টা সবসময় নিজে দেবেন। এটা তাঁর ওয়াদা। আর স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্যে যে দান, তার প্রতিদান সার্বজনীন। ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকল দাতার জন্যেই। তিনি মুসলমান, হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ—যিনিই হোন, দানের প্রতিদান স্রষ্টা তাকে দেবেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, '... (হে মানুষ!) যে অর্থবিত্ত তোমরা দান করো, সে দান তো তোমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্যেই। তোমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে ব্যয় করো। অতএব দানের পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদেরকে অবশ্যই দেয়া হবে। তোমাদের হক কখনো নষ্ট করা হবে না।' *[সূরা বাকারা : ২৭২]*

মহামতি বুদ্ধ বলেছেন, 'প্রকৃত নিরন্ন মানুষকে যে অন্ন দান করে, সে পরলোকে স্বর্গে গমন করবে।' *[ইতিবুত্তক : ২৬]*

বাইবেলে বলা হয়েছে, 'কোনো বিধবা বা অনাথের প্রতি দুর্ব্যবহার করবে না। তাদের সাহায্য করা থেকে বিরতও থাকবে না। যদি তা করো আর তারা আমাকে ডাকে তাহলে আমি অবশ্যই তাদের কান্না শুনতে পাব।' *[যাত্রাপুস্তক ২২ : ২২-২৭]*

দান করতে হবে নিয়মিত। কেন? আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেকদিন সকালবেলা একজন ফেরেশতাকে নিযুক্ত করেন। যে দান করল তার জন্যে প্রার্থনা করেন সেই ফেরেশতা। যখন সকালবেলা আপনি দান করছেন, আল্লাহর নিযুক্ত একজন ফেরেশতার দোয়া নিয়ে দিন শুরু করছেন।

ফেরেশতার দোয়াটা কী? 'হে আমাদের প্রতিপালক! যারা আজকে দান করছে, তাদের উত্তম পুরস্কার দাও।' *[আবু হুরায়রা (রা); বোখারী, মুসলিম]*

দান করতে হবে সঙ্ঘবদ্ধভাবে। তাহলে সেই দানটা সদকায়ে জারিয়া হয়ে যাবে। যেমন : বীরে উসমান কূপ। ১৪শ বছর ধরে এই দানে মানুষ উপকৃত হচ্ছে এবং সমস্ত সওয়াব উসমানের (রা) আমলনামায় জমা হচ্ছে।

ব্যক্তিগত দান কী? ব্যক্তিগত দান হচ্ছে মরুভূমিতে এক বালতি পানি ফেলার মতো, যা কিছুক্ষণ পরে শুকিয়ে যায়। আপনি ব্যক্তিগতভাবে হাসপাতাল করতে পারেন, এতিমখানা করতে পারেন, অনেক কিছু করতে পারেন, কিন্তু আপনার মৃত্যুর পর কী হবে? এই হাসপাতালে কে আসবে? এই এতিমরা কোথায় যাবে? অর্থাৎ ব্যক্তিগত দানটা শুকিয়ে যায়। কিন্তু যখন সঙ্ঘবদ্ধভাবে দান করা হয়, এই দান প্রবহমান থাকে অনন্তকাল।

২০০১ সালে সাতটি শিশুকে নিয়ে আমরা লামায় একটা কুঁড়েঘরে শিশুকানন শুরু করেছিলাম। সে ঘরও এখন নেই। সেই সময় শিশুদেরকে একটা সেদ্ধ ডিম অর্ধেক করে কেটে দিতাম। আস্ত ডিম দেয়ার সামর্থ্য ছিল না। এমনকি আস্ত গোল আলুও তাদেরকে দেয়া যেত না, আলু কেটে দেয়া হতো। আজ সেখানে আড়াই হাজার শিশু-কিশোর-কিশোরী। আল্লাহর রহমতে তাদের যত্নে কোনো ঘাটতি নেই। কেন? সঙ্ঘবদ্ধ দানের ফলে।

প্রাইমারি স্কুল ছিল। প্রাইমারি স্কুল থেকে হাই স্কুল হলো। হাই স্কুল থেকে হলো কলেজ। কলেজ থেকে এখন কারিগরি স্কুল। কারিগরি স্কুল থেকে এরপরে পলিটেকনিক, বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ—ক্রমান্বয়ে যখন হবে, কী হবে? এই দান চলতে থাকবে শত বছর, হাজার বছর। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জ্ঞানের আলো, শুদ্ধাচারের আলো, সুস্থতা ও সমমর্মিতার আলো বিকিরণ করতে থাকবে।

আপনার দান যা-ই হোক না কেন—১০০ টাকা, ৫০০ টাকা, হাজার টাকা, ১০, ১৫, ৩০, ৫০ হাজার টাকা—শত বছরে যত দান জড়ো হবে, সে দান থেকে সদকায়ে জারিয়া হিসেবে বহমান সওয়াব ও কল্যাণ আপনি পেতে থাকবেন। যিনি এখন ৫০০ টাকা দিচ্ছেন, পাঁচ হাজার দিচ্ছেন—এটা তো ৫০০ বা পাঁচ হাজার টাকা নয়! শুরু থেকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে যত কোটি কোটি টাকা দান সঙ্ঘে জমা হয়েছে, তার-ই অংশ হচ্ছে এই টাকা।

আমরা যত দাতা হবো তত স্মরণীয় হবো। সৎকর্মে যত যুক্ত হবো, সঙ্ঘের সাথে যত একাত্ম থাকব, সঙ্ঘের মানুষগুলো আপনাকে তত স্মরণ করবে। সঙ্ঘের সাথে যারা ছিলেন, যাদের শ্রম এবং মেধায় এই সমস্ত কিছু

গড়ে উঠেছে, আজ এখানে দাঁড়িয়ে সবার কথাই মনে হয় এবং তাদের সবার জন্যেই আমরা দোয়া করি।

মওলানা ছায়ীদুল হক, যিনি প্রথম এখানে এসে আজান দিয়েছিলেন। তার আলোচনা তো আপনারা শুনেছেন। তার দোয়ায় শরিক হয়েছেন অনেকেই। তিনি ২০১৯ সালে আল্লাহর কাছে চলে গেছেন। আল্লাহ তাকে কবুল করুন। যত মানুষ তার সঙ্গে দোয়ায় শরিক হয়েছেন, তারা কেউ কি তার জন্যে দোয়া না করে পেরেছেন? এমনকি যারা তার সম্পর্কে শুনেছেন তারাও তার জন্যে দোয়া করেছেন।

২৫ ফেব্রুয়ারি তার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী ছিল। তার জন্যে আমরা দোয়া করেছি। আল্লাহ তার সমস্ত ভালো কাজ কবুল করুন! কত মানুষকে যে তিনি দানে উদ্বুদ্ধ করেছেন! তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে যত মানুষ দান করছে, সবার দানের সওয়াব দাতার পাশাপাশি তিনিও পেতে থাকবেন। অর্থাৎ শুধু সরাসরি দান করলেই নয়, আপনি যাকে দানে উদ্বুদ্ধ করলেন, সেই দাতার পাশাপাশি দানের সওয়াব আপনার আমলনামায়ও লেখা হতে থাকবে।

এবছর কোয়ান্টারা পিএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। এবার সরই ইউনিয়নে যারা বৃত্তি পেয়েছে, সবাই কোয়ান্টা। ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে ছয় জন। সাধারণ বৃত্তি পেয়েছে সাত জন। মোট ১৩ জন। আমাদের মেয়ে কোয়ান্টারা ভলিবল খেলে এই প্রথমবার ন্যাশনাল স্কুল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ওদেরকে প্রথমে কেউ পাত্তা দেয় নি। কারণ ওরা যাদের সাথে খেলেছে, অনেক বড় তারা। আমরা ওদের সবাইকে অভিনন্দন জানাই।

আমরা করুণাময়ের শুকরিয়া আদায় করি যে, আমাদের কোয়ান্টারাও দান করতে অভ্যস্ত হয়েছে। আমাদের কলেজ বিল্ডিং থেকে আবাসনে যাওয়ার পথে পুল আছে। কোয়ান্টারা বাঁশ জোগাড় করেছে এবং নিজেরাই পুল নির্মাণ করেছে। এই শিশুরা সত্যিকার অর্থেই দাতা। আজীবন তারা দাতা থাকুক—এটাই আমরা দোয়া করি।

সাদাকায়ন : ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০; কোয়ান্টামম

কোয়ারেন্টিন ॥
নতুন উপলব্ধির পথ

প্রিয় সুহৃদ! যখন চারপাশে বিভ্রান্তি থাকে, ভুলের ছড়াছড়ি থাকে, আতঙ্কের ছড়াছড়ি থাকে, তখন মানুষ আশ্বস্ত হতে চায়। শোকর আলহামদুলিল্লাহ! আমরা নিজেদের আশ্বস্ত করার মতো একটা জায়গা তৈরি করতে পেরেছি, সেটি হচ্ছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। এ ব্যাপারে আমাদের কারো মনেই কোনো সংশয় নেই। তাই কোয়ান্টামের সাথে চললে স্বাভাবিকভাবেই আস্থা বাড়বে। এজন্যেই সৎসঙ্ঘে একাত্ম থাকার, মিশে থাকার গুরুত্ব এত!

আতঙ্কের একটা গ্রামার আছে। কোথাও কোনো ঘটনা ঘটলে সেটি যে কত ভয়াবহ, কত লোক মারা গেছে, কত ক্ষয়ক্ষতি, কত ধ্বংস হয়েছে, কত মানুষ অসহায় হয়ে পড়েছে—এভাবে প্রচার করা হয়। ফোলানো-ফাঁপানো হয়। কিন্তু যখন ফুলতে ফুলতে জিনিসটা ফেটে যায়—ভেতরের সত্যটা বেরিয়ে আসে। তখন আবার বলা শুরু হয় যে, ভবিষ্যতে কত ভয়াবহ হতে পারে, যাতে সত্য জেনেও আতঙ্ক থেকে মানুষ বেরিয়ে আসতে না পারে।

২০১৯-এর ডিসেম্বরে চীনে প্রথম করোনা ধরা পড়ল। তিন মাস পর WHO এটাকে বৈশ্বিক মহামারি হিসেবে ঘোষণা করল। চীনে কত কোটি লোক মৃত্যুবরণ করতে পারে—এ নিয়ে নানারকম জল্পনা-কল্পনা হলো। সারা পৃথিবীতে আতঙ্ক শুরু হলো। বিমান চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। বিদেশ থেকে কেউ এলেই কোয়ারেন্টিন! অনেক দেশে স্কুল-কলেজ বন্ধ। বাস্তবতা কী? আজ ২১ মার্চ ২০২০। এ পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে আক্রান্ত হয়েছে দুই লক্ষ ৭৬ হাজার ছয় শত ৬৫ জন। মারা গেছে ১১ হাজার চার শত ১৯। সেরে উঠেছে প্রায় ৯২ হাজার। এই হচ্ছে বাস্তবতা।

যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ১৮ হাজার সাত শত ৬৩ জন, মারা গেছে দুই শত ৫৮ জন। ব্রিটেনে আক্রান্ত হয়েছে তিন হাজার নয় শত ৮৩ জন। মারা গেছে একশ ৭৭ জন। ফ্রান্সে আক্রান্ত হয়েছে ১২ হাজার ছয় শত ১৫ জন। মারা গেছে চার শত ৫০ জন। ইতালির অবস্থাটা ইউরোপের মধ্যে একটু খারাপ। সেখানে মারা গেছে চার হাজার ৩২ জন।

করোনাভাইরাসে যারা আক্রান্ত হয়, তাদের ৮১ শতাংশ মাইল্ড অসুস্থ হয়। এজন্যে হাসপাতালে যাওয়ারও কোনো প্রয়োজন হয় না। ১৪ শতাংশ রোগীকে হাসপাতালে নিতে হয়। বাকি পাঁচ শতাংশ ক্রিটিক্যাল রোগী। তাদেরকে ইনটেনসিভ কেয়ারে নিতে হয়। তাদের অক্সিজেন সাপোর্ট লাগে। এটা নিউইয়র্ক টাইমসের ১৮ মার্চের রিপোর্ট।

তাহলে যে রোগের ৮১ শতাংশের জন্যে হাসপাতালেও নেয়ার প্রয়োজন হয় না—মাইল্ড সর্দি-কাশি-জ্বর, তাকে ফ্লু ছাড়া আর কী বলা যায়! আর করোনাভাইরাসের নামে যে আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে, এটা ফ্লুর-ই একটিভ ভ্যারিয়েশন। কখনো সার্স নামে, সোয়াইন ফ্লু নামে, কখনো অন্য কোনো ফ্লু নামে—বিভিন্ন সময়ে নতুন নামকরণ করা হয়। প্রত্যেকটা রোগের ধরন কিছু কিছু বছর পরে পাল্টায় এবং আতঙ্কটাও কিছু কিছু বছর পরে শুরু হয়।

এখন মনে করা হচ্ছে, ভারতে করোনাভাইরাসের ভয়াবহ সুনামিতে ৩০ কোটি লোক আক্রান্ত হতে পারে! বাস্তবে এখন পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে দুই শত ৭১ জন। মারা গেছে তিন জন। এটা ইকোনমিক টাইমস, ২১ মার্চ ২০২০-এর রিপোর্ট। এর আগেও WHO সোয়াইন ফ্লু নিয়ে কী কাণ্ড করেছিল! সেই সোয়াইন ফ্লু কিন্তু এখন নরমাল ফ্লুর রূপ নিয়েছে।

আমরা যাকে জ্বর-সর্দি-কাশি বলি, ইউরোপ-আমেরিকাতে তাকেই বলা হয় ফ্লু বা ইনফ্লুয়েঞ্জা। নভেম্বর-ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ইনফ্লুয়েঞ্জা থাকে। এটা শীতকালের রোগ। শীত আসা এবং শীত যাওয়ার সময় মানুষ সাধারণত ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়।

২০১৬-১৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে মৌসুমি ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়েছিল দুই কোটি ৯০ লক্ষ মানুষ। হাসপাতালে ভর্তি হয় পাঁচ লক্ষ। মারা গেছে ৩৮ হাজার। ২০১৭-১৮-তে আক্রান্ত হয় সাড়ে চার কোটি আমেরিকান। হাসপাতালে ভর্তি হয় আট লক্ষ ১০ হাজার। মৃত্যু হয়েছে ৬১ হাজার। ২০১৮-১৯-এ আক্রান্ত হয় সাড়ে তিন কোটি। হাসপাতালে ভর্তি হয় চার লক্ষ ৯০ হাজার ছয় শত।

মৃত্যু হয়েছে ৩৪ হাজার দুই শত। এটা Center for Disease Control and Prevention-এর ওয়েবসাইট থেকে নেয়া।

ব্রিটেনে কী অবস্থা? পাবলিক হেলথ ইংল্যান্ডের তথ্য অনুসারে, প্রতিবছর ইংল্যান্ডে ১৭ হাজার মানুষ সিজনাল ফ্লু-তে মারা যায়। ২০১৪ সালে ২৮ হাজার তিন শত ৩০ জন মারা গেছে। এবছর করোনায় আক্রান্ত হয়েছে তিন হাজার নয় শত ৮৩ জন। মারা গেছে একশত ৭৭। ২১ মার্চ ২০২০, দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট-এর রিপোর্ট। এ থেকেই কিন্তু বুঝতে পারি যে, ফ্লু-তে আক্রান্ত হয়ে কোভিডের চেয়ে কত বেশি মানুষ মারা যায় প্রত্যেক বছর!

বলা হচ্ছে, ইতালি এবং স্পেনের পরে ফ্রান্সের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। ফ্রান্সে করোনায় এ পর্যন্ত মারা গেছে চার শত ৫০, আক্রান্ত ১২ হাজার ছয় শত ১২। অথচ ফ্রান্সে প্রতিবছর ফ্লু-তে আক্রান্ত হয় ২০ লাখ থেকে ৬০ লাখ মানুষ। ২০১৬-১৭ সালে শীতকালীন ফ্লু-তে মারা যায় ১৪ হাজার চার শত। ২০১৭-১৮ সালে ১৩ হাজার; গত বছর নয় হাজার ফরাসি ফ্লুতে মারা গেছে।

ইতালির অবস্থা—ওখানে সিজনাল ফ্লু সবসময়ই বেশি। ইতালিতে বয়স্ক লোকের সংখ্যা পৃথিবীতে দ্বিতীয় বৃহত্তম। করোনায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি তাদের, যাদের ডায়াবেটিস বা ক্যান্সার থাকে, কিডনি, হার্ট বা লিভারের অসুস্থতা থাকে। অর্থাৎ আগে থেকে রোগগ্রস্ত বা বয়স্ক।

ভারতে কিন্তু সোয়াইন ফ্লু-কে ‘নরমাল ফ্লু’ বা ‘সিজনাল ইনফ্লুয়েঞ্জা’ হিসেবে ক্লাসিফাই করা হয়েছে। ২০১৭ সালে ভারতে সোয়াইন ফ্লু-তে আক্রান্ত হয় ৩৮ হাজার আট শত ১১ জন। মারা গেছে দুই হাজার দুই শত ৭০ জন। ২০১৮-তে আক্রান্ত হয় ১৫ হাজার দুই শত ৬৬। মারা গেছে একহাজার দুই শত ১৮ জন। ২০১৯ সালে আক্রান্ত হয় ২৮ হাজার সাত শত ৯৮ জন। মারা গেছে একহাজার একশত ৮২ জন।

আর ২০২০-এর জানুয়ারি থেকে ১ মার্চ পর্যন্ত দুই মাসে সোয়াইন ফ্লু-তে আক্রান্ত হয়েছে একহাজার চার শত ৬৯, মারা গেছে ২৮ জন। অন্যদিকে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে দুই শত ৭১ জন এবং মারা গেছে তিন জন। *[২১ মার্চ, ২০২০]* সোয়াইন ফ্লু-তে যে এত জন মারা গেল, ভারতে মিডিয়া কি এটাকে নিউজ করেছে? না, করে নি।

আপনারা জানেন যে, একসময় চীনের অংশ ছিল তাইওয়ান। WHO বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন, তাইওয়ানে করোনা-পরিস্থিতি হবে মারাত্মক। কারণ তাইওয়ান চীনের কাছাকাছি। এখানকার মানুষও দেখতে শুনতে একরকম।

খাদ্যাভ্যাসও একরকম। ২১ মার্চ পর্যন্ত তাইওয়ানে আক্রান্ত হয়েছে ৭৭ জন। মারা গেছে একজন। তাইওয়ানকে আমরা অভিনন্দন জানাই। কারণ সেখানে যখন করোনা নিয়ে অপপ্রচার শুরু হলো, সরকার খুব দ্রুত পদক্ষেপ নিচ্ছিল। অপপ্রচার কী পরিমাণ যে, চীনে করোনা ছড়ানোর পরেই সোশ্যাল মিডিয়া গুজব ছড়ায়—দক্ষিণ তাইওয়ানে ট্রাকে ট্রাকে লাশ চুল্লিতে নিয়ে গিয়ে পোড়ানো হচ্ছে।

এই গুজব ঠেকানোর জন্যে তাইওয়ানে মিডিয়া—টিভি এবং রেডিও খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। করোনাভাইরাস কীভাবে ছড়ায়, সংক্রমণ ঠেকানোর উপায় কী—এটা তারা খুব ইতিবাচকভাবে প্রচার করে। ফলে মানুষ আতঙ্কিত না হয়ে আশ্বস্ত হয় এবং সময়মতো তারা প্র্যাকটিক্যাল পদক্ষেপ নেয়। আর ওখানে বিদেশ ফেরত প্রত্যেককে হোম কোয়ারেন্টিনে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। আসলে এই ধরনের কাজে সরকারের সাথে সবসময়ই সাধারণ মানুষের সহযোগিতা এবং স্বেচ্ছাসেবীদের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

তাইওয়ানের সরকার কী করেছে? প্রতি দুই ঘণ্টা পর পর আক্রান্ত ব্যক্তি বাসায় আছেন কিনা—এটা নিশ্চিত করা হয়েছে মোবাইল ট্র্যাকিং-এর মাধ্যমে। কোয়ারেন্টিন না মানলে কঠোর জরিমানার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেখানে মনে করা হচ্ছিল যে, চীনের পরে তাইওয়ানে হবে সবচেয়ে বড় বিপর্যয়। সেখানে অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, হোটেল-রেস্টুরেন্ট—সব ওপেন এবং টোটালি কন্ট্রোলড।

সেখানে এক দম্পতি মনের আনন্দে কোয়ারেন্টিন ভেঙে বেরিয়ে গেছে এবং তাদেরকে এজন্যে গুণতে হয়েছে মাত্র ৩০ লক্ষ তাইওয়ানি ডলার অর্থাৎ ১০ হাজার ডলার! এরপর আর কেউ কোয়ারেন্টিন ছেড়ে বাইরে যায় নি। সেখানে অ্যাপার্টমেন্ট, সুপার শপ—সব খোলা। শুধু হাত ধোয়ার ব্যবস্থা রেখেছে। আমরা শান্তিনগরে কোয়ান্টাম ল্যাবে ঢোকার আগে বাংলা সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করে রেখেছি। বাংলা সাবানের মতো এরকম চমৎকার পরিষ্কারক আর কিছু নেই। কারণ বাংলা মানেই হচ্ছে খাঁটি।

আমরা অধিকাংশই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত শুদ্ধাচার অনুসরণ করি। যে কারণে বাংলাদেশে করোনার সুবিধা করতে পারার সম্ভাবনা কম। আর ডাক্তাররা এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে—হাত ভালোভাবে ধোয়া, কারো হাঁচি-কাশি বা এই জাতীয় কোনোকিছু দেখলে তার থেকে দুই/ তিন ফুট দূরত্ব থাকা, তার স্পর্শের মধ্যে না যাওয়া—এই পদক্ষেপগুলো নিতে হবে।

আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। যে-কোনো ক্রাইসিসকে কাটিয়ে ওঠার ক্ষমতা ও আমাদের ব্রেনের কর্মক্ষমতা। কারণ আমাদের পূর্বপুরুষেরা সবসময় দুর্যোগের মধ্যে বসবাস করে এসেছে। দুর্যোগ মোকাবেলায় আমাদের কোনো জুড়ি নেই। আমরা বীরের জাতি। আমরা সাহসী। করোনাকে এই জাতির ভয় পাওয়ার কিছু নেই। শুধু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

যারা বিদেশ-ফেরত, তারা অনেক পরিশ্রম করে, মেহনত করে পরিবার-পরিজনের জন্যে দেশে অর্থ প্রেরণ করেন। সেই পরিবারগুলোর উচিত এই সময়ে তাদের ভালোভাবে সেবাযত্ন করা। তারা যদি জ্বর-কাশি-সর্দিতে আক্রান্ত হন, তাহলে ১৫ দিন কোয়ারেন্টিনে থাকবেন।

তবে কোয়ারেন্টিনে থাকার সুযোগ সবারই গ্রহণ করা উচিত। ইটস আ ওয়ান্ডারফুল থিং। জীবনের জন্যে কোয়ারেন্টিনকে আশীর্বাদ হিসেবে গণ্য করা উচিত। কারণ মানুষ আসলে খুব কমই সময় ও সুযোগ পায় এরকম নিরিবিলি থাকার, একা থাকার, কোয়ারেন্টিনে থাকার।

রসুলুল্লাহ (স) হচ্ছেন কোয়ারেন্টিনের পথ প্রদর্শক। রসুলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ ছিল, 'যদি কোনো স্থানে মহামারি দেখা দেয়, সে এলাকায় প্রবেশ করবে না। আর আক্রান্ত এলাকা থেকে কেউ বেরিয়েও আসবে না।' *[উসামা ইবনে জায়েদ (রা); মুসলিম]*

নবীজী (স) যে শুধু কোয়ারেন্টিনের ধারণা দিয়েছেন তা-ই নয়, তাঁর সাহাবীরা এটা পালনও করেছেন। আর পাশ্চাত্যে কোয়ারেন্টিনের ধারণা আসে এরও ৭০০ বছর পর।

রোমানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধের একপর্যায়ে সিরিয়ায় প্লেগ দেখা দিলো। যে শহরে প্লেগ দেখা দিয়েছিল, সেখানে তখন কমান্ডার ইন চিফ ছিলেন আবু ওবায়দা (রা)। ওমর (রা) তাকে সেখান থেকে ডেকে পাঠালেন। কারণ ওখানে থাকলে তিনি আক্রান্ত হতে পারেন। কিন্তু আবু ওবায়দা খুব বিনয়ের সাথে ফিরে আসতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেছিলেন, 'আমি নবীজীর (স) হাদীস স্পষ্টভাবেই শুনেছি যে, আক্রান্ত এলাকায় কেউ প্রবেশ করবে না এবং সেখান থেকে কেউ বেরিয়েও আসবে না।' তিনিই প্রথম কোয়ারেন্টিন পালনকারী সাহাবী। তার সাথে যে সৈন্যদল ছিল, কেউই ওখান থেকে বেরিয়ে আসেন নি।

এখন বুঝতে পারছেন, যে-কাজের নির্দেশ রসুলুল্লাহ (স) দিয়েছেন সেটা

পালন করা, অনুসরণ করা কতটা পুণ্যের, কতটা সওয়াবের, কতটা উপকারী! অতএব কেউ যখন কোয়ারেন্টিনে থাকছেন, তিনি আল্লাহর রসুলের (স) একটা নির্দেশ পালন করার সুযোগ পাচ্ছেন। তিনি সৌভাগ্যবান হচ্ছেন—এই আনন্দ অনুভূতি নিয়ে কোয়ারেন্টিনে থাকবেন।

কোয়ারেন্টিন আপনার জীবনে সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ হতে পারে। সেটা হোম কোয়ারেন্টিন হোক, ক্যাম্প অথবা হসপিটাল কোয়ারেন্টিন হোক। এই সময়টা নিজের আত্মিক পরিশুদ্ধির জন্যে; মন, মনন ও সৃজনশীলতার পরিশুদ্ধির জন্যে এবং ব্রেনটাকে আরো ভালোভাবে কাজে লাগানোর জন্যে ব্যয় করতে পারেন।

এই সময়ে সবচেয়ে ভালো কাজ হচ্ছে প্রাণায়াম চর্চা করা, মেডিটেশন করা এবং আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের (স) সান্নিধ্য চাওয়া। যারা সনাতন ধর্মাবলম্বী, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী—এই সময়ে তারা একাগ্র প্রার্থনায় ডুবে যেতে পারেন। অতএব কোয়ারেন্টিনে থাকার সুযোগ হলে এটাকে সৌভাগ্য মনে করে আনন্দিতচিত্তে পালন করবেন। তাহলে আপনি সুস্থ-সবল মানুষ হিসেবে কোয়ারেন্টিন থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন।

বাঙালির বড় শক্তি হচ্ছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। আট বছরের বাঙালি বালকের যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, ইউরোপ এবং আমেরিকার ২৫ বছরের যুবকেরও সেই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নেই। কারণ আমরা স্বাভাবিক ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করি। আর পাশ্চাত্যের অধিকাংশ মানুষই গরম পানিতে গোসল করে। কেউ কেউ আবার নিয়মিত গোসল করে না। ফলে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খুব দুর্বল। তাই পাশ্চাত্যে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ এত বেশি। সেই তুলনায় আমাদের দেশে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ অনেক কম।

যে-কোনো পরিস্থিতি আসুক, আমরা সবসময় সেবার জন্যে আছি। করোনা আক্রান্ত যিনিই হোন, তার যে-কোনো ধরনের সেবা প্রয়োজন—মানসিক এবং আত্মিক সাপোর্ট, সেটার জন্যে কোয়ান্টাম সবসময় তার পাশে আছে। যে-কোনো দুর্যোগ মোকাবেলায় আমরা আগেও ঝাঁপিয়ে পড়েছি। এখনো আমরা মানুষের পাশে থাকব এবং তাদের জন্যে যা যা করণীয় করব।

ঘরে ঘরে সাদাকায়ন (অডিও) : ২৭ মার্চ ২০২০

ভয়-আতঙ্ক উবে যায় বিশ্লেষণের আলোয়

প্রিয় সুহৃদ, বাসায় থাকার এ সময়টাকে আপনারা সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়েছেন নিজের ও মানুষের কল্যাণে—সকলের জন্যে প্রার্থনা করে। আবার অনেকেই সময় নষ্ট করেছেন অহেতুক দুশ্চিন্তা করে, ভয় পেয়ে, নেতিবাচক কথা বা ভাবের আদান-প্রদান করে। ভার্চুয়াল জগতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করে নিজেকে আতঙ্কে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে কেউ কেউ। তাদের জন্যে খুব মায়া হয়। দোয়া করি, তারা যেন গুজব এবং বাস্তবতা, আতঙ্ক এবং সত্য, রটনা এবং তথ্যের গভীরে ঢুকতে পারে। সত্যকে উপলব্ধি করে তারা যেন সাহসী হয়ে উঠতে পারে।

গুজবের যেমন হাত-পা নেই, আতঙ্কেরও হাত-পা নেই। ভূতের অস্তিত্ব যেমন কল্পনায়, ভয়ের অস্তিত্বটাও বিস্তার করে কল্পনার জগতে। কল্পনা থেকে মনোরাজ্যে, মনোরাজ্য থেকে দেহে। ভয়-আতঙ্ক সবসময়ই দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেয়, দুর্বল করে দেয়। এখনকার যে করোনা আতঙ্ক অনেকের মনে বাসা বেঁধেছে, তাকে যদি আমরা একটু বিশ্লেষণ করে দেখি—'ভূত' বা ভয় যেমন বিশ্লেষণের আলো সহ্য করতে পারে না, করোনা আতঙ্কও বিশ্লেষণের আলোয় উধাও হয়ে যাবে। এই আতঙ্ক মনের মধ্যে বাসা বাঁধতে পারবে না। আপনি অনুভব করবেন নিরেট বাস্তবতাকে।

কারো কারো মনের অবস্থা এখন এরকম যে, করোনা যেন ক্ষুধার্ত বাঘের মতো চারপাশে ঘোরাঘুরি করছে। আপনাকে পাওয়া মাত্র ছিঁড়েখুড়ে খেয়ে ফেলবে। আপনার আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না! কিন্তু আমরা যদি সত্যের দিকে তাকাই, তাহলে দেখি করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর যে হার—

কোভিডে ২২ জানুয়ারি ১৭ জন মারা গেছে এবং ৩০ মার্চ পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা হচ্ছে ৩৭ হাজার সাত শত ৮৮। অর্থাৎ ৬৮ দিনে সারা পৃথিবীতে প্রতিদিন গড় মৃত্যু পাঁচ শত ৫৭। আর প্রত্যেক দিন সারা পৃথিবীতে নানান কারণে রোগে-দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা হচ্ছে এক লক্ষ ৫৩ হাজার। পার্থক্যটা আমাদের কাছে খুব পরিষ্কার হয়ে ওঠে। রোগেশোকে প্রতিদিন এই যে দেড় লক্ষাধিক মৃত্যু, সেটা আমাদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে না; আমরা স্বাভাবিকভাবে নিচ্ছি। সে তুলনায় করোনায় দিনে গড়ে পাঁচ শত ৫৭ মৃত্যু আতঙ্ক সৃষ্টি করছে! কেন? কারণ যারা আতঙ্কিত অথবা আতঙ্কবাদি, তাদের ধারণা—করোনাভাইরাস ছুঁলেই হলো! নির্ঘাত মৃত্যু!

আসলে কি তা-ই?

আমরা এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা উল্লেখ করতে পারি। ঘটনাটা সবাই জানেন। একটা লাক্সারি ক্রুজ শিপ—ডায়মন্ড প্রিন্সেস। এই ক্রুজ শিপ জাপানের ইয়োকোহামা বন্দরে পৌঁছায় ৪ ফেব্রুয়ারি। জাপানি কর্তৃপক্ষ যখন খবর পায় যে, এখানে করোনার রোগী আছে; পুরো জাহাজটাকে কোয়ারেন্টিন ঘোষণা করে। অর্থাৎ সেখানে কেউ যেতেও পারবে না, বেরুতেও পারবে না।

১৬ মার্চ পর্যন্ত জাপানের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ তিন হাজার সাত শত ১১ জন যাত্রী ও ক্রুর সবাইকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। স্বাভাবিক নিয়মেই জাহাজটা করোনাভাইরাসের ইনকিউবেটর অর্থাৎ প্রজনন-কারখানায় পরিণত হয়েছিল। সেই পরিবেশেও মাত্র সাত শত ১২ জনকে পাওয়া গেল, যাদের শরীরে করোনার জীবাণু রয়েছে। তিন শত ৩৪ জনের মধ্যে রোগের কোনো লক্ষণই পাওয়া যায় নি। রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় তিন শত ৭৮ জনের মধ্যে। অর্থাৎ অসুস্থতার হার মাত্র ১০ শতাংশ! আর ২৪ মার্চ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ছিল ১০। যাদের প্রত্যেকের বয়সই ছিল ৭০ বা তার ওপরে।

করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু নিয়েও রহস্যের কোনো শেষ নেই। এই ফ্লু-র সিজনে বয়স্ক যারা মারা যাচ্ছেন, তারা করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছেন, না অন্য কোনো রোগ তাদের মৃত্যুর কারণ—এটা নিয়ে যুক্তরাজ্য, ইতালি এবং বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞদের সংশয় রয়েছে, সন্দেহ রয়েছে।

ইতালিতে যারা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে, তাদের ৯৯ শতাংশ অন্য কোনো রোগে আক্রান্ত ছিল। ৭৫ ভাগ উচ্চ রক্তচাপে, ৩৫ শতাংশ ডায়াবেটিসে এবং এক-তৃতীয়াংশ হৃদরোগে আক্রান্ত ছিল। ইতালিতে

যারা করোনায় মারা গেছে, তাদের মাত্র ১২ শতাংশের ডেথ সার্টিফিকেটে লেখা—তারা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, তারা অধিকাংশই বয়স্ক, আগে থেকেই নানারকম জটিলতায় ভুগছিল।

এ ব্যাপারে ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি কমিটির কাছে বক্তব্য দিতে গিয়ে যুক্তরাজ্যের সেন্টার ফর গ্লোবাল ইনফেকশাস ডিজিজ অ্যানালাইসিস-এর প্রফেসর নীল ফারগুসন বলেছেন, করোনায় আক্রান্ত হয়ে যুক্তরাজ্যে কতজন মারা গেছে—এটা বলা মুশকিল। কারণ যারা এসময় মারা গেছেন, তাদের দুই-তৃতীয়াংশ বা কমপক্ষে অর্ধেকের বয়স এত বেশি ছিল যে, তারা যে-কোনোভাবেই মারা যেতে পারতেন; এমনকি করোনা না হলেও। তাদের প্রত্যেকের বয়স ছিল ৭০-এর ওপরে।

আমরা যদি যুক্তরাজ্য, স্পেন এবং ইতালির সাম্প্রতিক সময়ের মৃত্যুহার এবং মৃত্যুর কারণ দেখি—করোনায় তারাই সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছে, যারা আগে থেকে অসুস্থ ছিলেন। বয়সের কারণে যাদের ইমিউনিটি, যাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গিয়েছিল।

ডায়মন্ড প্রিন্সেস জাহাজের অধিকাংশই ছিল বয়স্ক। কিন্তু একমাস এক জায়গায় কোয়ারেন্টিনে থাকার পরেও আক্রান্তের হার মাত্র ১০ শতাংশ! এক জাহাজে থাকার পরও তাদের ৯০ শতাংশ সংক্রমণের শিকার হন নি। অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়া-ভাইরাস আপনাকে আক্রমণ করবে কি করবে না—এটা সবসময় নির্ভর করে আপনার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ওপরে।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে গত ২৮ বছর ধরে আমরা বলছি, আমাদের চারপাশে কোটি কোটি ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস অ্যালার্জেন ফাঙ্গি রয়েছে। আমরা প্রতিদিন এসবের সাথে লড়াই করেই বেঁচে আছি, সুস্থ আছি, ভালো আছি। কীভাবে? এর সবচেয়ে বড় কারণ—আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। এটি ঠিক থাকলে ব্যাকটেরিয়া-ভাইরাসও দূরে থাকে। ওদেরও তো একটা হিসাব আছে যে, আমি সেখানে গিয়ে টিকতে পারব কি পারব না!

যখন কেউ কারো ওপর আক্রমণ করে, আক্রমণ করার আগে সে-ও ভাবে যে, আমি জিততে পারব, না ধ্বংস হয়ে যাব, না যাকে আক্রমণ করছি তাকে কাবু করতে পারব? যখন সে বোঝে যে, না, এখানে আক্রমণ করে সুবিধা নেই, তখন সে-ও ভয়ে আক্রমণ করে না। কারণ সবলকে কেউ কখনো আঘাত করতে চায় না। আর দুর্বলের কোনো বন্ধু হয় না। আক্রমণকারী দুর্বলকে কখনো পরোয়া করে না। পরোয়া করে সবলকে।

আমরা বাঙালি। বীরের জাতি। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র, যা পাশ্চাত্যের যে-কোনো জাতির চেয়ে বেশি। কারণ আমরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং আমরা অধিকাংশই ছোটবেলা থেকে প্রতিদিন স্বাভাবিক ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করি। আমাদের দেশে করোনার অবস্থান দেখেও আমরা বুঝতে পারি যে, আল্লাহর অনেক রহমত আমাদের ওপরে রয়েছে। এতদিনে করোনা আক্রান্ত রোগী পাওয়া গেছে ৫১ জন!

আমরা বলেছিলাম—যার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যত বেশি থাকবে, করোনা তাকে তত সমীহ করে চলবে। আর আক্রান্ত রোগীর ভবনে থাকলেই আপনি করোনা আক্রান্ত হবেন—এই ভয় করার কোনো কারণ নেই। করোনায় আক্রান্ত হয়ে যতজন মারা গেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি মানুষ সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরেছে। আর বাস্তবতা হচ্ছে, আক্রান্ত ৮১ শতাংশের হাসপাতালে যাওয়ারও প্রয়োজন হয় নি। অতএব করোনাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কিন্তু যে-কোনো অসুস্থতার ব্যাপারে সচেতনতার প্রয়োজন আছে। এখন ঘরে থেকে আপনি নিজের সবচেয়ে বেশি উপকার করতে পারেন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আরো বাড়াতে সক্রিয় উদ্যোগ নেয়ার মাধ্যমে।

আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি যে, আল্লাহ আমাদেরকে ধ্যানের আলোয় আলোকিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। একজন ধ্যানীর করোনা অথবা অন্য রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা অনেক কম, যদি তারা স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিধি সুন্দরভাবে পালন করে চলেন।

আমেরিকানদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্ভবত সবচেয়ে কম। কারণ ফাস্ট ফুড, চিনিজাত খাবার, সফট ড্রিংকস, অ্যালকোহল, সিগারেট—এই জিনিসগুলো মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয় এবং নানারকম জটিল রোগব্যাধি সৃষ্টি করে এই কুখাদ্যগুলো। সেখানেও দেখা গেছে যে, একজন ধ্যানী ৭৫ ভাগ ক্ষেত্রে সুস্থ থাকেন। যিনি ধ্যান করেন না, তিনি যে সময়ে ডাক্তারের কাছে চার বার যান, সে-সময়ে একজন ধ্যানী যান একবার।

এখন যেহেতু বাসায় পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যাচ্ছে, এই সময়টাকে নিজের ইমিউন সিস্টেমকে আরো শক্তিশালী করার জন্যে কাজে লাগাতে হবে। এজন্যে নিয়মিত দু-বেলা মেডিটেশন করুন। এর সাথে কোয়ান্টাম ইয়োগা করুন। বিশেষভাবে উষ্ট্রাসন, মৎস্যাসন, পবনমুক্তাসন, হলাসন, শশাঙ্গাসন, গোমুখাসন এবং ভুজঙ্গাসন নিয়মিত করুন।

যত প্রাকৃতিক খাবার খাওয়া যায় তত আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়তে থাকবে। চিনিজাতীয় খাবার পুরোপুরি বর্জনের মধ্য দিয়ে আপনি যে শুধু দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবেন তা-ই নয়; ক্যান্সার স্থূলতা ডায়াবেটিস এবং অন্যান্য জটিল রোগব্যাধি থেকেও মুক্ত থাকবেন।

আর ঘরে যখন আছেন, পরিবারের সবাইকে নিয়ে শুদ্ধাচার অনুশীলন, ধর্মবাণী পাঠ এবং নিয়মিত উপাসনা-ইবাদতে সময় ব্যয় করুন। আমাদের দূরপ্রসারী মানসিক প্রশান্তি এবং সুখের উপকরণ হিসেবে এটি কাজ করবে। এর মধ্য দিয়ে উপলব্ধির একটা নতুন স্তরে আপনার উত্তরণ ঘটবে।

এসময়ে নিজেদের মধ্যে সুখ-দুঃখের কথা বিনিময় করুন। মা-বাবার কথা শুনুন, ছেলে-মেয়ের কথা শুনুন, স্ত্রী অথবা স্বামীর কথা শুনুন। তাহলে আপনি পরস্পরের প্রতি সমমর্মিতা অনুভব করবেন, অনুভব করবেন আপনার পরিবারই আপনার দুর্গ। পারস্পরিক মমত্ববোধ যত বাড়বে, তত আপনার ইমিউন সিস্টেম শক্তিশালী হবে। তত অনুভব করবেন যে, আপনি একা নন!

আসলেও আপনি একা নন। কোয়ান্টাম এক বিশাল পরিবার। আপনার মতো হাজার হাজার মানুষ এখন এই কথাগুলো শুনছে। আপনি যেভাবে ইতিবাচকতা এবং বিশ্বাস অনুভব করছেন, ইতিবাচকতা এবং বিশ্বাস যেভাবে আপনাকে শক্তিমান করছে, তারাও একইভাবে শক্তিমান হচ্ছে।

আমরা পরস্পর পরস্পরের সাথে আছি। কোয়ান্টাম আপনার সাথে আছে। আপনার যে-কোনো প্রয়োজন আপনি কোয়ান্টামকে জানাতে পারেন। আমাদের কর্মীরা যতভাবে সম্ভব, সবরকম প্রক্রিয়ায় আপনার পাশে দাঁড়াবে।

সাধারণ মানুষের মধ্যে যে আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে, সে আতঙ্ক এবং ভয়কে তারা যেন শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারে। জাতিগত সাহস এবং বীরত্বের পরিচয় আমরা দিয়েছি। যুগে যুগে সেই সাহস সমমর্মিতা এবং বীরত্ব নিয়েই আমরা যেন জেগে উঠতে পারি। সবসময় মানুষের জন্যে দোয়া করুন। দেশের জন্যে দোয়া করুন। সারাবিশ্বের দুর্গত মানুষের জন্যে দোয়া করুন।

পারিবারিক মেডিটেশনে নিজের পরিবারের সাথে একাত্ম হওয়ার পাশাপাশি সকল বঞ্চিত-অবহেলিত-দুঃস্থ-শোষিত মানুষের জন্যে দোয়া করুন। সবাই ভালো থাকুন। খোদা হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।

ঘরে ঘরে সাদাকায়ন (অডিও) : ৩ এপ্রিল ২০২০

মনুষ্যত্বের মৃত্যু বেশি বেদনাদায়ক

প্রিয় সুহৃদ! আপনারা কোয়ারেন্টিনের সময়টাকে ইতিবাচক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে ফলপ্রসূ করার চেষ্টা করছেন। ঘরে বসেই সাদাকায়ন, শুদ্ধাচার চর্চা এবং শবে বরাতে বিশেষ কার্যক্রম ও দোয়ায় একাত্ম হয়ে একটা নতুন ইতিবাচক অনুরণন সৃষ্টি করেছেন। এজন্যে আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সময় যেমনই হোক, পরিবেশ যেমনই হোক, সেটাকে সুন্দরভাবে এবং গঠনমূলকভাবে নিজের ও অন্যের কল্যাণে কাজে লাগাতে পারাটাই বুদ্ধিমান মানুষের লক্ষণ। চারপাশের অনেক মানুষ যখন আতঙ্কগ্রস্ত, তখন আপনি বিশ্বাস, প্রত্যয় এবং আত্মশক্তির জাগরণের মধ্য দিয়ে নতুন ভবিষ্যতের চিন্তা করছেন। এটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত ইতিবাচক দিক।

করোনাভাইরাস যতটা না মানুষের মৃত্যুর কারক হয়েছে, তার চেয়ে বেশি করোনা আতঙ্কে মানুষ তার মনুষ্যত্বকে হারিয়েছে। মৃত্যুর চেয়েও মনুষ্যত্বের এই মৃত্যু নিঃসন্দেহে বেশি বেদনাদায়ক।

১৩ এপ্রিল পর্যন্ত সারাবিশ্বে ১৮ লক্ষ ৫৭ হাজার একশত ১৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। এর মধ্যে এক লক্ষ ১৪ হাজার তিন শত ৩২ জন মারা গেছে এবং চার লক্ষ ৩৪ হাজার মানুষ সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর ২৮ লক্ষ ৩০ হাজার ছয় শত ৮৮ জন মারা যায়। সেখানে প্রতিদিন নানা কারণে মৃত্যু হচ্ছে সাত হাজার সাত শত ৫৫ জনের। আবার করোনাভাইরাসে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত দেশ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে পাঁচ লক্ষ ৬০ হাজার চার শত ৩৩ জন আক্রান্ত হয়েছে এবং মারা গেছে ২২ হাজার একশত ১৫ জন।

করোনা নিয়ে সতর্কতা এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থায় যা যা করণীয়, সেটা করার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। কিন্তু করোনা নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার এবং আতঙ্কটা এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার পেছনে কারণটা কী? যেখানে মানুষ তার মনুষ্যত্বকে হারাতে বসেছে—এর রহস্যটা কী?

আমরা যদি দেখি, বিশ্বে গড়ে প্রতিবছর একশ কোটি মানুষ ফ্লু-তে আক্রান্ত হয়। ৩০ থেকে ৫০ লক্ষ মানুষ হাসপাতালে ভর্তি হয় এবং দুই লক্ষ ৯১ হাজার থেকে ছয় লক্ষ ৪৬ হাজার মানুষ মারা যায়। এটি প্রতিবছর ফ্লু-তে মৃত্যুর হিসাব। ফ্লু ছাড়া যদি আমরা মৃত্যুর হিসাব দেখি, পৃথিবীতে প্রতিবছর পাঁচ কোটি ৭২ লক্ষ ৫৫ হাজার দুই শত ৪৪ জন মারা যায়। প্রতিদিন মারা যায় একলক্ষ ৫৬ হাজার আট শত ৬৪ এবং প্রতি ঘণ্টায় মারা যাচ্ছে ছয় হাজার পাঁচ শত ৩৬ জন।

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত করোনা আক্রান্তের সংখ্যা আট শত তিন জন। মারা গেছে ৪২ জন। ২০১৬ সালের রিপোর্ট—বাংলাদেশে প্রতিবছর সবমিলিয়ে মৃত্যু হয় ৮ লক্ষ ৯০ হাজার তিন শত ৬২ জনের। প্রতিদিন মারা যায় দুই হাজার চার শত ৩৯ এবং প্রতিঘণ্টায় একশত দুই জন।

বাংলাদেশে মৃত্যুর প্রধান কারণ হার্ট ডিজিজ বা হৃদরোগ। ২০১৬ সালে একলক্ষ ৮৮ হাজার পাঁচ শত ৬০ জন বাংলাদেশি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। বাংলাদেশে প্রতিবছর ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় লক্ষাধিক মানুষ। নতুনভাবে আক্রান্ত হয় ১৫ লক্ষ।

প্রতিবছর যেখানে একলক্ষ ৮৮ হাজার মানুষ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে, যেখানে একলক্ষ মানুষ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে, সেটা নিয়ে কিন্তু আমাদের আতঙ্ক নেই, সোশ্যাল মিডিয়াতে আতঙ্কের প্রচারণাও নেই। তাহলে করোনা নিয়ে মানুষকে আতঙ্কিত, ভীত-সন্ত্রস্ত করা হচ্ছে কেন!

আবার বাংলাদেশে মৃত্যুঝুঁকির সবচেয়ে বড় কারণ ধূমপান। স্বাস্থ্যগত যে পাঁচটি প্রধান ঝুঁকির উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে এক নম্বর ঝুঁকি। সেই ধূমপানের বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়ানোর দৃশ্যমান কোনো উদ্যোগ নেই। কিন্তু করোনা আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে আমরা যে শুধু আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতারই ক্ষতিসাধন করছি তা নয়, বিনাশ ঘটাচ্ছি আমাদের মনুষ্যত্বেরও।

আসলে পাশ্চাত্যের ভোগবাদী সভ্যতার যে অমানবিকতার রূপ, এবার করোনা আমাদের কাছে বিষয়টিকে খুব পরিষ্কার করে দিয়েছে। এর মূল কারণ তাদের পণ্য-আসক্তি, ভোগ-আসক্তি, স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা।

আমরা দেখতে পাই, ওল্ড এজ হোমে—সেটা ইতালি হোক, ফ্রান্স হোক, ইংল্যান্ড হোক বা যুক্তরাষ্ট্র—বিপুল সংখ্যক প্রবীণ মারা গেছেন কোনোরকম চিকিৎসা বা যত্ন ছাড়া। শুধু প্রবীণদের প্রতি নয়, সেখানকার রোগাক্রান্ত মানুষের একটি বড় অংশ অভিবাসী শ্রমিক। যুক্তরাষ্ট্রে করোনার এত বিস্তারের মূল কারণ হচ্ছে তাদের ব্যর্থ স্বাস্থ্যব্যবস্থা। আসলে সেখানে স্বাস্থ্যব্যবস্থার পরিবর্তে রয়েছে স্বাস্থ্যব্যবসা। যে-কারণে যুক্তরাষ্ট্রে প্রান্তিক মানুষ—বিশেষত কৃষ্ণাঙ্গ এবং অভিবাসীরাই করোনার প্রধান শিকার।

ভোগবাদী বস্তুবাদী পুঁজিবাদী সভ্যতার যে দম্ভ, সেই দম্ভের আসল রূপ বিশ্বের কাছে এখন পরিষ্কার। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি, যিনি করোনাকে পাত্তাই দেন নি, তিনি করোনা থেকে নিরাপত্তা লাভের জন্যে হোয়াইট হাউজে ঝাড়ফুঁকের ব্যবস্থা করেছেন। এখন তিনি নিরাপদ স্থানে আছেন যাতে করোনায় আক্রান্ত না হন। সৌদি যুবরাজ তার মন্ত্রীদের নিয়ে নিরাপদ কোনো এক দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছেন। আসলে যাদের মধ্যে অমানবিকতা যত বেশি, তাদের ভয় এবং আতঙ্ক তত বেশি।

যারা নিজেদেরকে সভ্য মানুষ বলে দাবি করেন, করোনা তাদের অমানবিক রূপ আমাদের সামনে স্পষ্ট করে দিয়েছে। অমানবিকতার দিক থেকে অস্ট্রেলিয়া কোনোভাবেই পিছিয়ে নেই। করোনাভাইরাস সংক্রমণের পর পরই সেখানকার প্রধানমন্ত্রী পরিষ্কারভাবে বলেছেন—অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক ছাড়া আর কারো দায়িত্ব তারা নেবেন না।

করোনা যে শুধু দেশের বাইরের মনুষ্যত্বহীনতাকেই প্রকাশ করেছে তা নয়, দেশের ভেতরে আমাদের সমাজেও সেই ভয়ানক রূপটি আমরা দেখি। আমরা এখন কেউ একটা হাঁচি দিলে, একটা কাশি দিলে ভীত-সন্ত্রস্ত এবং অসহিষ্ণু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাই।

একজন খুব কৌতুক করে বলছিলেন—বাঙালি এখন কাশি দিতেও ভুলে গেছে! এখন যে-কোনো মৃত্যুকেই করোনা-মৃত্যু বলে আমরা সন্দেহ করি। বাংলাদেশে এবছর জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত মারা গেছে দুই লক্ষ ৪৬ হাজার নয় শত ২০ জন, যার মধ্যে করোনা-মৃত্যু ৪২। অথচ সেখানে যে-কোনো মৃত্যু, যে-কোনো অসুস্থতাকে একশ্রেণির বিকারগ্রস্ত মানুষ ‘করোনা করোনা’ বলে চিৎকার করছে। আর সেই পরিবারকে কার্যত একঘরে করে দিচ্ছে—এর চেয়ে বেদনাদায়ক আর কিছু হয় না!

যখন আমরা শুনি—

নারায়ণগঞ্জের ঘটনা। একজন রোগীকে হাসপাতালে নেয়ার জন্যে অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হয়েছে। রোগী কাশি দিয়েছে। করোনা সন্দেহে তাকে অ্যাম্বুলেন্স থেকে রাস্তায় নামিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তার পরিবারকেও সেখানে ফেলে গেছে। রাস্তায় পড়ে থেকে বিনা চিকিৎসায় তিনি মারা গেছেন।

একজন নারায়ণগঞ্জ থেকে ফেনীতে নিজ বাড়িতে যাওয়ার পর জ্বরে ভুগে মারা যান। করোনা সন্দেহে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং তার পরিবার একঘরে হয়ে যায়। তার জানাজায় পরিবারের চার জন সদস্য ছাড়া কেউই অংশ নেয় নি। অথচ পরে জানা গেল যে, তিনি করোনায় আক্রান্ত ছিলেন না।

সুনামগঞ্জের ঘটনাও কম মর্মান্তিক নয়। দুই ভাই ও বাবা এক তরুণকে কাঁধে করে দাফন করতে নিয়ে যাচ্ছে। লাশ বহন করার জন্যে মসজিদ থেকে তাদেরকে খাটিয়া দেয়া হয় নি।

শরীয়তপুরে এক মা তার ছেলেকে নিয়ে সদর হাসপাতালে যান। পা ফোলা এবং শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করান ছেলেকে। তিনি দুপুরবেলা মারা যান। মৃত্যুর পর স্বজন বা গ্রামবাসী কেউ লাশ দেখতে আসে নি। লাশের পাশে মা আহাজারি করছে। মৃতের বড় ভাই, চার বোন, বোনের পরিবারের সদস্যরাও ফিরে তাকান নি। ২১ ঘণ্টা সেইভাবেই লাশ পড়েছিল।

মা আহাজারি করতে করতে বলছিলেন, জীবনের শেষ বয়সে ছেলের লাশের ভার আমাকে এইভাবে বইতে হবে তা ভাবতেও পারি নি। এভাবে মানুষের মানবতা হারিয়ে গেল! কী হবে এই পৃথিবীতে বেঁচে থেকে! কীসের জন্যে বেঁচে থাকা! কেউ আমার আর্তনাদ শুনল না! সন্তান-স্বজন, গ্রামবাসী—কেউ না! আমার মতো এমন পরিণতি কাউকে যেন দেখতে না হয়।

সেই যুবকের নমুনা পরীক্ষা করে দেখা গেছে, তারও করোনা ছিল না। শুধু যে আক্রান্ত ও মৃত মানুষকে, তার পরিবারকে আমরা একঘরে করে ফেলছি তা না, যে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা নিজের জীবন বিপন্ন করে অসুস্থদের সেবা দিচ্ছেন; আমাদের সমাজের একশ্রেণির আতঙ্কিত দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য মানুষ তাদেরকেও রীতিমতো অচ্ছুতের দৃষ্টিতে দেখছে। বিপজ্জনক মানুষ হিসেবে তাদের সাথে অসহিষ্ণু আচরণ করছে।

একাত্তরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন এক বাঙালির জন্যে আরেক বাঙালির যে দরদ, যে মমতা, বিপন্ন প্রতিটি মানুষের পাশে দাঁড়ানোর যে ইতিহাস আমরা রচনা করেছিলাম, সেই বাঙালি

একজন অসুস্থ মানুষকে সেবা করবে না! মৃত মানুষকে সম্মানের সাথে শেষ বিদায় দেবে না! এর চেয়ে বেদনার বিষয় আর কী হতে পারে!

আমরা একটি শব্দকে ভুলভাবে প্রয়োগ করছি। সোশ্যাল ডিসটেন্স, সামাজিক দূরত্ব—এটা সেই সমাজ থেকে এসেছে, যে সমাজে সোশ্যাল এম্প্যাথি বা সামাজিক মমত্ব নেই। সোশ্যাল ডিসটেন্স বা সামাজিক দূরত্ব শব্দটি সেই সমাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, আমাদের জন্যে নয়।

একজন মানুষ থেকে আরেকজন মানুষের যে দূরত্বকে 'সামাজিক দূরত্ব' বলা হচ্ছে, শব্দটি হওয়া উচিত 'শারীরিক দূরত্ব' বা 'দৈহিক দূরত্ব'। এসময় আমাদের সামাজিক মমত্ব যত বাড়বে, করোনা মোকাবেলায় তত আমরা সফল হবো। একজন মানুষ যখন একা থাকে, যখন সে নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করে, যখন সে মনে করে যে, তার প্রতি কারো কোনো মমতা নেই, বেঁচে থাকার প্রয়োজনটাও অনেক সময় তার কাছে গুরুত্বহীন হয়ে ওঠে।

আমরা বাইরে চলাফেরার ক্ষেত্রে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখব কিন্তু আমাদের অন্তরের টান সামাজিক মমত্বের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করব। যিনিই দুর্গত হোন, অসুস্থ হোন, তার প্রতি আমরা যত মমত্বের প্রকাশ ঘটাব তত তার সুস্থ হওয়ার সুযোগ ও সম্ভাবনা বাড়বে। তার ভেতরের ইমিউন সিস্টেম তত শক্তিশালী হবে। মানুষের মমতা, চিকিৎসকের মমতা, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের মমতা, আপনজন ও আত্মীয়ের মমতা—এটা যে-কোনো রোগীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এত দুঃখ, এত বেদনার পরও আশার বাণী হচ্ছে, পৃথিবীতে এখনো ভালো মানুষ আছে। সবাই শোষক নয়, জালেম নয়, ভোগী বা স্বার্থপর নয়। ত্যাগী মানুষও রয়েছে। যেখানে ত্যাগ আছে, মানুষের প্রতি মমতা আছে, সেখানেই তারা খুব সুন্দরভাবে করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলা করে যাচ্ছে।

ভিয়েতনামের কথা আপনারা জানেন। তারা সেখানে করোনা সংক্রমণ খুব দক্ষতার সাথে সীমিত করেছে। আপনারা ভারতের কেরালার কথাও জানেন, যেখানে সবচেয়ে বেশি সংক্রমণের ভয় ছিল। কিন্তু তাদের সামাজিক মমত্ব এতটাই যে, কেরালা সরকার বলেছিল, বিদেশ থেকে যত মানুষ আসুক, সবাইকে তারা গ্রহণ করবে। সামাজিক মমত্ব সেখানে করোনার প্রকোপকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সাহায্য করেছে।

সামাজিক মমত্ব ও মানুষের প্রতি মমত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে

ফিদেল ক্যাস্ট্রোর কিউবা। বাহামার পতাকাবাহী ব্রিটিশ ক্রুজ শিপ এমএস ব্রেইমারে ৫০ জন প্যাসেঞ্জার করোনা আক্রান্ত হয়ে গেল। ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের কোনো দেশ তাদেরকে বন্দরে ভিড়তে দেয় নি। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রও নয়। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে যত দেশ ছিল, প্রত্যেক দেশকে যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পাঁচ দিন ধরে অনুরোধ জানান। কিন্তু কেউ ভিড়তে দেয় নি। কিউবা সেই জাহাজকে তাদের দ্বীপে ভিড়তে দেয় এবং একহাজার প্যাসেঞ্জার ও ক্রুকে নামিয়ে নিয়ে আসে। সেখান থেকে তাদেরকে চার্টার্ড বিমানে করে যুক্তরাজ্যে ফিরিয়ে আনা হয়।

করোনা আক্রান্ত রোগীর সেবা করলেই কেউ করোনায় আক্রান্ত হবে—এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। প্রয়োজন শুধু সতর্কতা, প্রয়োজন মমত্ব বোধ। মমত্ব বোধ বা মমতা শুধু করোনা আক্রান্ত রোগীকে নয়, আমাদের সবাইকে সুস্থ রাখবে, ভালো রাখবে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা আমাদের করণীয় সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই। সবসময় মনে রাখবেন, আপনি মানুষ। সৃষ্টির সেরা। আপনার মনুষ্যত্ব যদি হারিয়ে যায়, তাহলে আপনার এবং একটি বন্যপ্রাণীর মধ্যে আর কোনো পার্থক্য থাকে না। মনুষ্যত্বই আমাদেরকে মানুষ করেছে। অতএব মানুষের প্রতি মমত্বটাকে যত প্রবল করবেন, তত আপনার ইমিউন সিস্টেম শক্তিশালী হবে। আর আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যে মনটাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হবে, আবর্জনামুক্ত করতে হবে।

যারা ঘরে থেকে আতঙ্কিত, তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই সংখ্যা দেখছে। মৃতের সংখ্যা সকালে যা থাকে, দুপুরের খবরেও তা-ই থাকে। দিনে মাত্র একবার বদলায়। কিন্তু একই সংখ্যা সে বার বার দেখছে। টিভির খবর দিনে সর্বোচ্চ দুবার দেখুন। স্মার্টফোন থেকে নেতিবাচক তথ্য শেয়ার করবেন না। নেতিবাচক কোনোকিছু এলে সেটা ডিলিট করে দিন। পেশাগত প্রয়োজন না থাকলে ফেসবুকেও ঢুকবেন না।

মনের শক্তি ও বিশ্বাসের শক্তি বাড়ানোর জন্যে কোরআন তেলাওয়াত করুন, মর্মবাণী পাঠ করুন। কারণ বিশ্বাসীর জন্যে কোরআন শুধু রহমত নয়, শেফাও। শেফা মানে নিরাময়। দৈহিক মানসিক সামাজিক পারিপার্শ্বিক—যত সমস্যা আছে, রোগ আছে—নিরাময়ক হচ্ছে কোরআন। সনাতন হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানরা—যার যার ধর্মবাণীতে মনোযোগ দিন। সব ধর্মই মানুষের কল্যাণের কথা বলে, অপার্থিব আনন্দলোকে প্রবেশ করার আহ্বান জানায়।

মনের পরিচ্ছন্নতার সাথে সাথে নিয়মিত হাত ধোবেন। হাত ধোয়ার জন্যে বাংলা সাবানের চেয়ে ভালো সাবান আর নেই। অকারণে অ্যালকোহলযুক্ত স্যানিটাইজার ব্যবহার করাটা হচ্ছে অর্থের অপচয়।

আমরা আমাদের বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানাই। তারা সোপি-ওয়াটার তৈরি করেছেন পানির সাথে কাপড় ধোয়ার ডিটারজেন্টের মিশ্রণের মাধ্যমে। এক টাকায় ৮০ বার হাত ধোয়া যায়। অর্থাৎ অপচয় যত কমান তত ভালো। যেহেতু ঘরে আছেন, কাপড়চোপড়, বিছানার চাদর, ঘরবাড়ি সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তকতকে ঝকঝকে করে ফেলুন।

এককোষ রসুন, কালোজিরা ও একচামচ মধু প্রতিদিন সকালে খান। ফ্রিজের ঠান্ডা খাবার, আইসক্রিম বর্জন করুন। এমনকি ঠান্ডা পানিও না। গরম বা উষ্ণ পানি পান করুন। আর যদি পরিবারে কেউ করোনা আক্রান্ত হন, আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। পরিবারে কেউ করোনা আক্রান্ত সন্দেহ হলেই পরিবারের সবাই ঠান্ডা খাবার ও পানীয় বর্জন করুন। গরম পানি পান করুন এবং নাক দিয়ে গরম ভাপ নিন দিনে চার বার করে। কালোজিরা বেটে এক চামচ মধুর সাথে মিশিয়ে দুবেলা খেতে পারেন।

নাইজেরিয়ার এক রাজ্যের গভর্নর, সেয়ি ম্যাকেন্দি, করোনায় আক্রান্ত হন। তিনি তার চিকিৎসকের পরামর্শে কালোজিরা ও মধুর মিশ্রণ সেবন করেন। ১৫ দিন পর তিনি করোনা থেকে পুরোপুরি মুক্ত হন। অতএব কোনোরকম ঠান্ডা লাগলে আপনিও গরম পানি পান করুন। গরম ভাপ নাক দিয়ে নিয়ে মুখ দিয়ে ছাড়ুন। দুবেলা কালোজিরা-মধুর মিশ্রণ খান। প্রচুর ফল ও শাকসবজি খান। প্রয়োজনে করোনা চিকিৎসাকেন্দ্রের শরণাপন্ন হোন।

আমরা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই—করোনা নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। প্রয়োজন শুধু সতর্কতা, নিজের যত্ন, নিজের প্রতি মনোযোগ। প্রয়োজন সামাজিক মমতা, পারিবারিক মমতা। আমরা যেন 'সোশ্যাল ডিসটেন্স' শব্দটা ব্যবহার না করি। শারীরিক দূরত্ব এবং সামাজিক মমত্ব—এই বাণী নিয়ে আমরা যে-কোনো দুর্যোগের মোকাবেলা করতে পারব, ইনশাআল্লাহ!

আপনারা সবাই ভালো থাকুন। পরম করুণাময় আমাদেরকে, আমাদের দেশকে ও বিশ্বের বঞ্চিত মানুষদেরকে করোনার অভিশাপ থেকে রক্ষা করুন।

ঘরে ঘরে সাদাকায়ন (অডিও) : ১০ এপ্রিল ২০২০

অটোফেজি ॥ রোজা ॥ কোরআনে শেফা

রমজান সমাগত। বছর পার হয়ে আমরা আবার রমজান মাস পেতে যাচ্ছি। এ মাসে নিজের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্যে করণীয় কাজগুলো করতে চাইলে করা অনেক সহজ। ধর্ম আমাদেরকে সে সুযোগ এনে দিয়েছে।

পৃথিবীতে যত ধর্ম এসেছে—হিন্দু ধর্ম, ইহুদি ধর্ম, খ্রিষ্টান ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম এবং ইসলাম ধর্ম—প্রত্যেক ধর্মেই রোজা, উপবাস বা ফাস্টিং-এর বিধান রয়েছে। একেক ধর্মে একেকভাবে বিধান এসেছে। যারা এই বিধান অনুসরণ করবেন তারা উপকৃত হবেন শারীরিক মানসিক আত্মিকভাবে।

এবছর রোজা প্রায় পুরোটাই বৈশাখ মাসে পালন করা হবে। গ্রীষ্মকালীন রোজার জন্যে আমাদের বিশেষভাবে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত। কারণ এসময় রোজা শরীরের জন্যে সবচেয়ে বেশি উপকারী। প্রায় ১৫ ঘণ্টা খাবার এবং পানি গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে। আসলে উপবাস, রোজা বা ফাস্টিং-এর ১২ তম ঘণ্টা থেকে সবচেয়ে বেশি শারীরিক উপকার পাওয়া যায়। ১৬ তম ঘণ্টায় তা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়।

একটা সময় ছিল যখন আমাদের মুনি-ঋষি, অলি-বুজুর্গ, নবী-রসুলেরা রোজা, ফাস্টিং বা উপবাসের উপকারিতার কথা বলেছেন। আর সে কথাই এখন চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বলছেন, স্বাস্থ্যবিজ্ঞানী, ডায়েট বিশেষজ্ঞরা বলছেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা রোজার নাম দিয়েছেন 'অটোফেজি'। আপনারা জানেন যে, রোজার উপকারিতা নিয়ে গবেষণা করে জাপানি চিকিৎসাবিজ্ঞানী ইউশিনোরি ওশুমি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি রোজার উপকারিতা বৈজ্ঞানিকভাবে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন।

আমাদের দেহকোষগুলোতে নিয়মিত টক্সিন সৃষ্টি হয়। দেহকোষগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত বাইরে থেকে খাবার পায় ততক্ষণ তারা খেতে থাকে। কিন্তু আপনি যখন দীর্ঘসময় উপবাস করেন, রোজা রাখেন, তখন এই কোষগুলো বাইরে থেকে আর কোনো খাবার পায় না। ফলে সে ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে।

আমরা যে-রকম বেশি ক্ষুধা লাগলে খাবারের মান নিয়ে কোনো বাছবিচার করি না, যা পাই তা-ই খাই, তেমনি দেহকোষগুলো যখন ক্ষুধায় আক্রান্ত হয়, তখন সে ভালো-মন্দ বিচার করে না। বরং শরীরের অভ্যন্তরে যে টক্সিন বা বিষাণু সৃষ্টি হয়, এই টক্সিনগুলোকেই সে খেয়ে ফেলে। ফলে দেহের ভেতরে জমতে থাকা টক্সিন দূর হয়ে যায়।

যে টক্সিন ছিল দেহের আবর্জনা, সেগুলোকেই দেহকোষ হজম করে শক্তিতে রূপান্তরিত করে। এই প্রক্রিয়াটির তুঙ্গ মুহূর্ত হলো উপবাসের ১২ থেকে ১৬ তম ঘণ্টা।

চিকিৎসাবিজ্ঞান রোজা সম্পর্কিত অনেক ভুল ধারণার অবসান ঘটিয়েছে গত কয়েক বছরে। একটা সময় ধারণা ছিল—ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তি রোজা রাখতে পারবে না। রোজা তাদের জন্যে ক্ষতির কারণ হতে পারে। কিন্তু সম্প্রতি গবেষণায় সেটি ভুল প্রমাণিত হয়েছে। রোজা ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যে যে অত্যন্ত উপকারী, যাদের ডায়াবেটিস আছে তারা নিজেরা রোজা রেখে তা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। রোজা দেহের রক্তের ক্ষতিকারক কোলেস্টেরল কমিয়ে দেয়। ফলে আলঝেইমার্স, হান্টিংটন্স, পারকিনসন্স, উচ্চ রক্তচাপ, আলসার এবং বয়সজনিত মস্তিষ্কের রোগের ঝুঁকি কমে।

বিজ্ঞানীদের এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা নবীজীর (স) একটি হাদীসের বক্তব্যের প্রমাণ এখন আমরা পাচ্ছি। নবীজী (স) বলেছেন, 'রোজা রাখো, যাতে তোমরা সুস্থ থাকতে পারো'। *[আবু হুরায়রা (রা), আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা); তাবারানী]*

যখন আপনি রোজার নিয়ম মেনে রোজা রাখবেন, তখন নিঃসন্দেহে শারীরিক-মানসিকভাবে সুস্থ থাকবেন। আতঙ্ক, ভয় এবং ভয়জনিত যতরকম মনোবিকার রয়েছে, সে-সব থেকে আপনি বেরিয়ে আসতে পারবেন।

রমজান মাস এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? এর কারণ হচ্ছে রমজান মাসেই কোরআন নাজিল হয়েছে। আর কোরআন কী? সূরা বনি ইসরাইলের ৮২ নম্বর আয়াতে খুব পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, 'বিশ্বাসীর জন্যে কোরআন হচ্ছে শেফা এবং রহমতস্বরূপ'। আরো সহজ বাংলায় যদি বলি তাহলে

কথাটি দাঁড়ায়, কোরআন হচ্ছে বিশ্বাসীর জন্যে নিরাময় এবং করুণার প্রতীক। নিরাময় এবং করুণার ভাণ্ডার হচ্ছে কোরআন। রহমত বা কল্যাণ শব্দের অর্থ আমরা বুঝি। শেফা বা নিরাময়—এই শব্দের অর্থ যে কত ব্যাপক, তা অনেকের কাছেই সুস্পষ্ট নয়।

শেফা আরবি শব্দ। এখন থেকে ৬৮ বছর আগে প্রফেসর হ্যান্স ওয়ের আরবি-ইংরেজি অভিধান রচনা করেছিলেন। এখন পর্যন্ত এটা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অভিধান হিসেবে সারা পৃথিবীতে প্রচলিত।

প্রফেসর হ্যান্স 'শেফা' শব্দটির অনেকগুলো অর্থ করেছেন। To cure somebody of a disease—কাউকে রোগমুক্ত করা। Heal a disease or wound—কাউকে রোগ অথবা আহত অবস্থা থেকে নিরাময় করা। Make somebody well—কাউকে ভালো করা। Restore to health—কারো স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করা। Recover to bring a person back to health—রোগমুক্ত করে একজনকে সুস্বাস্থ্যের দিকে নিয়ে আসা। To quench one's thirst—কারো পিপাসা নিবারণ করা। To gratify one's desire—কারো চাওয়া/ ইচ্ছা/ মনছবি বা লক্ষ্য পূরণ করা।

ইবনে সিনা। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক। যার বই—*ক্যানন অব মেডিসিন* ৫০০ বছর ধরে ইউরোপে চিকিৎসাবিজ্ঞানের পাঠ্যবই ছিল। তার আরেকটি বইয়ের নাম হচ্ছে *কিতাব আল শিফা*। বইটি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, It is a scientific and philosophical encyclopedia written by Abu Ali Ibne Sina. Despite its English title, it is not concerned with medicine, also called the cure. The book is intended to cure or heal ignorance of the soul.

কিতাব আল শিফা ইবনে সিনার লেখা বিজ্ঞান ও দর্শনের বিশ্বকোষ। এর ইংরেজি নাম *দ্য বুক অব হিলিং* অর্থাৎ নিরাময়ের বই হওয়া সত্ত্বেও এই বইটি ওষুধের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। এই বইটিকে *নিরাময়* বলেও নামকরণ করা হয়। বইটি লেখার লক্ষ্য ছিল আত্মাকে অজ্ঞতামুক্ত করা। অর্থাৎ আত্মার অজ্ঞতা নিরাময় করা। আরবি-ইংরেজি অভিধান এবং ইবনে সিনার *কিতাব আল শিফা* বই থেকে আমরা বলতে পারি—'শেফা' অর্থ হচ্ছে মনোদৈহিক ও মনোজাগতিক নেতিবাচকতা এবং বিকৃতি থেকে নিরাময়ের উপায়।

শারীরিক মানসিক আত্মিক সামাজিক—যতরকম রোগব্যাধি আছে,

যতরকম নেতিবাচকতা বিকৃতি বিকার ভয় আতঙ্ক আছে, এর নিরাময়ক হচ্ছে কোরআন। অস্থিরতা হতাশা ইত্যাদি সমস্যা থেকে, অমানবিকতা পাশবিকতা দারিদ্র্য—সবকিছু থেকে নিরাময় করে কোরআন।

করোনা আতঙ্ক আজ যখন মানুষের হৃদয় থেকে সমমর্মিতা কেড়ে নিয়েছে, আতঙ্কে মানুষ যখন মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দিয়েছে, জাহেলিয়াতের এক নব্যযুগে যখন আমরা প্রবেশ করেছি, তখন এ থেকে উত্তরণের জন্যে কোরআনের চেয়ে প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ বা বিধিবিধান আর কিছু নেই।

আসলে আমরা যদি এই নব্য জাহেলিয়াতকে দেখি যে, মানুষ কতটা অস্থির হলে, পাশবিকতা কতটা আচ্ছন্ন করে ফেললে একজন মৃতকে দাহ করতে বা কবরস্থানে দাফন করতে বাধা দিতে পারে! কতটা অমানুষ হলে এটা দল বেঁধে করা সম্ভব!

এক মা তার ছেলের লাশ নিয়ে সৎকার করানোর জন্যে চিৎকার করছে, কিন্তু তার অন্য সন্তানরা সেই লাশের সৎকারে এগিয়ে আসছে না। মনুষ্যত্বের কতটা অভাব হলে এটা সম্ভব! ২১ ঘণ্টা সেই মা লাশ নিয়ে বসেছিলেন, কেউ আসে নি শেষকৃত্যের জন্যে।

কতটা আতঙ্কপাগল হলে ছেলে, দুই মেয়ে এবং মেয়েদের জামাই ৫০ বছরের বৃদ্ধা মাকে বাড়ি নেয়ার কথা বলে পথে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে যেতে পারে! এ বয়সের একজন মা অসুস্থ ... কতটা অমানুষ হলে আক্রান্ত হওয়ার আতঙ্কে তাকে ঘর থেকে বের করে দিতে পারে!

এক লোক অসুস্থ। তার সাত বছরের শিশু আশেপাশে সব ঘরের দরজায় গিয়ে কাকুতিমিনতি করছে যে, আমার বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে যাও! বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে যাও! কেউ দরজা খুলে বের হয় নি! লোকটি মারা যাওয়ার পরেও কেউ তার দাফন-কাফনে এগিয়ে আসে নি। অর্থাৎ আমাদের ভয়-আতঙ্ক স্বার্থপরতা অমানবিকতা পাশবিকতা কোন স্তরে পৌঁছেছে! কোন জাহেলিয়াতে আমরা প্রবেশ করেছি সেটা খুব সহজেই বুঝতে পারি।

একজন মানুষ—সে যে মানুষ, এটার প্রমাণ হচ্ছে তার সমমর্মিতা, তার সমব্যথিতা, দয়ামায়া, অন্যের বিপদে এগিয়ে আসার মনোভাব। সে-ই মানুষ, অন্যের বিপদে সাহায্য করতে যে এগিয়ে আসতে পারে। বিপন্ন মানুষের পাশে, বিপন্ন প্রাণের পাশে যে দাঁড়ায় না, তাকে মানুষ বলে ভাবব কীভাবে!

আমাদের সমাজব্যবস্থার ওপর সোশ্যাল মিডিয়ার যে আগ্রাসন, যে নেতিবাচক প্রভাব, যা আমরা ১০ বছর আগে বলেছিলাম—এই সোশ্যাল

মিডিয়া আমাদেরকে সমাজবিচ্ছিন্ন স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক অমানুষ বানাবে; করোনা আতঙ্ক সেই আশঙ্কাকেই বাস্তব রূপ দিয়েছে।

করোনাকে আমরা মনুষ্যত্ব পরিমাপের কিট (kit) বলতে পারি। আমরা মানুষ, না পশু? আমাদের মধ্যে কি মানবিকতা আছে, না আমরা জাহেলিয়াতে আক্রান্ত অসভ্য-বর্বর অমানুষ—করোনা-কিট অর্থাৎ কোভিড-১৯ টেস্ট কিট দিয়ে আমরা তা মাপতে পারি।

কোরআন জাহেলিয়াত থেকে আরববাসীকে মুক্ত করেছিল। গত এক মাস সমাজের জাহেলিয়াতের যে-রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, সেখান থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ, শেফা পাওয়ার, রহমতে প্লাবিত হওয়ার, করুণায় স্নাত হওয়ার পথ হচ্ছে কোরআন। যত কোরআনের গভীরে ডুবে যাবেন, তত ভেতর থেকে আপনার দেহ-মন-আত্মার নিরাময় হতে থাকবে। মনোবিকার, ভয়-আতঙ্কের পাগলামি থেকে আপনি বেরিয়ে আসতে পারবেন।

রমজান আমাদের সামনে এবার সেই সুযোগ নিয়ে এসেছে। যারা কোরআনের মধ্যে ডুবে গিয়ে নিজের মানবিকতার পুনরুত্থান ঘটাতে পারবেন, তারাই রমজানে সবচেয়ে ভাগ্যবান বলে পরিগণিত হবেন। কোরআন শুধু করোনা আতঙ্ক থেকে মুক্ত হওয়ার শেফা হিসেবেই কাজ করবে না, কোরআন সবরকম অপূর্ণতাকে পূর্ণতায় পরিণত করার রহমত হিসেবেও কাজ করবে।

আর রমজানে আপনি যত শুদ্ধাচার অনুসরণ করবেন, রমজানের করণীয়-বর্জনীয়গুলো যত সুন্দরভাবে পালন করবেন, রমজান তত কল্যাণময় হবে। তত বেশি শারীরিক ও মানসিক কল্যাণ আপনি লাভ করবেন।

ঘরে ঘরে সাদাকায়ন (অডিও) : ১৭ এপ্রিল ২০২০

সমমর্মিতায় সিক্ত হোন এ রমজানে

‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন করা হয়েছিল তোমাদের পূর্বসূরিদের ওপর। যাতে তোমরা আল্লাহ-সচেতন থাকতে পারো।’ *[সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৩]*

রমজান মাস শুরু হচ্ছে। আপনি ভাগ্যবান! আপনি জীবনে আরেকবার স্রষ্টা-সচেতন হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। কারণ রমজান স্রষ্টা-সচেতনতার মাস। আপনি যাতে সবসময় স্রষ্টা-সচেতন থাকতে পারেন, তার অনুশীলন করতে পারেন এই রমজান মাসে। আপনি যত স্রষ্টা-সচেতন থাকবেন, তত সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। এজন্যেই নবীজী (স) বলেছেন, ‘রোজা রাখো, যাতে তোমরা সুস্থ থাকতে পারো।’ *[আবু হুরায়রা (রা), আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা); তাবারানী]*

এই সুস্থতা শারীরিক-মানসিক-সামাজিক-আত্মিক। সব দিক থেকে যাতে আপনি ভালো থাকতে পারেন, সেজন্যেই রমজান মাসের এত গুরুত্ব। স্রষ্টা-সচেতনতা, তাকওয়া যাতে আপনার জীবনের সাথে মিশে যায়—তারই প্রক্রিয়া হচ্ছে রোজার বিধান।

রোজার প্রাথমিক প্রাপ্তি হচ্ছে মনোদৈহিক সুস্থতা। রোজায় আপনি সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন তখনই, যখন নবীজী (স) যে নিয়মে রোজা পালন করতেন, সেই নিয়ম আপনি অনুসরণ করবেন। সিয়াম, রোজা বা উপবাসের প্রাথমিক প্রাপ্তিই হচ্ছে মনোদৈহিক সুস্থতা।

রোজা রাখলে শারীরিক-মানসিকভাবে আপনি ফিট থাকবেন। শারীরিক-মানসিক এনার্জি লেভেল, প্রাণবন্ততা বেড়ে যাবে। ভেতর থেকে সুস্থতার একটা অনুভূতি আসবে। এটাই হচ্ছে সঠিক নিয়মে রোজা পালনের ফলাফল।

রোজা যত দীর্ঘায়িত হয়, শরীরের টক্সিন তত হ্রাস পেতে থাকে। আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি, আমাদের দেশে আমরা গরমের সময় দীর্ঘ রোজা রাখার সুযোগ পাই। দীর্ঘ রোজায় সারাদিন না খেয়ে থাকার ফলে আপনার দেহকোষে খাদ্যসংকট সৃষ্টি হয়। যখনই দেহকোষ বাইরের খাবার পায় না, তখন কোষের ভেতরে ডাস্টবিনে যে টক্সিন বা বিষাণু জড়ো হয়েছিল, এই টক্সিনগুলোকেই সে খেতে শুরু করে।

রোজা দেহকে শুধু টক্সিনমুক্ত করে না, রোজা এই টক্সিনগুলোকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে। এটাকেই চিকিৎসাবিজ্ঞানে এখন বলা হয়—অটোফেজি। আসলে রোজার মেডিকেল নামই হচ্ছে অটোফেজি। মুসলমানরা রাখলে রোজা, হিন্দু-বৌদ্ধরা রাখলে উপবাস, খ্রিষ্টানরা রাখলে হয় ফাস্টিং। আর বিপ্লবীরা বা রাজনৈতিক কর্মীরা না খেয়ে থাকলে হয় অনশন। এই উপবাস অনশন রোজা যত দীর্ঘায়িত হয় শরীর থেকে টক্সিন তত হ্রাস পেতে থাকে। শরীরের নিজস্ব প্রক্রিয়াতেই এটা শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

নবীজী (স) যেভাবে ইফতার করতেন, যেভাবে সেহরি করতেন, সেই আলোকে আমরা যদি আমাদের খাবারের ব্যবস্থাপনাটাকে সাজিয়ে নিই, তাহলেই রোজার শারীরিক ও মনোদৈহিক উপকার আমরা সুন্দরভাবে পাব।

ইফতারের ক্ষেত্রে দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে আমরা বলে এসেছি, ইফতার করবেন খেজুর-পানি দিয়ে। খেজুর ভালো করে চিবিয়ে খাবেন। একটু সময় নিয়ে চিবোবেন। দুই-চার মিনিট ধরে। তারপরে যখন একগ্লাস পানি পান করবেন, আপনার তৃষ্ণা এবং ক্লান্তি-ভাবটা মুহূর্তে দূর হয়ে যাবে। নতুন এক প্রাণশক্তি আপনি অনুভব করবেন। ইফতারে সব ধরনের ভাজাপোড়া, তৈলাক্ত খাবার, বাইরের খাবার বর্জন করবেন।

তারপর মাগরিবের নামাজ পড়ে নিন এবং নামাজ শেষে রাতের খাবার খেয়ে নিন। রাতের খাবারে মাছ-মাংস-ডিম-ডাল-সবজি, ভাত পরিমাণমতো রাখতে পারেন। যতটা খাওয়া প্রয়োজন খেয়ে নিন। এশার নামাজের পর তারাবির নামাজ আদায় করে নিতে পারেন। আরো যদি ইবাদত করতে চান করুন। কারণ রমজান ইবাদতের মাস।

সারাদিন না খেয়ে থাকতে হবে মনে করে সেহরিতে কখনো বেশি খাবেন না। সেহরিতে প্রোটিনজাতীয় খাবার যত বেশি খাবেন তত পানির তৃষ্ণা বাড়বে। আসলে না খেয়ে থাকারও একটা টেকনিক আছে। আপনি যত কম খাবেন ক্ষুধা তত কম লাগবে। সেহরিতে যত বেশি খাবেন, ক্ষুধা-তৃষ্ণা তত বেশি লাগবে। এজন্যে খুব অল্প ভাত, এক বাটি সবজি খাবেন। একটু ফল খেতে পারেন। আর পর্যাপ্ত পানি পান করবেন। সারাদিন চমৎকার কাটবে। রমজান আপনার জন্যে সব দিক থেকে সুস্থতার মাস হতে পারে, যদি সঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারেন।

এ মাসের এত গুরুত্ব কেন? নবীজী (স) বলেছেন, 'রমজান মাসে একটি নফল ইবাদত ফরজ আদায়ের সমান সওয়াবের। আর একটি ফরজ ইবাদত ৭০টি ফরজ আদায়ের সমান সওয়াবের।' *[সালমান ফারসি (রা); মেশকাত]* কারণ এই মাসে কোরআন নাজিল হয়েছিল। কোরআন নাজিলের মধ্য দিয়ে আল্লাহ মানুষকে তার জীবন সুন্দর ও কল্যাণময় করার, সফল ও সুখী করার ম্যানুয়াল দান করেছেন। এজন্যেই এ মাসে যে-কোনো ভালো কাজের নেকি বা সওয়াব এত বেশি।

কোরআন চর্চা অন্তরের উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ, মানসিক চাপ থেকে মুক্তি দিতে পারে। রমজান মাসে যত বেশি বেশি কোরআন চর্চা করব, কোরআন অনুশীলন করব, তত ভেতর থেকে অন্তরের জটিলতা, নেতিবাচকতা, অন্তরের ভয়, বিভ্রান্তি থেকে বেরিয়ে আসতে পারব। এই বেরিয়ে আসাটা অনেকটা অবলীলায় হয়ে যাবে যদি আপনি কোরআনের গভীরে ডুব দিতে পারেন।

কারণ কোরআন এমন একটি গ্রন্থ, যা সমগ্র মানবজাতির জন্যে। জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে যে-কোনো ধর্মের, বর্ণের, যে-কোনো অঞ্চলের, ভাষার মানুষ কোরআন থেকে কল্যাণ লাভ করতে পারে, শেফা বা নিরাময় লাভ করতে পারে, রহমত লাভ করতে পারে।

কোরআন এমন এক গ্রন্থ, যা খুব সহজসরল। যা বোঝার জন্যে কোনো বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন শুধু আন্তরিক ইচ্ছা বা অভিপ্রায়ের। কারণ কোরআনে দুটো বিষয়ের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে—কথা এবং শব্দ। অর্থাৎ বাণী এবং ধ্বনির এ অপূর্ব সমন্বয় যে-কোনো মানুষকে তার অন্তরের উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ, মানসিক চাপ থেকে মুক্তি দিতে পারে।

কোরআনের জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। জীবনে সবচেয়ে বড় পাপ যদি কিছু থাকে, সেটা হলো কোরআনের জ্ঞান অর্জনের জন্যে প্রচেষ্টা না চালানো।

কোরআনের জ্ঞান থেকে নিজেকে দূরে রাখা। আপনি কতটা মানবেন সেটা পরবর্তী ধাপ। আগে আপনাকে জানতে হবে যে, আল্লাহ তায়ালা কোরআনে আপনাকে কী বলছেন। যখন আপনি জানলেন—সবচেয়ে বড় ফরজ আদায় হয়ে গেল। এরপর জানাটাকে যখন আপনি একটু একটু করে মানতে শুরু করবেন, তখন আরেকটি ফরজ আদায় হবে। আর জানার পরে যদি না মানেন তো না মানার পাপ হবে। না জানার পাপ থেকে আপনি রেহাই পাবেন কিন্তু যদি না জানেন, আপনার পাপ হবে দ্বিগুণ।

কোরআনকে আত্মস্থ করতে হলে কোরআন যেভাবে বলেছে, সেই প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। তবেই সফলভাবে কোরআনের জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হবে। কোরআনের জ্ঞানকে উপলব্ধি করার জন্যে ফাউন্ডেশন গত ২১ বছর ধরে কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআন কার্যক্রম পরিচালনা করে এসেছে। কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআনের উদ্দেশ্য একটাই—কোরআনের জ্ঞানকে আত্মস্থ করা, নিজের হৃদয়ের গভীরে অনুভব করা, উপলব্ধি করা।

সূরা আরাফের ২০৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা পরিষ্কারভাবে বলেছেন, 'যখন কোরআন পাঠ করা হয় তখন মৌন থাকো এবং মনোযোগ দিয়ে শোনো। যাতে তোমরা রহমত পেতে পারো।' অর্থাৎ কোরআন থেকে কল্যাণ লাভ করার উপায় হচ্ছে মৌন থেকে মনোযোগ দিয়ে শোনা। এই প্রক্রিয়ায় কোরআন চর্চার প্রোগ্রামই হচ্ছে কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআন।

আপনারা যে যেখানে আছেন—নিজ ঘরে নির্ধারিত সূচি অনুসারে তেলাওয়াত ও মর্মবাণী অডিও শুনে কোরআনের গভীরে ডুব দিতে পারবেন। খতমে কোরআনের অডিও কোয়ান্টামের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে অনুশীলন করতে পারবেন। রমজান মাসে এটি বিশাল সওয়াবের কাজ হবে। নবীজীর (স) হাদীস অনুসারে আমরা হিসাব করে দেখেছি—একশত ২৪ কোটি ৮৫ লক্ষ ২০ হাজার বছর নফল ইবাদতের সমান নেকি হবে ৫৩ ঘণ্টা কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআনে নিমগ্ন হওয়ার মাধ্যমে।

কোরআনে নিমগ্ন হয়ে অন্তরের আবর্জনা থেকে মুক্ত হোন। এই সময়টা যখন আপনি কোরআনের মর্মবাণী এবং ধ্বনিতে ডুবে যাবেন, দেখবেন—আপনার ভেতর থেকে পারিবারিক, সামাজিক, আর্থিক বা করোনা নিয়ে যত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, তা কখন যে মিলিয়ে যাবে! প্রশান্তির সুবাতাস বইবে আপনার ভেতরে, আপনি তা অনুভব করবেন। অনুভব করবেন, ভেতর থেকে কত ময়লা-আবর্জনা বেরিয়ে গেছে কোরআনে আন্তরিকভাবে নিমগ্ন হওয়ার ফলে।

রমজান একদিক থেকে শারীরিক সুস্থতার মাস। ইবাদত ও কোরআন অনুশীলনের মধ্য দিয়ে শারীরিক মানসিক পারিবারিক আত্মিক সুস্থতার মাস। এ মাসে দানের সওয়াবও অন্য যে-কোনো মাসের চেয়ে ৭০ গুণ বেশি। যে কারণে রসুলুল্লাহ (স) এই মাসে বেশি বেশি দান করতেন। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের হাদীস—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, 'নবীজী (স) আমাদের মধ্যে সবচেয়ে দানশীল ছিলেন, আর রমজান মাসে তার দানশীলতা আরো বেড়ে যেত।'

তাই এ মাসে প্রত্যেক বিশ্বাসীর উচিত বেশি বেশি দান করা। নবীজী (স) রমজান মাসে কারো উপকার করা, কল্যাণ করা, সমস্যা দূর করা, অভাব মোচন করার জন্যে কাজ করাকে এতেকাফের চেয়েও অনেক বেশি সওয়াবের কাজ বলে বর্ণনা করেছেন।

আমরা প্রামাণ্য হাদীস গ্রন্থ থেকে বুঝতে পারি, রমজান মাসে অভাবী অথবা বিপদগ্রস্তের প্রয়োজন পূরণে দান করা, কারো সাহায্যে এগিয়ে আসা বা বেরিয়ে পড়া মসজিদে বসে ১০ বছর এতেকাফ করার চেয়েও বেশি পুণ্যের, বেশি সওয়াবের। শুধু যে অভাবী বিধবা এতিমের প্রয়োজন পূরণে কাজ করা এতেকাফের চেয়ে বেশি সওয়াবের, তা-ই নয়। কখনো কখনো এই সওয়াব হজ না করেও হজ কবুল হওয়ার সওয়াবের সমান হতে পারে।

মুচি আহমেদ আশফাকের গল্প আমরা জানি—

ইলমে মারেফতের একজন খুব বড় বুজুর্গ ছিলেন জুন্নুন মিসরি। হজ শেষ করে আরাফাতের ময়দানে তিনি ধ্যানে ডুবে গেলেন। ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তিনি জানতে পারলেন—এবছর কেবল একজনের হজ কবুল হয়েছে।

একথা উপলব্ধি করার পর তিনি দুঃখিত হলেন, চিন্তিতও হলেন। ভাবতে লাগলেন, এত এত হাজীর মাঝে শুধু একজনের হজ কবুল হয়েছে! তাহলে নিশ্চয়ই আমার হজ কবুল হয় নি। এই ভাবনার মাঝে যখন তিনি ডুবে গেলেন তখন জানতে পারলেন—সেই হাজীর হজ কবুলের ওসিলায় সকল হাজীর হজ কবুল হয়েছে। তখন তার নতুন ভাবনা এলো—যার হজ কবুল হয়েছে, তিনি নিশ্চয়ই খুব কামেল। তার সাথে অবশ্যই দেখা করা দরকার।

ধ্যানমগ্ন অবস্থায়ই জানতে পারলেন, এবছর হজ কবুল হয়েছে এমন একজনের, যিনি হজেই আসেন নি। তিনি মুচি। থাকেন দামেস্কে। বুজুর্গ জুন্নুন মিসরির কৌতূহল আরো বেড়ে গেল। ভাবলেন, তাকে খুঁজে বের

করতেই হবে। তিনি দামেস্কে গেলেন এবং অনেক খোঁজাখুঁজির পরে সেই মুচি—আহমেদ আশফাকের খোঁজ পেলেন।

তিনি দেখলেন, লোকটি খুব সাধারণ একজন মানুষ। সরল। দয়ালু। তিনি কারণ খুঁজে পেলেন না যে, কেন তার হজ কবুল হলো। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হজের সময়ে কী কী ঘটেছিল?

আহমেদ আশফাক বললেন, আমার উপার্জন খুব সামান্য। সংসারের খরচ মিটিয়ে যা বাঁচে তা একটু একটু করে জমিয়ে ৪০ বছর ধরে হজের খরচ জোগাড় করেছিলাম। হজযাত্রার জন্যে যখন সবকিছু ঠিকঠাক, তখনই এক ঘটনা আমার সমস্ত চিন্তাকে ওলটপালট করে দিলো। যেদিন রওনা করব, সেদিন সকালে আমার ছোট ছেলে কাঁদতে কাঁদতে এসে জানাল, এক প্রতিবেশীর বাড়িতে সে গিয়েছিল। মাংস রান্নার গন্ধ পেয়ে একটু মাংস খেতে চেয়েছিল। সেই প্রতিবেশী মাংস তো দেয়ই নি, উপরন্তু তাকে সেখান থেকে চলে যেতে বলেছে।

শুনে আহমেদ আশফাক বেশ উত্তেজিত হয়ে গেলেন। এ কেমন কার্পণ্য! ছোট্ট একটি ছেলেকে সামান্য মাংস দেয় নি!

মুচির চেঁচামেচি শুনে প্রতিবেশী বেরিয়ে এলো। খুব অনুনয় করে বলল, ভাই! তোমার রাগ হওয়াটা স্বাভাবিক। বাচ্চাটাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে আমারও খারাপ লেগেছে। কিন্তু আমি নিরুপায় ছিলাম। জেনেশুনে তোমার ছেলেকে মরা গাধার মাংস খেতে দেই কীভাবে! আমাকে ক্ষমা করে দিও।

এবার আহমেদ আশফাকের অবাক হওয়ার পালা। মরা গাধা! মানে কী! সব খুলে বলো। প্রতিবেশী তখন বলল, বেশ অনেকদিন ধরে কাজ জোগাড় করতে পারছি না। ঘরে যা খাবার ছিল, তা-ও ফুরিয়ে গেছে। গত কয়েকদিন ছেলেমেয়ে নিয়ে একেবারে অনাহারেই ছিলাম। অবশেষে ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে আজকে সকালবেলা ঘর থেকে বের হলাম। মাঠের ধারে দেখলাম একটা গাধা মরে পড়ে আছে।

সদ্যমৃত। পচন ধরে নি। সেটারই খানিকটা মাংস ছুরি দিয়ে কেটে এনে স্ত্রীকে রান্না করতে বললাম। যখন মাংস হাঁড়িতে রান্না হচ্ছিল, তখনই তোমার ছেলে এলো। আমরা না হয় ক্ষুধার তাড়নায় মরা গাধার মাংস খেতে বাধ্য হচ্ছি। কিন্তু তোমার ছেলেকে তো তা খাওয়াতে পারি না!

শুনে আহমেদ আশফাক বললেন, দুঃখে অনুতাপে সমবেদনায় কিছুক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারলাম না। চোখ ফেটে পানি এলো। প্রতিবেশীকে

জড়িয়ে ধরলাম। বললাম, ভাই আমার! এত কষ্ট নিয়ে তুমি আছ! আমাকে তো একটু জানাতে পারতে।

দৌড়ে গেলাম বাড়িতে। এক ঝটকায় তুলে নিলাম সঞ্চয়কৃত টাকার থলেটা। হজে যাওয়ার জন্যে ৪০ বছর ধরে যা জমাচ্ছিলাম, তা প্রতিবেশীর হাতে দিলাম। বললাম, এই নাও, আমার ৪০ বছরের সঞ্চয়। এটা দিয়ে কোনো ব্যবসা শুরু করো। আমার হজে যাওয়ার চেয়েও তোমার দুঃখমোচন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

জুন্নুন মিসরি অবাক চোখে তাকিয়ে থাকলেন মুচি আহমেদ আশফাকের দিকে। তার সমমর্মিতায় তিনি আপ্লুত হলেন এবং বুঝলেন, হজে সশরীরে উপস্থিত না থাকা সত্ত্বেও কেন তার হজ আল্লাহর কাছে কবুল হয়েছে।

এই সমমর্মিতাই হচ্ছে রমজানের সবচেয়ে বড় শিক্ষা। আপনি সংযমী হবেন, জ্ঞানী হবেন, ধ্যানী হবেন, সমমর্মী হবেন। সমমর্মিতা এতেকাফের চেয়েও অনেক গুণ বেশি নেকির অধিকারী করতে পারে।

এবারের রমজান আমাদের সামনে এক অফুরন্ত কাজের সুযোগ নিয়ে এসেছে। সংযম পালন করলে একদিকে শারীরিক-মানসিক শুদ্ধি ঘটবে, অন্যদিকে শরীরের অভ্যন্তরের সমস্ত টক্সিন বেরিয়ে যাবে।

সুযোগ থাকলে প্রতিদিন দুই/ চার পারা কোরআন পাঠ করে রমজান মাসে আরো দুই/ তিন খতম দিন। কোরআনের মর্মবাণীতে ডুবে যান।

টিভি-ফেসবুক ভুলে যান। সেই অসহায় মানুষগুলোর কথা চিন্তা করুন। যারা কোনোদিন ভিক্ষায় নামে নি, লকডাউনের ফলে কাজের অভাবে তারাও সন্ধ্যার পরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাতের জন্যে কান্না করছে। সেই মানুষগুলোর কথা স্মরণ করুন, যারা না খেয়ে থাকলেও হাত পাততে পারবে না আত্মসম্মান হারানোর ভয়ে। যারা দিন আনে দিন খায়, কাজ না থাকলে যাদের ঘরে ভাত থাকে না, তাদের কথা চিন্তা করুন। তাই সমস্ত বাহুল্য বর্জন করুন। লকডাউনের ফলে অসহায় হয়ে পড়া মানুষগুলোকে সাহায্য করুন।

এই রমজান মাসে নিজের খাবার তিন পদে সীমিত করুন। ঈদে খরচ যা-ই করতেন, সেখান থেকে খরচ বাঁচান। যারা ওমরায় যেতে পারছেন না, ওমরাহর টাকা যদি দুস্থ মানুষের কল্যাণে দান করেন, কারো অভাব মোচনে ব্যয় করেন, কোনো এতিমের মুখে খাবার জোগান, হয়তো এই ওসিলায়

আল্লাহর রহমতে আপনার ওমরাহ-ও একইভাবে কবুল হতে পারে, মুচি আশফাকের হজ যেভাবে কবুল হয়েছিল।

প্রিয় সুহৃদ, লামায় আমাদের আড়াই হাজার শিক্ষার্থী। ওরা কিন্তু কোয়ান্টামমেই আছে এবং খুব সুন্দরভাবেই আছে। আমাদের পক্ষে যতটুকু যত্ন নেয়া সম্ভব, যত্নের মধ্যে ওরা রয়েছে। ওদের পাশে আন্তরিকভাবে অর্থ-সাহায্য নিয়ে আপনি দাঁড়ান।

যারা এতিমের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং নতুন করে যারা দায়িত্ব নিতে চান, রমজানে প্রতিদিন তাদের কথা মনে করবেন। তাদের জন্যে দোয়া করবেন। যে দায়িত্ব আপনি নিয়েছেন, আন্তরিকভাবে এই দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করবেন। কারণ যদি না খেয়েও থাকে, ওরা কোনো অভিযোগ করবে না। ওদের না খাইয়ে যেন আমাদের কোনোদিন খেতে না হয়। আমরা যদি খাই, তার কিছু অংশ যেন ওদের জন্যে রেখে দেই।

হয়তো এই ওসিলায় পরম করুণাময় করোনা আতঙ্ক থেকে, বালা-মুসিবত থেকে আমাদেরকে এবং আমাদের জাতিকে করুণা করতে পারেন। ভয়-আতঙ্ক থেকে মুক্ত করতে পারেন।

করোনায় যত লোক মারা গেছে, সকলের জন্যে আমরা দুঃখিত। কিন্তু কাজ না থাকার কারণে যারা আয়-উপার্জনহীন হয়ে পড়েছেন, তাদের কষ্ট দূর করার জন্যে আমাদের যার যতটুকু সামর্থ্য আছে তা নিয়ে আমরা এগিয়ে আসতে পারি। তাহলে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই আমাদেরকে সকল আসমানি-জমিনী বালা-মুসিবত থেকে মুক্তি দেবেন।

এবারের রমজান মাসের পুরোটাই সংযম, ধ্যান, কোরআনের জ্ঞান এবং দানের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনের সবচেয়ে কল্যাণময় রমজান হোক—এই প্রার্থনা করছি। আপনাদের জীবন সমস্ত ভয় আশঙ্কা বালা-মুসিবত থেকে মুক্ত হয়ে নিরাময় এবং কল্যাণে, সফলতায় আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠুক।

পরম করুণাময় আমাদের সবার সহায় হোন।

ঘরে ঘরে সাদাকায়ন (অডিও) : ২৪ এপ্রিল ২০২০

কোরআন ॥
রহমত ও শেফা

রমজানের সপ্তম দিবসে আজকের বিশেষ আলোচনায় সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা জানি, রমজান অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ এবং বরকতময় একটি মাস। এই মর্যাদার কারণ হচ্ছে—আল কোরআন এ মাসে নাজিল হয়েছে।

সালমান ফারসি (রা) বর্ণিত হাদীসে রসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, 'এ মাসে এমন একটি রাত আছে, যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এ মাসের বরকত এতটাই যে, একটি নফল ইবাদত ফরজ ইবাদতের সমান সওয়াবের আর একটি ফরজ ইবাদত ৭০টি ফরজ আদায়ের সমান সওয়াবের।'

রসুলুল্লাহ (স) বলেন, 'রমজান মাসে তোমরা বেশি বেশি পাঠ করো—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নাই) ও আস্তাগফিরুল্লাহ (ক্ষমা করো আল্লাহ বা দয়াময় ক্ষমা করো) এবং আল্লাহর কাছ থেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রেহাই ও জান্নাতের জন্যে প্রার্থনা করো। এ মাসের প্রথম দশক রহমতের। মধ্যম দশক মাগফিরাতের। আর শেষ দশক হলো জাহান্নাম থেকে মুক্তির।' *[বায়হাকি, সহীহ ইবনে খুজায়মা]*

রোজা রাখার স্বাস্থ্যগত উপকারিতা সম্পর্কে আমরা যেমন জানি, তেমনি জানি রোজায় শুদ্ধাচার চর্চার গুরুত্ব। রোজা রেখে যদি দুর্ব্যবহার করেন, গীবত করেন, অশ্লীলতায় জড়িয়ে পড়েন, অন্যায় করেন, তাহলে রোজার উপকারিতা থেকে আপনি বঞ্চিত হবেন। রমজান মাসে রসুলুল্লাহ (স) বেশি বেশি দান করতেন। আমরা অনেকেই বেশি বেশি দান করার চেষ্টা করি। কারণ যে-কোনো ভালো কাজের পুরস্কার রমজান মাসে কমপক্ষে ৭০ গুণ।

আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে নবীজী (স)

বলেন, 'আল্লাহ বলেছেন, রোজাদারের পুরস্কার আমি নিজে দেই এবং তা আমি কোনোরকম অনুপাত বা হিসাব ছাড়াই দিয়ে থাকি।

রসুলুল্লাহ (স) আরো বলেছেন, 'ধৈর্য, সহনশীলতা ও সমমর্মিতা অনুশীলনের মাস রমজান। আর সমমর্মিতা অনুশীলনের পুরস্কার জান্নাত।' *[সালমান ফারসি (রা) : মেশকাত]*

এ মাসে সত্যিকার বিশ্বাসীদের রিজিক বৃদ্ধি করা হয়। যে-কেউ এই মাসে দাস, অধীনস্থ বা দুর্দশাগ্রস্তের দুর্দশা লাঘবের চেষ্টা করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে অব্যাহতি দান করবেন। সেসময় দাসপ্রথা ছিল। ক্রীতদাসদের জীবন ছিল অমানবিক। শোষণ এবং বঞ্চনা—এটাই ছিল তাদের ভাগ্যলিখন। শোষিত বঞ্চিত দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের জন্যে আল্লাহর রসুল (স) সবসময়ই সমমর্মিতা দেখিয়েছেন। তিনি বঞ্চিত দাসদের শুধু স্বাধীন মানুষের পর্যায়ে উন্নীত করেন নি; বরং স্বাধীন মানুষের ওপরে, অভিজাতদের ওপরে তাদেরকে নেতৃত্ব দেয়ার সুযোগ দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, 'শ্রমিকের শরীরের ঘাম শুকানোর আগে তার মজুরি পরিশোধ করো'। *[আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা); ইবনে মাজাহ, মেশকাত]*

তিনি নিজে মজুরি পরিশোধ করেছেন, তার সাহাবী এবং খলিফারা পরিশোধ করেছেন। শুধু মজুরি না, উৎপাদনের লভ্যাংশে শ্রমিকের অধিকার তিনি দেড় হাজার বছর আগে দিয়ে গেছেন।

আজকের দিনে তাঁর প্রতি আমরা দরুদ এবং সালাম পাঠাই। বিশেষ করে, আজ মে দিবসে তাঁর কথা মনে পড়ছে। শ্রমিকের যে অধিকার (শ্রমের ন্যায্য মজুরি এবং উৎপাদিত দ্রব্যের অংশ পাওয়া) তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন, পৃথিবীতে যাদেরকে আমরা সভ্যতা এবং মানবাধিকারের ধারক ও বাহক বলি, সেই যুক্তরাষ্ট্র যদি শ্রমিকের এই অধিকার দিত, তাহলে মে দিবসের জন্ম হতো না। শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্যে যারা সংগ্রাম করেছেন, যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন, তাদের সবার প্রতি আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

মে দিবসের পেছনের ঘটনা আমরা জানি। ১৮৮৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে দাসপ্রথা বিলুপ্ত হলেও শ্রমিকদের কাজের কোনো ধরাবাঁধা সময় ও নিয়ম ছিল না। কল-কারখানার অসহনীয় পরিবেশে ১৬ ঘণ্টা কাজ করতে হতো শ্রমিকদের। হাড়ভাঙা পরিশ্রম, সামান্য মজুরি, স্বল্প খাওয়া—এর বিরুদ্ধে ন্যায্য মজুরি এবং যুক্তিসঙ্গত কর্মঘণ্টা নির্ধারণের দাবিতে শিকাগোর শ্রমিকেরা এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন।

অনেক সংগ্রামের পরে কাগজে-কলমে তারা তাদের দাবি এবং অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। তার-ই স্মরণে প্রতিবছর সারা পৃথিবীতে পহেলা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালিত হয়। দিবস আমরা ঠিকই পালন করি কিন্তু শ্রমিকদের সামগ্রিক অবস্থার, শ্রমিকদের ভাগ্যের কতটা পরিবর্তন হয়েছে? শ্রমিক-কৃষক-মজুর, যাদের শ্রমে সবকিছু প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যেকটা দেশের অর্থনীতির মূল জোয়াল যাদের কাঁধে, তাদের অবস্থা কী?

যদি আমরা এখন ২০২০ সালে এসে দেখি, যুক্তরাষ্ট্রে ৮০ শতাংশ কর্মজীবী—শুধু শ্রমিক না, কর্মজীবী—যদি একসপ্তাহ বেতন না পান তো পরবর্তী সপ্তাহের খরচ চালানোর মতন টাকা তাদের হাতে থাকে না।

করোনাভাইরাসের শিকার হয়ে ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্রে যারা প্রাণ হারিয়েছেন, তাদের ৫০ শতাংশ ওল্ড এজ হোমে বসবাসরত পরিত্যক্ত নিঃসঙ্গ বয়োজ্যেষ্ঠ। আর বাকি যারা, এদের বড় অংশ হলো অভিবাসী শ্রমিক। যাদের শ্রমে ঘামে রক্তে পুঁজিবাদী ও ভোগবাদী দেশগুলোর অর্থনীতির চাকা ঘুরছে।

শুধু ইউরোপ-আমেরিকা না, সিঙ্গাপুরে কী অবস্থা? সিঙ্গাপুরের যে চাকচিক্য, এর পেছনে শ্রম দেয় অভিবাসী শ্রমিক। সিঙ্গাপুরে করোনার প্রধান শিকার অভিবাসী শ্রমিকেরা। ভোগবাদী সমাজ যাদের ব্যবহার করে শোষণের কাঁচামাল হিসেবে। শ্রমিকদের কল্যাণের দিকে তারা কোনো নজর দেয় নি।

আমাদের দেশেও যারা করোনা আতঙ্কে আছেন, তারা বিশাল বিশাল ফ্ল্যাটে থাকছেন দরজা-জানালা বন্ধ করে। অনলাইনে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পেয়ে যাচ্ছেন। এই রমজানে তারা অনেকেই রোজা রাখছেন, বিলাসী সেহরি বা ইফতার করছেন। কিন্তু যারা দিন আনে দিন খায়, যাদের কাজ না থাকলে খাবার জোটে না, এবারের রমজানে তাদের প্রতি যদি সমাজের উচ্চশ্রেণির এই মানুষেরা মমতার দৃষ্টিতে তাকাতেন!

অনেক সাধারণ মানুষ এই সময়ে সামাজিক মমত্ব নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। বিত্তবানদের অনেকে ওমরাহ অথবা হজের নিয়ত করেছিলেন। যেহেতু কোভিডের কারণে ওমরাহ বা হজে যাওয়া যাচ্ছে না, তারা ওমরাহ বা হজের জন্যে জমানো টাকা নিয়ে এসেছেন বঞ্চিতের অভাব ও দুর্দশা মোচনের জন্যে। তাদেরকে আমরা অভিনন্দন জানাই। যারা এখনো আসেন নাই, তাদের প্রতিও আহ্বান জানাই যে, মানুষের দুঃখ মোচনের মধ্য দিয়ে আপনি আপনার ইহকালীন ও পরকালীন দুর্দশা মোচনের পথ পেয়ে যাবেন।

অধিকাংশ বিত্তবান দান করতে পারে না কেন? তাদের মূল সমস্যাটা কোথায়? কোরআনের ১০০ নম্বর সূরায় আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—'তাকাও যারা ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান। যাদের পদাঘাতে স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়, যারা অভিযান চালায় ঊষালগ্নে, উৎক্ষিপ্ত ধূলিতে আঁধারে আচ্ছন্ন করে দিগন্ত, (অন্ধভাবে) ঢুকে পড়ে ভিড়ের মধ্যে (তছনছ করে সবকিছু নিজের স্বার্থে)। আসলে মানুষ তার প্রতিপালকের প্রতি বড় অকৃতজ্ঞ। আর সে নিজেই এর সাক্ষী। কারণ সে ধনসম্পত্তির আসক্তিতে নিমজ্জিত।' *[সূরা আদিয়াত; ১-৮]*

আসলে অর্থবিত্তের এই আসক্তি একসময় অর্থকেই তার দেবতা বানিয়ে ফেলে। যত অর্থ বাড়তে থাকে, সঞ্চয় বাড়তে থাকে, তত সে অনিশ্চয়তায় ভুগতে শুরু করে—অর্থ কখন হারিয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায় এই আতঙ্কে। অর্থপ্রাপ্তির সাথে সাথে অর্থ হারানোর আতঙ্কটাও তার মধ্যে বাসা বাঁধে। যে কারণে অধিকাংশ বিত্তবানই দান করতে পারে না।

পবিত্র কোরআন ১৪শ বছর আগে নাজিল হয়েছিল। কিন্তু কোরআন শুধু আধুনিক না, উত্তরাধুনিক। আজ কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআন শুরু হচ্ছে। এ প্রোগ্রামটি ফাউন্ডেশন শুরু করেছিল ১৯৯৯ সালে—এখন থেকে ২২ বছর আগে, খুব ছোট্ট আকারে। ধাপে ধাপে বড় পরিসরে। লকডাউন আমাদের সুযোগ এনে দিয়েছে ঘরে ঘরে কোয়ান্টায়নে কোরআন আয়োজন করার।

আসলে যেখানে কোরআন তেলাওয়াত করা হয়, যেখানে কোরআনের বাণী-মর্মবাণী শ্রবণ করা হয়, কোরআনের আলোচনা হয়, আল্লাহর ফেরেশতা সেখানে রহমতের ডানা মেলে দেয়। সেখানে রহমত বর্ষিত হতে থাকে। শুধু সওয়াব না, আল্লাহর রহমতের ছায়ায় আপনি আপনার ঘরকে নিয়ে আসতে পারছেন এই কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআনে অংশ নেয়ার মধ্য দিয়ে।

প্রতিবছর রমজান মাসে সাত দিনব্যাপী আমাদের এ আয়োজন। কেন? কোরআনের নির্দেশ পালনের জন্যে। সূরা আরাফের ২০৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যখন কোরআন পাঠ করা হয় তখন মৌন থাকো ও মনোযোগ দিয়ে শোনো। যাতে তোমরা রহমত পেতে পারো।'

আল্লাহর রসুল (স) মৌনতাকে কত গুরুত্ব দিয়েছেন! আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণিত হাদীস। রসুলুল্লাহ (স) বলেন, 'কেয়ামতের দিন দুটি আমল—পালন করা সহজ কিন্তু অত্যন্ত ওজনদার হবে। এক. শুদ্ধাচার, দুই. অধিক মৌনতা।' *[মেশকাত, তাবারানী]*

মৌনতা নবী-রসুলদের সুন্নত। কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআনের সময়

পূর্ণ মৌনতা পালন করুন। মোবাইল বন্ধ রাখুন ইফতার পর্যন্ত। ঘুম এলে বসা থেকে দাঁড়িয়ে যান। অন্যের সাথে কথা বলবেন না। এই সাত দিন যে ৫৩ ঘণ্টার মৌনতা, ধ্যানের স্তরে মর্মবাণীসহ তেলাওয়াত শোনা—এর সওয়াব যদি আপনি হিসাব করতে পারেন ...

যেহেতু ধ্যানের স্তরে মৌন থেকে শুনছেন—'নবীজী (স) বলেছেন, একঘণ্টার ধ্যান ৭০ বছরের নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম'। *[আবু হুরায়রা (রা); জামে উস-সগীর, ইবনে হিব্বান]*

রমজান মাসে যে-কোনো ইবাদতের সওয়াব কমপক্ষে ৭০ গুণ বেশি। যৌথভাবে ইবাদত করলে তার সওয়াব বাড়ে আরো ৭০ গুণ। আর কোরআনের জ্ঞান অর্জন করা ফরজ, তাই এর সওয়াব আরো ৭০ গুণ। এভাবে যদি হিসাব করেন, তাহলে প্রায় ১২৫ কোটি বছর নফল ইবাদত করলে যে সওয়াব হতো, তা আপনি পাবেন যদি আন্তরিকভাবে জানার উদ্দেশ্যে কোরআন পাঠ করেন; যে, আমি কোরআনকে বুঝতে চাই। জানতে চাই—আল্লাহ আমাকে কী বলেছেন। মানাটা পরের ব্যাপার।

কারণ কোরআন নাজিল হয়েছে ধ্যানের স্তরে। কোরআন নাজিল হওয়ার আগে ১৫ বছর নবীজী (স) প্রস্তুতি নিয়েছেন হেরা গুহায়। মাঝে মাঝেই তিনি হেরা গুহায় যেতেন। কোরআনের বাণী বা আয়াত যখনই নাজিল হতো, তিনি বিশেষ স্তরে চলে যেতেন। আশেপাশে সাহাবীরাও বুঝতেন যে, এখন রসুলুল্লাহর (স) ওপর কোরআনের আয়াত নাজিল হবে। তাই ধ্যানের স্তরে যখন শুনবেন, তখন এর মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারবেন। আপনার হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হবে। কোরআন মানার আকুতি সৃষ্টি হবে।

ধ্যানের স্তরে উপলব্ধি করা সহজ বলে আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন আয়াতে কোরআন নিয়ে ধ্যান করতে বলেছেন। সূরা সাবার ৪৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, '(হে নবী! ওদের) বলো, আমি তোমাদের একটিমাত্র পরামর্শ দিচ্ছি, এককভাবে বা যৌথভাবে আল্লাহর সামনে সচেতন হয়ে দাঁড়াও। নিজের গভীরে ধ্যানে নিমগ্ন হও। (তাহলেই উপলব্ধি করতে পারবে) তোমাদের সঙ্গী আদৌ উন্মাদ নয়। আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সে একজন সতর্ককারী মাত্র।'

সূরা নিসার ৮২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন, 'এরপরও কোরআনকে অনুধাবন করার জন্যে ওরা কি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হবে না (বা ওদের সহজাত বিচারবুদ্ধিও প্রয়োগ করবে না)? কোরআন যদি আল্লাহর কালাম ছাড়া অন্য কিছু হতো, তাহলে অবশ্যই এর মধ্যে অনেক অসঙ্গতি থাকত।'

সূরা মুহাম্মদের ২৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'এরপরও কি ওরা কোরআন নিয়ে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে তা অন্তরে ধারণ করবে না? নাকি মনের দরজা বন্ধই করে রাখবে?' আসলে ধ্যান ছাড়া মনের দরজা উন্মুক্ত হওয়া কঠিন। এজন্যেই আল্লাহ কোরআন নিয়ে ধ্যানে নিমগ্ন হতে বলেছেন। কোরআন নিয়ে ধ্যানকে আমরা তাই এত গুরুত্ব দেই। আসুন, কোরআনের জন্যে সাতটি দিন ব্যয় করুন। মৌন থাকুন। মনোযোগ দিন। কারণ জাতিধর্ম নির্বিশেষে কোরআন হচ্ছে শেফা এবং রহমত। কোরআনের তেলাওয়াতও যদি আপনি শোনেন, এর প্রাথমিক প্রাপ্তি হচ্ছে প্রশান্তি।

ডাক্তার আহমেদ কাজী দীর্ঘ ৩০ বছর কোরআন নিয়ে গবেষণা করেছেন। প্রমাণ করেছেন যে, একজন মানুষ আরবি ভাষাভাষী মুসলমান হোন বা আরবি ভাষা না জানা মুসলমান হোন। আরবি ভাষাভাষী অমুসলমান হোন বা আরবি ভাষা না জানা অমুসলমান হোন, যখন তিনি তেলাওয়াতে নিমগ্ন হন তখন ধ্বনির অনুরণনের চমৎকার মিশ্রণ তাকে ভেতর থেকে নিরাময় করে। উচ্চ রক্তচাপ থাকলে রক্তচাপ কমে যায়। হার্ট রেট স্বাভাবিক হয়ে আসে এবং মাসল রিল্যাক্স করে। এটা হচ্ছে প্রাথমিক প্রাপ্তি।

কোরআনের সূরা জুমার-এ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'যারা জানে এবং যারা জানে না (অর্থাৎ জ্ঞানী ও মূর্খ), তারা কি কখনো সমান হতে পারে'? যখন আপনি জানবেন, আপনি অজ্ঞতার স্তর থেকে জ্ঞানের স্তরে, জানার স্তরে পৌঁছবেন এবং জীবনের সবচেয়ে বড় ফরজ আপনার পালন হবে।

কোরআনের জ্ঞান এখন কত প্রাসঙ্গিক, তা বোঝার জন্যে ২০০৬ সালে প্রকাশিত গবেষক ক্যারেন আর্মস্ট্রং-এর বই *মুহাম্মদ : আ প্রফেট ফর আওয়ার টাইম* দেখতে পারি। ক্যারেন খ্রিষ্টান নান হিসেবে জীবন শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে ধর্ম নিয়ে গবেষণা এবং লেখায় আত্মনিয়োগ করেন। নবীজীর (স) চেয়ে বর্তমান পৃথিবীর জন্যে ভালো কোনো রোল মডেল তিনি অনুসন্ধান করে পান নি। তিনি বলেন, বর্তমান পৃথিবীর জন্যে মুহাম্মদ হচ্ছেন রোল মডেল।

নবীজীর (স) আগমনের পটভূমি 'আইয়ামে জাহেলিয়াত' সম্পর্কে ক্যারেন আর্মস্ট্রং চমৎকার একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'জাহেলিয়াত' কোনো কাল বা যুগের নাম নয়। এটি ভ্রান্ত-দৃষ্টিভঙ্গিগত এক নেতিবাচক মানসিক অবস্থা, যার প্রকাশ ঘটে অসহিষ্ণুতা লালসা ক্রোধ ঘৃণা বিদ্বেষ হিংসা সন্ত্রাস রক্তপাত হানাহানিতে। ক্যারেনের ভাষায়, 'A negative psychosocial condition based on hate and intolerance'।

সারা পৃথিবীর বর্তমান অবস্থার দিকে যদি আমরা তাকাই—পোপ ফ্রান্সিস যাকে শয়তানের বিষ্ঠা হিসেবে অভিহিত করেছেন, সেই পুঁজিবাদী-ভোগবাদী শোষকেরা সবকিছু থেকেই অর্থ কামাতে চায়। তারা লোভ লালসা অসহিষ্ণুতা ঘৃণা বিদ্বেষকে সবসময় উসকে দেয়। হিংসা সন্ত্রাস রক্তপাত হানাহানিতে তারা তাদের নিজেদের আখের গোছানোর চেষ্টা করে। ক্যারেন বলেছেন, সেই সময়ে আরবে জাহেলিয়াতের বিপরীতে নবীজী (স) ইসলামের সহিষ্ণুতা ধৈর্য ক্ষমা সমমর্মিতার প্লাবন সৃষ্টি করে ইতিহাসকে পাল্টে দিয়েছিলেন।

আমরা ক্যারেনের ভাষায় বলতে পারি যে, মুহাম্মদ (স) বর্তমান পৃথিবীর জন্যে রোল মডেল। মানবিকতার পুনর্জাগরণের জন্যে সহিষ্ণুতা ধৈর্য ক্ষমা সমমর্মিতার প্লাবন সৃষ্টি করার ম্যানুয়াল হচ্ছে এই কোরআন।

আজ আমরা যারা কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআনে সমবেত হয়েছি, তারা নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান। নবীজী (স) খুব পরিষ্কারভাবে বলেছেন, ‘রমজান ধৈর্য সহনশীলতা সমমর্মিতার মাস। বরকতের মাস, রহমতের মাস।’ *[সালমান ফারসি (রা); মেশকাত]*

কোরআন বোঝা খুব সহজ! সূরা কামারের ১৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ‘আমি কোরআনকে খুব সহজ করে দিয়েছি, যাতে করে তোমরা এর শিক্ষা মনে রাখতে পারো। হে মানুষ! তুমি কি এর শিক্ষা হৃদয়ে ধারণ করবে না?’ আল্লাহ আর কত সহজভাবে বলবেন! কোরআনের এই শিক্ষাকে হৃদয়ে ধারণ করার জন্যেই আমরা চেষ্টা করব। এই শিক্ষাকে আমরা যখন হৃদয়ে ধারণ করতে পারব, তখন আমাদের মধ্যে ধৈর্য সহনশীলতা সমমর্মিতার প্লাবন সৃষ্টি হবে। মানবিকতার উচ্চস্তরে আমাদের উত্তরণ ঘটবে। ইহকালে সফল এবং পরকালে সম্মানিত-পুরস্কৃত হতে পারব আমরা।

আমরা কোরআনের গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করব এবং আমাদের সমস্ত আর্তি নিবেদন করব রাহমানুর রহিমের কাছে, যাতে তিনি সমস্ত বালা-মুসিবত থেকে, করোনা আতঙ্ক থেকে আমাদের হৃদয়কে সাফ করে দেন। পরিষ্কার করে দেন। আমরা যেন সত্যিকারের বিশ্বাসী হয়ে, আলোকিত মানুষ হয়ে নিজের কল্যাণ এবং মানুষের কল্যাণ করতে পারি।

ঘরে ঘরে সাদাকায়ন (অডিও) : ১ মে ২০২০

নব্য জাহেলিয়াত থেকে উত্তরণের উপায়

প্রিয় সুহৃদ, আমরা কোয়ান্টায়নে কোরআন সম্পন্ন করে আজকের সাদাকায়নে সমবেত হয়েছি। ২২ তম বার্ষিক খতমে কোরআন নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর হয়ে থাকবে। এই প্রথমবারের মতো নিজ নিজ বাসায় সমবেত হয়ে কোয়ান্টাম পরিবারের হাজার হাজার সদস্য খতমে কোরআনে অংশ নিয়েছেন।

অন্যান্য বছর কোয়ান্টামের বিভিন্ন ভেন্যুতে খতমে কোরআনের আয়োজন করা হতো। সেখানে যতজন অংশগ্রহণের সুযোগ পেতেন, করোনা পরিস্থিতির কারণে এবারের অংশগ্রহণ তার ১০ গুণেরও বেশি। পরম করুণাময় আমাদেরকে এবার পারিবারিকভাবে কোরআনে ডুব দেয়ার সুযোগ এনে দিয়েছেন।

কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআনের ব্যাপারে এত যে আগ্রহ সৃষ্টি হবে—বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া এটা হওয়া সম্ভব ছিল না। আপনারা যারা পুরো সাত দিন এবং যারা আংশিক অংশগ্রহণ করেছেন, তাদের সবাইকে অভিনন্দন জানাই। পরম করুণাময় আমাদেরকে ঘরে ঘরে পারিবারিকভাবে সমবেত হয়ে সুখী জীবনের ম্যানুয়াল—কোরআনে ডুবে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। কোরআন থেকে জ্ঞান আহরণ করার, কোরআনকে বোঝার, ভালবাসার সুযোগ দিয়েছেন। সেজন্যে তাঁর কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আসলে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছিল জাহেলিয়াত থেকে মানুষকে মুক্তির পথ প্রদর্শনের জন্যে। জাহেলিয়াত থেকে মানুষকে জ্ঞানের পথে, অমনুষ্যত্ব থেকে মনুষ্যত্বে উত্তরণের জন্যে। জাহেলিয়াত কী—এটা নিয়ে গত সাদাকায়নে আলোচনা করেছি।

তখনকার অবস্থার সাথে এখনকার অবস্থার যদি আমরা তুলনা করি, তাহলে আমরা আমাদের সমাজের চারপাশে কী দেখতে পাই? অসহিষ্ণুতা লালসা ক্রোধ ঘৃণা বিদ্বেষ—যার প্রকাশ ঘটছে অমনুষ্যত্বে। শুধু আমাদের দেশে নয়, সারা পৃথিবীতেই এই অমনুষ্যত্বের প্রকাশ ঘটেছে। সর্বত্রই শোষকেরা অসহিষ্ণুতাকে জাগিয়ে তুলে এর বিস্তৃতি ঘটানোর সুপরিকল্পিত উদ্যোগ নিচ্ছে। গত এক দশকে সমাজে যত অস্থিরতা ও বিদ্বেষের বিস্তার ঘটেছে, তার পেছনে সোশ্যাল মিডিয়া বা আরো সরাসরি বললে ফেসবুকের ভূমিকা আমাদের সবারই জানা।

ভার্চুয়াল জগতের যে আগ্রাসন, এটা বোঝা যায় আরেকটি উপকরণ দেখলে। লকডাউনের সময় মানুষকে ঘরে বসিয়ে তার দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমানোর লক্ষ্যে এই ঘৃণা ও ক্রোধকেই উসকে দেয়ার চেষ্টা হয়েছে। আর তারই প্রকাশ ঘটেছে সাম্প্রতিক একটি ভিডিও গেমে।

এই খেলাটির নাম স্ল্যাপ কিংস। চড় বা থাপ্পড়ের খেলা। ক্রোধের বসে কেউ কেউ চড় দিয়ে বসেন। এই চড় দেয়াটা আসলে কোনো শাস্তি না। চড় দেয়াটা হচ্ছে তাকে অপমান করা, তার প্রতি ঘৃণার প্রকাশ। এটাকেই উসকে দেয়ার জন্যে এই ভিডিও গেমটি তৈরি করা হয়েছে। এতে গেমারকে বিশ্বের সেরা চড়দাতা হওয়ার জন্যে খেলতে হয়। যে যত শক্তি দিয়ে প্রতিপক্ষকে চড় দিতে পারবে, তার জেতার সম্ভাবনা তত বেশি। যে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে রিংয়ের বাইরে পাঠাতে পারবে, সে জয়ী হবে।

আসলে মানুষের মানবিকতার, রুচির কত অধঃপতন ঘটলে থাপ্পড় দেয়াটা খেলায় রূপান্তরিত করা যায়! অর্থাৎ কতভাবে সমাজকে অসহিষ্ণু বানানো যায়, কতভাবে মানুষকে অমানুষ বানানো যায়, সে প্রতিযোগিতাই এখন চলছে এই শয়তানের বিষ্ঠা নিয়ন্ত্রণকারী পুঁজিবাদী শক্তির মধ্যে।

আমরা যদি আমাদের চারপাশকে দেখি, করোনা আতঙ্ককে এমনভাবে ছড়ানো হয়েছে যে, মানুষের সমমর্মিতা, সমব্যথিতা এবং যে শক্তির বলে সভ্যতা এতদূর এগিয়েছে—সামাজিক মমত্ব, পারিবারিক মমত্বকে তছনছ করে দেয়ার চেষ্টা করছে এই স্বার্থপর মহল। তারা করোনাভাইরাসকে পুঁজি করে নিজেদের ধনসম্পত্তিকে আরো বাড়াতে চায়।

করোনাভাইরাসে কেউ আক্রান্ত হলে সে যদি ভাই বা বোন হয়, মা-বাবা হয়, প্রতিবেশী হয়, অর্থাৎ মানুষ হলে তো আপনজনের জন্যে মমতা থাকবে! তার জন্যে দয়া থাকবে! তার সেবার জন্যে যা কিছু করা সম্ভব, মানুষ হলে

তো সে তার সবটুকুই করবে! কিন্তু আমাদের চারপাশের একশ্রেণির মানুষকে আতঙ্ক পেয়ে বসেছে। বিবেকবর্জিত হয়ে আতঙ্কবাদীরা নেমেছে করোনাভাইরাস আক্রান্ত মানুষটিকে ঘৃণা করতে। তার ব্যাপারে অসহিষ্ণু হতে। তাকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করতে।

আমরা যে ঘটনাগুলোর সম্মুখীন হয়েছি করোনা শনাক্ত হওয়ার পর থেকে, এরকম ঘটনা আমাদের দেশে বা পৃথিবীতে এর আগে খুব একটা ঘটে নি। মানুষ মানুষের বিপদে এগিয়ে আসবে—এটাই স্বাভাবিক। এটাই হচ্ছে মনুষ্যত্ব। কিন্তু একজন মানুষের অসুস্থতা তাকে দূরে ঠেলে দেবে, এমন ঘটনা বিরল। আমরা এর আগে এক আলোচনায় উল্লেখ করেছিলাম যে, করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় ছেলেমেয়েরা একজন মাকে জঙ্গলে ফেলে চলে গেছে!

সখীপুরের একটি ঘটনা। এক পরিবারের পাঁচ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলে যথারীতি তাদের বাড়িটা লকডাউন করা হয়। কিন্তু আতঙ্কিত প্রতিবেশীরা বিবেকবর্জিত হয়ে পরিবারটিকে গ্রাম থেকে বের করে দেয়ার অনুরোধ করে ইউএনও-কে। চারপাশ থেকে আসতে থাকে অজস্র ফোনকল। ইউএনও অবশ্য খুব সুন্দর ও মানবিক আচরণ করেছেন। তিনি সেই বাড়ির দরজার সামনে ফল এবং দু-সপ্তাহের খাবারসহ একটি চিরকুট রেখে যান। তাতে লেখা ছিল, 'মমতাই দাওয়াই, মনে সাহস রাখবেন। আপনার পাশে আমরা আছি'। যে-কোনো অমানবিকতার মোকাবেলায় মানবিক আচরণ নিঃসন্দেহে আমাদের অন্তরের সুপ্ত ভালো মানুষটিরই প্রকাশ।

আসলে করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি ভাইরাসের শিকার। তিনি অপরাধী নন। অর্থাৎ আক্রান্ত ব্যক্তি 'জীবাণু' নয়, 'জীবাণু'র শিকার। আতঙ্ক সৃষ্টিকারীদের প্রচারণায় এই সাধারণ বোধ বহু মানুষ হারাতে বসেছে। আতঙ্কিত মানুষগুলো বোঝে না যে, অসুস্থ ব্যক্তিকে ঘৃণা করলেই ভাইরাস পালিয়ে যাবে না। তাকে সারিয়ে তোলার ব্যাপারে সাহায্য না করাটা, তার প্রতি মমত্ব প্রদর্শন না করাটাই বরং আত্মঘাতী। কারণ যত আপনি আতঙ্কে ভুগবেন, তত আপনার দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমতে থাকবে।

পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা বলেছি ক্যারেন আর্মস্ট্রং-এর কথা। তিনি বলেছেন, অসহিষ্ণুতা লালসা ক্রোধ ঘৃণা বিদ্বেষ থেকে জাহেলিয়াতের সৃষ্টি, যার প্রকাশ ঘটে হিংসা রক্তপাত হানাহানিতে। এর বিপরীতে নবীজী (স) ইসলামে সহিষ্ণুতা ধৈর্য ক্ষমা ও সমমর্মিতার প্লাবন সৃষ্টি করে ইতিহাসকে পাল্টে দিয়েছিলেন।

এখন সারা পৃথিবীতে অসহিষ্ণুতা ঘৃণা বিদ্বেষ লালসা তাড়িত হয়ে মানুষ অমানুষের আচরণ করছে। নবীজীর (স) শিক্ষা, রমজানের শিক্ষা হচ্ছে—ধৈর্য সহিষ্ণুতা সহনশীলতা ও সমমর্মিতার প্লাবন সৃষ্টি করা।

আমরা গত আলোচনায় বলেছি—কোরআনের শিক্ষা শুধু জাহেলিয়াতকে দূর করে নি, শ্রমিক-শোষণেরও অবসান ঘটিয়েছিল। যখন সমমর্মিতা আসে, সহনশীলতা আসে, তখন শোষণ থাকে না। আমরা যদি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট দেখি, যখন কোরআন নাজিল হয়, তখন শ্রমজীবী মানুষ ছিল হাজার বছর ধরে সবচেয়ে শোষিত। মানুষ হিসেবে তাদের কোনো মর্যাদা ছিল না। তাদেরকে শোষণের উপকরণ হিসেবেই ব্যবহার করা হতো।

কোরআন কীভাবে তাদের ভাগ্য বদলে দিয়েছিল, তা একজন বাঙালি বিপ্লবী এম এন রায় তার বইয়ে লিখে গেছেন। তিনি এখন থেকে ১০০ বছর আগে সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৯২০ সালে তাসখন্দে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সভাপতিমণ্ডলীর সম্পাদক ছিলেন দীর্ঘসময়।

এম এন রায়ের *দ্য হিস্টরিক্যাল রোল অব ইসলাম* বইটি ৮০ বছর আগে লেখা। সেখানে তিনি ইসলামের অভ্যুদয় নিয়ে খুব তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, দ্য রিভল্ট অব ইসলাম সেভড হিউম্যানিটি। শোষণ জুলুম অবিচার স্বেচ্ছাচার দুর্নীতি থেকে বাঁচার জন্যে সাধারণ মানুষ ইসলামকে ত্রাণকারী হিসেবে অভিনন্দন জানিয়েছিল।

তিনি বলেন, ইসলামের আবির্ভাব ঘটার আগে তৎকালীন পরিবেশে সামাজিক ন্যায় ও সুবিচারের কোনো ধারণাই ছিল না। শোষিত আরো শোষিত হবে—এটাই ছিল তাদের নিয়তি। মানুষ হিসেবে তাদের কোনো মর্যাদা ছিল না। ইসলাম সামাজিক সম্পর্কের এই পুরাতন ধারণাগুলোকে আমূল বদলে দেয়। সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। উৎপাদক তার উৎপাদিত পণ্যের একটি অংশ ভোগ করার ন্যায়সঙ্গত অধিকার পায়, যা পূর্বে কখনো সে পেত না। ইসলাম ইতিহাসের প্রয়োজনে এসেছে। মানব প্রগতির ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ফলে রক্ষা পেয়েছে জাহেলিয়াত যুগের ভূলুণ্ঠিত মানবতা।

নবীজী (স) শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রসঙ্গে বলেছেন, 'শ্রমিকের শরীরের ঘাম শুকানোর আগে তার মজুরি পরিশোধ করো।' *[আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা); ইবনে মাজাহ, মেশকাত]*।

অধীনস্থদের সম্পর্কে নবীজী (স) বলেছেন, 'তুমি যা খাবে তাকে তা-ই খেতে দেবে, তুমি যা পরবে তাকে তা-ই পরতে দেবে।' *[আবু যর গিফারী (রা); তিরমিজী, ইবনে মাজাহ]*

শ্রমিকের হাতকে তিনি কতটা সম্মান করতেন, তা একটি ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি। বনু মুস্তালিক গোত্রের সাথে লড়াইয়ের পর বিজয়ী হয়ে নবীজী (স) তাঁর বাহিনী নিয়ে ফিরে আসছিলেন। পরিবারের নারী-শিশু, বয়স্ক এবং যারা মদিনায় ছিলেন তারা অভিনন্দন জানানোর জন্যে এগিয়ে এসেছেন। দীনহীন একজন শ্রমিক সবার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে।

নবীজী (স) বাহন থেকে নেমে সবার সাথে হাত মেলাতে মেলাতে এগোচ্ছিলেন। তিনি দূর থেকে সেই শ্রমিককে দেখলেন। ভিড় ঠেলে তার দিকে এগিয়ে গেলেন। নবীজীকে (স) দেখে সেই শ্রমিক হাত থেকে তার বেলচা ফেলে দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলো।

তার হাত ধরার পর নবীজীর (স) হাতের ভেতরে শক্ত কিছু ঠেকল। নবীজী (স) জিজ্ঞেস করলেন, হাতে কী হয়েছে? শ্রমিক বলল, ও কিছু না। আমি শ্রমিক। বেলচা দিয়ে কাজ করি। তাই হাতে কড়া পড়েছে। অর্থাৎ বেলচার ঘর্ষণে হাতের ত্বক শক্ত হয়ে গেছে।

নবীজী (স) তখন সেই শ্রমিকের হাত ওপরে তুলে ধরে বললেন, এই হাত জাহান্নামের আগুন কখনো স্পর্শ করবে না। মেহনতি মানুষের শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধার এর চেয়ে বড় প্রকাশ আর কী হতে পারে!

একবার এক বেদুইন মসজিদে নববীতে এসে রসুলুল্লাহকে (স) জিজ্ঞেস করেছিল, ইয়া রসুলুল্লাহ! মসজিদে নববীতে যদি আপনাকে এসে না পাই তো কোথায় আপনাকে খুঁজব? তিনি বলেছিলেন, মদিনায় শ্রমিকরা যেখানে কাজের জন্যে ভিড় করে, সেই শ্রমিকদের মাঝে আমাকে খুঁজবে। সেখানেই তুমি আমাকে পাবে।

এই সমমর্মিতাই তখনকার ইতিহাসকে পাল্টে দিয়েছিল। এই রমজানে একইভাবে আমরা যদি বঞ্চিত অসুস্থ করোনা আক্রান্ত মানুষের প্রতি সহনশীল ও সমমর্মী হই, তাহলেই যে অসহিষ্ণুতা ঘৃণা আতঙ্ক অনেকের মধ্যে দানা বেঁধেছে, তা থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারব।

আতঙ্কটা কোন পর্যায়ের? এর মধ্যে একটি ঘটনা। বাবা মারা গেছেন করোনাতে। তার জন্যে নিরাপদ দাফনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মৃতদেহ থেকে ভাইরাস ছড়ায় না। তারপরও স্প্রে করে সেই মৃতদেহ এবং সমস্ত কিছু

ভাইরাসমুক্ত করা হয়েছে। তাকে গোসল করানো হয়েছে। কাফনের কাপড় পরানো হয়েছে। তারপর তাকে প্রোটেক্টিভ ব্যাগে ভরা হয়েছে। কফিন বক্সে করে তাকে নিয়ে যেতে হবে ঢাকার বাইরে। লাশবাহী গাড়ির সাথে একজনকে যেতে হবে। কিন্তু পরিবারের কাউকে পাওয়া গেল না, এমনকি নিজের সন্তানদেরও না!

আমরা যদি এবারের রমজানে ধৈর্য, সহনশীলতা ও সমমর্মিতার অনুশীলন করি, তাহলে এই জাহিলিয়াত থেকে বেরিয়ে আসতে পারব। কোরআন যে রহমত এবং শেফা, এর পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে আমরা ঢুকতে পারব। কারণ এই পুরো প্রক্রিয়া শুরু হয় বিশ্বাস থেকে। আর এই বিশ্বাস হচ্ছে স্রষ্টায় বিশ্বাস।

ডক্টর হার্বার্ট বেনসন, যিনি পাশ্চাত্যে রিল্যাক্সেশন গুরু, তিনি বলেছেন, যার মধ্যে বিশ্বাস যত প্রবল, তার নিরাময় তত দ্রুত, তত ভালো।

মানুষের ইনস্টিংক্টকে আমরা ফিতরাত অথবা স্বভাবধর্ম বলতে পারি। স্বভাবধর্ম হচ্ছে স্রষ্টায় বিশ্বাস। বিলিভ ইন গড, বিলিভ ইন আল্লাহ।

ইস্টার্ন ভার্জিনিয়া মেডিকেল স্কুলের ডক্টর লেভিন শত শত এপিডেমিওলজিক্যাল স্টাডি (মহামারিবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণা) পর্যালোচনা করে উপসংহার টেনেছেন—স্রষ্টায় বিশ্বাস মৃত্যুহারকে কমায় এবং সুস্থতা বাড়ায়। ডক্টর লেভিনের এই রিপোর্ট ডক্টর হার্বার্ট বেনসন তার *টাইমলেস হিলিং : দ্য পাওয়ার এন্ড বায়োলজি ইন বিলিফ* বইয়ে উদ্ধৃত করেছেন।

বিশ্বাস যে নিরাময় প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে, ১৪শ বছর আগে কোরআন সে কথাই বলেছে—'... কোরআন বিশ্বাসীদের জন্যে নিরাময় ও রহমত। ...' *[সূরা বনি ইসরাইল; আয়াত ৮২]*

যেখানে মেডিকেল গবেষণা বলছে, মহামারির ক্ষেত্রে স্রষ্টায় বিশ্বাস মৃত্যুহারকে কমিয়ে দেয়, সেখানে আমরা বিশ্বাসী হয়ে আতঙ্কিত হবো কেন? একজন বিশ্বাসী সবসময় প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করে। সে কখনো আতঙ্কে ভুগতে পারে না। আতঙ্ক এবং বিশ্বাস দুটো কখনো একত্রে থাকতে পারে না। আমাদের মধ্যে যদি আতঙ্ক থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে, আমরা এখনো বিশ্বাসের প্রক্রিয়ায় নিজেকে লীন করতে পারি নি।

বিশ্বাসের প্রক্রিয়াটা কী? কোরআন থেকে উপকৃত হওয়ার প্রক্রিয়াটা কী? সূরা ফাতেহা হচ্ছে প্রার্থনা। পরম প্রভুর কাছে হেদায়েতের পথ, সাফল্যের সরলপথ প্রদর্শনের প্রার্থনা। সূরা ফাতেহার জবাব-ই শুরু হয়েছে সূরা বাকারা

দিয়ে—*আলিফ-লাম-মীম। যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফিহি হুদাল্লিল মুত্তাক্বিন। আল্লাযীনা ইউমিনুনা বিল গাইবি ওয়া ইউকিমুনাস সালাতা ওয়া মিম্মা রাযাকনাহুম ইউনফিকুন।* অর্থাৎ 'এ সেই কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই কিতাব আল্লাহ-সচেতনদের পথপ্রদর্শক। আল্লাহ-সচেতনরা গায়েবে (মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে বোধগম্য না হওয়া সত্ত্বেও অদৃশ্য বাস্তবতায়) বিশ্বাস করে, নামাজ কায়েম করে, প্রাপ্ত রিজিক থেকে অন্যের জন্যে ব্যয় করে (অর্থাৎ নিয়মিত দান করে)।'

বিশ্বাস আল্লাহ-সচেতন করে, স্রষ্টা-সচেতন করে। আল্লাহ-সচেতন কারা? স্রষ্টা-সচেতন কারা? (এক) যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে। গায়েব অর্থাৎ অস্তিত্বের যে মাত্রা আমাদের সামনে দৃশ্যমান নয়, সেই আখেরাতে বিশ্বাস স্থাপন করে। আখেরাত মানে জবাবদিহিতা। আমার কর্মের জন্যে আমাকে জবাব দিতে হবে, এই বাস্তবতায় বিশ্বাস করা।

দুই নম্বর পয়েন্ট, *ওয়া ইউকিমুনাস সালাতা*। অর্থাৎ নামাজ কায়েম করা এবং তিন নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে, *ওয়া মিম্মা রাযাকনাহুম ইউনফিকুন*। প্রাপ্ত রিজিক থেকে অন্যের জন্যে ব্যয় করা। অর্থাৎ নিয়মিত দান করা।

এই তিনটি বিষয় যখন অন্তরে দৃঢ়ভাবে শিকড় গাড়বে, তখন অন্তরে ভয় বা আতঙ্ক বলে কিছু থাকবে না। সচেতনতা থাকবে, কর্ম থাকবে, আনন্দ থাকবে, তৃপ্তি থাকবে। এবার কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআন থেকে আমাদের মধ্যে যদি এই বিশ্বাস, এই স্রষ্টা-সচেতনতা সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলেই দুনিয়া ও আখেরাত এবং ইহকাল ও পরকাল—দুই কালেই সাফল্যের পথে আমরা এগিয়ে যাব এবং এক কল্যাণময় জীবনের অধিকারী হবো।

ঘরে ঘরে সাদাকায়ন (অডিও) : ৮ মে ২০২০

রমজানে দান ॥
অফুরন্ত কল্যাণ

এবারের রমজান আমাদের জন্যে বিশেষ রমজান। এর আগে কোনো রমজানে আমরা এভাবে পরিবারকে নিয়ে ইবাদত করার সুযোগ পাই নি। এবার পরিবারের সাথে মিলেমিশে আত্মশক্তির উন্নয়নে মেডিটেশন চর্চা এবং নিজেদের স্বাস্থ্যের যত্ন নেয়ার যে সুযোগ পরম করুণাময় আমাদের দিয়েছেন, সেজন্যে আমরা তাঁর কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এখন সকল রোজাদারের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিঃসন্দেহে আগের চেয়ে ভালো।

করোনার যে আতঙ্ক সুপরিকল্পিতভাবে ছড়ানো হয়েছিল, আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি যে, সেই আতঙ্ক আস্তে আস্তে কমতে শুরু করেছে। এখন সচেতনতা বেড়েছে। যেটা হারিয়ে যেতে বসেছিল, সেই সামাজিক মমত্ব ও নৈকট্য সৃষ্টি করার তাগিদ সচেতন মানুষ এখন অনুভব করছেন।

আতঙ্ক কাটিয়ে উঠতে পারলে করোনা সাধারণ জ্বর-সর্দির মতোই একটি বিষয়ে রূপান্তরিত হবে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে জ্বর-সর্দি বাধাগ্রস্ত করতে পারে নি। এসব নিয়েই আমরা বসবাস করি। করোনাও আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে বাধাগ্রস্ত বা বিপন্ন করার শক্তি হারিয়ে ফেলবে, যদি আমরা সমমর্মিতা, সামাজিক মমত্বকে পুনরায় নিজের মধ্যে জাগ্রত করতে পারি।

আতঙ্কগ্রস্তরা করোনাভাইরাস আক্রান্ত মানুষটিকেই 'জীবাণু' মনে করতে শুরু করেছিল। করোনা আক্রান্ত মানুষটি তো জীবাণু নয়, সে জীবাণুর আক্রমণের শিকার। সে আমার ভাই, আমার বোন, আমার সন্তান।

একজন অসুস্থ মানুষকে যে মমতা, যে সেবা দেয়া প্রয়োজন, এই মানুষটিকে যখন আমরা সেই মমতা এবং সেবা দিতে পারব তখন আমিও

যদি আক্রান্ত হই, আমিও সেই মমতা, সেই সেবা পাব।

করোনা সংক্রমিত হওয়া ৮০ ভাগ মানুষের কোনো ওষুধ বা ডাক্তারের পরামর্শেরও প্রয়োজন হয় না। সাধারণ জ্বর-কাশির যে প্রতিরোধ ব্যবস্থা—গরম পানি গার্গল, প্রতিদিন একচামচ মধু, কালোজিরা, রসুন খাওয়া এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার শুদ্ধাচার অনুশীলন করা এজন্যে যথেষ্ট। সেই মমতা, সেই যত্ন যদি সে পায়, তাহলে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর হার অনেক অনেক কম হবে। আসলে করোনা আক্রান্ত রোগী সামাজিকভাবে যে অচ্ছুতের আচরণ পায়, এটাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়।

আমরা আতঙ্কিত হয়ে যে ভুলগুলো করছিলাম, সে ভুল থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছি। এখন আমাদের মধ্যে সামাজিক মমত্ব জাগ্রত হচ্ছে। দুর্যোগ মোকাবেলায় সমমর্মিতা এবং সামাজিক মমত্বই সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তির বলেই মানুষ সকল জরা-ব্যাধিকে জয় করে সভ্যতাকে এতদূর এগিয়ে নিয়ে আসতে পেরেছে। সারা পৃথিবীতে এবং আমাদের দেশেও যারা এই ইতিবাচক পরিমণ্ডল তৈরির জন্যে কাজ করেছেন, সবার প্রতি অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আসলে শুভশক্তি যখন আত্মপ্রকাশ করে, অন্ধকার-নেতিবাচক শক্তি তখন আস্তে আস্তে মিইয়ে যায়, বিলীন হয়ে যায়।

রমজানের শেষ দশক হচ্ছে জাহান্নাম থেকে মুক্তির। এই দশককে পরম করুণাময় করোনা নামক জাহান্নাম থেকে মুক্তির দশকে পরিণত করুন।

রোজা কেন ফরজ করা হয়েছে? রোজা ফরজ করার কারণ আল্লাহ তায়ালা সূরা বাকারার ১৮৩ নম্বর আয়াতে বলেছেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন করা হয়েছিল তোমাদের পূর্বসূরিদের ওপর, যাতে তোমরা আল্লাহ-সচেতন থাকতে পারো।'

আল্লাহ আমাকে শুধু সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেন নি; ভালো থাকার পথও দেখিয়েছেন। সেই পথ অনুসরণ করলেই আমি ভালো থাকব। রমজান হচ্ছে স্রষ্টা-সচেতনতা সৃষ্টির মাস। স্রষ্টা-সচেতনতা বাড়ানোর জন্যে এ মাসে আল্লাহর রসুল ইবাদতের ওপর যে-রকম গুরুত্ব দিয়েছেন, একইভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন দানের ব্যাপারে। এই মাসে রসুলুল্লাহ (স) বেশি বেশি ইবাদত করতেন। রোজার মাসে তাঁর দানশীলতার পরিমাণ অনেকগুণ বেড়ে যেত।

কারো কারো মনে হতে পারে যে, ইবাদত করলেই তো হলো। দান কেন করতে হবে? রোজা রাখা, নফল নামাজ পড়া, তারাবি, জিকির, দোয়া,

তওবা-এস্তেগফার পাঠ-ই তো যথেষ্ট। রসুলুল্লাহ (স) এ মাসে দানের পরিমাণ কেন এত বাড়িয়ে দিতেন, সেটি যারা খেয়াল করেছেন তারা হয়তো রহস্যটা উন্মোচন করতে পেরেছেন।

রহস্যটা কোথায়? আসলে সকল ইবাদত বা ভালো কাজের নেকি হচ্ছে ১০ থেকে ৭০০ পর্যন্ত। আপনি একটি ভালো কাজ করলেন, আপনার জন্যে ১০ নেকি। আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছে করলে ৭০০-র বেশিও দিতে পারেন; কিন্তু সাধারণভাবে এটা ১০ থেকে কাজভেদে ৭০০ পর্যন্ত। অর্থাৎ ইবাদতের সওয়াব শেষ হচ্ছে ৭০০-তে। কিন্তু যদি দানের বিষয়টি দেখি, সাদাকা/ দান বা অন্যের জন্যে ব্যয় এবং সেবার নেকি শুরুই হচ্ছে ৭০০ থেকে।

সূরা বাকারা ২৬১ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, '... সৎদান এমন একটি শস্যবীজ, যাতে উৎপন্ন হয় সাতটি শিষ আর প্রতিটি শিষে থাকে শত শস্যদানা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণ প্রবৃদ্ধি দান করেন। ...' ৭০০-র ওপর তিনি ইচ্ছা করলে বহুগুণ দিতে পারেন। সাত হাজার দিতে পারেন, সাত লাখ দিতে পারেন, সাত কোটি দিতে পারেন। এটা তাঁর ইচ্ছা।

দান করার মধ্য দিয়ে আপনি বঞ্চিত অবহেলিত এতিমকে কোনো দয়া করছেন না। আপনার সম্পদে তার যে অধিকার রয়েছে, তার যে হক রয়েছে, সেই হকটাই আপনি আদায় করছেন।

আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত মুসলিম শরীফে দানের একটি ঘটনা রয়েছে।

এক আবেদ পাহাড় দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ মেঘের গর্জন হলো। তিনি গায়েবি আওয়াজ শুনতে পেলেন যে, কেউ বলছে, অমুকের বাগানে পানি দাও। একটু পরেই বৃষ্টি শুরু হলো এবং পানি পাহাড়ের পাশে একটি নালা দিয়ে গড়াতে লাগল।

আবেদের কৌতূহল হলো—পানি কোন দিকে যায়, দেখি তো! তিনি পানির পথটাকে অনুসরণ করতে লাগলেন। কিছুদূর গিয়ে দেখলেন, একজন কৃষক কোদাল দিয়ে মাটি কেটে বাগানে পানি ঢোকার পথ করে দিচ্ছে।

তিনি সালাম দিয়ে কৃষকের নাম জিজ্ঞেস করলেন। নাম শুনেই চমকে উঠলেন। কারণ এই নামই তিনি শুনেছিলেন পাহাড়ে হেঁটে বেড়ানোর সময়। তখন তার কাছে জানতে চাইলেন যে, তার কোন নেকির বিনিময়ে এভাবে প্রকৃতি তাকে সহযোগিতা করছে?

কৃষক তখন বললেন, নেকির কথা তো আমি বলতে পারব না। তবে আমি এই বাগানের ফসলকে তিন ভাগ করি। একভাগ ব্যয় করি পরিবারের

ভরণপোষণে, একভাগ জমিতে বিনিয়োগ করি, আর একভাগ অভাবীদের মাঝে দান করি। এজন্যেই হয়তো আল্লাহ আমাকে এভাবে সাহায্য করেন।

আসলে দানটা করুণা বা দয়া হওয়া উচিত নয়। কারণ করুণা বা দয়ার মধ্যে একধরনের তাচ্ছিল্য থাকতে পারে। আপনি তাচ্ছিল্যভরে করুণা করে বা বিরক্তি নিয়ে দিচ্ছেন। আজ আপনি কোটিপতি, কাল রাস্তার ভিখিরি হয়ে যেতে পারেন। অতএব দানটাকে সবসময় বঞ্চিতের অধিকার হিসেবে মনে করবেন যে, আমি তার হক আদায় করছি। তাহলে খুব আনন্দিতচিত্তে আপনি দিতে পারবেন। অর্থাৎ যখন দেবেন আন্তরিকভাবে দেবেন। দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়া দেবেন। আলাদা একটা তৃপ্তি পাবেন।

আল্লাহ তায়ালা সূরা হাদিদ-এর সাত নম্বর আয়াতে বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন—'আল্লাহ ও তাঁর রসুলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করো এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যে অর্থবিত্তের অধিকারী করেছেন, তা থেকে অন্যের জন্যে ব্যয় করো। তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করবে ও অন্যের জন্যে ব্যয় করবে, তাদের জন্যে রয়েছে মহাপুরস্কার।'

সূরা বাকারার ২৭১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা প্রকাশ্যে দান করলে তা-ও ভালো। আর যদি গোপনে অভাবীকে দাও, তা আরো ভালো। দানের কারণে তোমাদের অনেক পাপমোচন হবে। ...'

দান সংক্রান্ত ৩টি হাদীসে রসুলুল্লাহ (স) খুব স্পষ্ট করে বলেছেন, 'দান (সৎকর্ম) বিশ্বাসীর হায়াত বৃদ্ধি করে। অপমৃত্যু থেকে সুরক্ষিত রাখে। পানি যেমন আগুন নিভিয়ে দেয়, দানও তেমনি পাপমোচন করে।' *[সালমান ফারসি (রা), আনাস ইবনে মালেক (রা); তিরমিজী]*

তিনি বলেছেন, 'আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে দান করলে সেই সাদাকা বা দান গ্রহীতার হাতে পৌঁছার আগেই আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায়'। *[তাবারানী]*

অর্থাৎ যাকে আপনি কিছু দিতে চাচ্ছেন, তার কাছে পৌঁছার আগেই আল্লাহ সেই অভাবীর তরফ থেকে দান গ্রহণ করে ফেলেন। যে কারণে দান দাতার জন্যে অফুরন্ত কল্যাণের আকর। আখেরাতে দাতা এবং জাহান্নামের মাঝখানে আড়াল হয়ে দাঁড়াবে এই দান। ...

দানকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। ১. একক দান বা সাময়িক দান। সেটার প্রতিদানও আল্লাহ বহুগুণ দিতে পারেন। ২. বহমান বা চলমান দান অর্থাৎ সদকায়ে জারিয়া। এটা হচ্ছে অনন্ত কল্যাণ। সাহাবীদের জীবন থেকেই আমরা দু-ধরনের দানের উদাহরণ দিতে পারি।

সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) দানশীল হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি একবার নিজের একটি জমির খোঁজখবর নিতে গেলেন। জমি দেখে দুপুরের রোদে ক্লান্ত হয়ে পাশেই আরেকজনের খেজুর বাগানে বিশ্রাম নেয়ার জন্যে বসলেন। বাগান পাহারা দিচ্ছিল একজন হাবশি ক্রীতদাস। কিছুক্ষণ পর কাছেই আরেকটি গাছের নিচে সেই হাবশি ক্রীতদাস এসে বসল এবং খাওয়ার জন্যে রুটি বের করল। রুটির টুকরা ছিঁড়ে মুখে দেয়ার আগেই একটা কুকুর হাঁপাতে হাঁপাতে তার সামনে এসে বসল।

ক্রীতদাস কুকুরের দিকে তাকিয়েই বুঝল, কুকুরটা ক্ষুধার্ত। রুটির টুকরাটা সে কুকুরের দিকে ছুঁড়ে দিলো। কুকুর রুটির টুকরা খেয়ে ফেলল। ক্রীতদাস রুটির বাকি অংশটুকুও কুকুরকে দিলো। কুকুর তা-ও খেয়ে ফেলল। সাথে থাকা আরেকটি রুটিও সে কুকুরকে দিলো। কুকুর সেটাও খেয়ে ফেলল। তৃতীয় রুটিটাও দিলো। কুকুর তৃপ্তির সাথে খেয়ে উঠে দাঁড়াল। হাঁটা শুরু করল। ক্রীতদাস কুকুরের দিকে মায়াবী দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল।

সাহাবী আবদুল্লাহ (রা) একটু দূরে গাছের ছায়ায় বসে সবকিছুই দেখছিলেন। তিনি সেখান থেকে উঠে ক্রীতদাসের কাছে গেলেন। ক্রীতদাসের খালি হাতের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, প্রতিদিন তুমি কয়টি রুটি খেতে পাও? ক্রীতদাস বলল, তিনটি। আবদুল্লাহ (রা) আবার প্রশ্ন করলেন, নিজে না খেয়ে সব রুটি তুমি কুকুরকে দিয়ে দিলে কেন? ক্রীতদাস বলল, এই অঞ্চলে কোনো কুকুর নেই। কুকুরটি নিশ্চয়ই অনেক দূর থেকে এসেছে। দেখেই মনে হয়েছে যে, সে খুব ক্ষুধার্ত। কুকুরটিকে ক্ষুধার্ত রেখে আমি খাব, এটা আমার কাছে ভালো লাগে নি। তাই রুটিগুলো খেতে দিয়েছি। আবদুল্লাহ (রা) জিজ্ঞেস করলেন, আজ তুমি কী খাবে? ক্রীতদাসের জবাব, আজ আমি উপোস করব। আজ শুধু পানি খেয়েই থাকব।

ক্রীতদাসের দানশীলতায় সাহাবী আবদুল্লাহ (রা) বিস্মিত হলেন। নিজের সারাদিনের খোরাক কত অবলীলায় ক্ষুধার্ত কুকুরকে দিয়ে দিয়েছে! আবদুল্লাহ অনুভব করলেন, এই ক্রীতদাস তো আমার চেয়েও দানশীল! তিনি খোঁজখবর নিলেন। ক্রীতদাসসহ খেজুরের বাগানটা কিনে নিলেন। তারপর ক্রীতদাসকে আজাদ করে দিলেন এবং বাগানটি তাকে উপহার হিসেবে দিলেন।

ক্রীতদাস তার নিজের সারাদিনের খাবার কুকুরকে খাইয়ে শুধু মুক্ত হলেন না, খেজুর বাগানের মালিকও হয়ে গেলেন। ক্রীতদাসের সর্বোচ্চ সামর্থ্য ছিল তিনটি রুটি দান করা। সে তা-ই দান করেছিল। আল্লাহ পরিমাণ

দেখেন না, দেখেন আন্তরিকতা। তিনি চাইলে যে-কোনো দানের বহুগুণ পুরস্কার দিতে পারেন। তিনি যে-কারো অভাব যে-কোনো ওসিলায় দূর করতে পারেন। দানের কল্যাণ তিনি ৭০০ থেকে শুরু করে সাত কোটি গুণ, ৭০০ কোটি গুণও দিতে পারেন; যদি দানটা বিরক্তি ছাড়া অন্তর থেকে হয়। দানের শর্তই হচ্ছে—দানটা আন্তরিক হতে হবে, সমমর্মিতায় হতে হবে, বিরক্তি ছাড়া হতে হবে। সূরা তাগাবুনের ১৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও (সৃষ্টির সেবায় ব্যয় করো)। তিনি এর বহুগুণ প্রতিদান দেবেন আর তোমাদের ক্ষমা করবেন। ...'

প্রিয় সুহৃদ! সদকায়ে জারিয়ার পাশাপাশি একক দান বা সাময়িক দানও কল্যাণকর। সারাদিনের খাবার তিনটি রুটি মমতার সাথে কুকুরকে খাইয়ে ক্রীতদাস আল্লাহর তরফ থেকে পুরস্কার হিসেবে যে-রকম খেজুর বাগানের মালিক হয়েছিলেন, তেমনি নিজেও দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন।

দান ব্যক্তিগত এবং সঙ্ঘবদ্ধ—দুই ভাবেই করতে পারেন। ব্যক্তিগত দান মরুভূমিতে এক বালতি পানি ফেলার মতো, যা একসময় শুকিয়ে যায়। কোনো চিহ্ন থাকে না। ফ্রি চিকিৎসার জন্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগে হাসপাতাল করতে পারেন, এতিমখানা বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়তে পারেন। কিন্তু যখন মারা যাবেন, তখন এই কাজগুলোর কী অবস্থা হবে! এই এতিমরা কোথায় যাবে! হাসপাতাল কীভাবে চলবে! চান্স হচ্ছে সবকিছুই হারিয়ে যাবে।

ব্যক্তিগত অনেক দান কীভাবে নিষ্ফল হতে পারে তার একটি ছোট্ট উদাহরণ আমরা দিতে পারি। কথাগুলো শুনেছিলাম দেশের একজন শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ প্রয়াত ড. আখলাকুর রহমানের কাছে। তিনি বলছিলেন, কুমিল্লার নবাব ফয়জুন্নেসা শিক্ষার বিস্তারের জন্যে তার জীবদ্দশায় অনেক কাজ করেছেন। এখনকার বারিধারা-বসুন্ধরা-বাড্ডা এলাকায় তার এস্টেটের দুই হাজার একর জমি তিনি ওয়াকফ করে যান শিক্ষার জন্যে। কিন্তু তিনি আসলে কোনো ইনস্টিটিউশন করে যেতে পারেন নাই। মোতাওয়াল্লি নিযুক্ত করেছিলেন একজনকে। সেই জমির কোনো হদিস এখন আর নেই।

দুই হাজার একর জমি! বারিধারা-বসুন্ধরা-বাড্ডা এই এলাকায় এখন একর না, শতাংশ নাকি কোটি টাকা! যদি শতাংশ কোটি টাকাও হয়, দুই হাজার একর জমি মানে বর্তমান টাকায় দুই লক্ষ কোটি টাকা। কিন্তু এখানে এখন কোনো দাতব্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নেই। জমি কী হয়েছে—এটা আল্লাহ

আলিমুল গায়েবই সবচেয়ে ভালো জানেন! এত বিশাল জমি, দুই লক্ষ কোটি টাকা যার মূল্য, শিক্ষার কোনো কাজে লাগে নি!

ব্যক্তিগতভাবে ভালো কাজ করতে পারাটা নিঃসন্দেহে সওয়াবের। কিন্তু এই সওয়াব যতদিন আপনি আছেন ততদিন। আর সঙ্ঘবদ্ধভাবে দানের অর্থে যেসব জনকল্যাণমূলক কাজ হয়, যেমন : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ, হাসপাতাল নির্মাণ, পানি সরবরাহের কাজে বিনিয়োগ করা—যতদিন এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা থাকবে, ততদিন পর্যন্ত আপনি এর সওয়াব পেতে থাকবেন। এমনকি মৃত্যুর পরেও তা থেকে সওয়াব পেতে থাকবেন।

সঙ্ঘবদ্ধ দানের সওয়াব, কল্যাণ ও বরকত অনেক বেশি। আপনি যখন এককভাবে দান করছেন, এর সওয়াব ৭০০ গুণ। সঙ্ঘবদ্ধ দানে এটা হবে আরো ৭০ গুণ, অর্থাৎ ৪৯ হাজার গুণ। সংখ্যাটা হবে ৭০০-র জায়গায় ৪৯ হাজার! আর রমজান মাসে যখন সঙ্ঘবদ্ধ দানের সাথে আপনি সংযুক্ত হবেন, আপনার নেকির পরিমাণ হচ্ছে ৭০০ X ৭০ X ৭০ = ৩৪ লক্ষ ৩০ হাজার। কারণ রমজানে মাসে যে-কোনো কাজের সওয়াব ৭০ গুণ।

আবার সৎসঙ্ঘে সদকায়ে জারিয়ার কাজে হাজার হাজার সদস্যের দানের সাথে যখন আপনার দান যুক্ত হচ্ছে, তখন তা এক বিশাল দানের অংশে পরিণত হচ্ছে। আপনি এক বিশাল দাতাগোষ্ঠীর অংশ হয়ে যাচ্ছেন। যে কাজগুলো ফাউন্ডেশন গত ২৫ বছর ধরে একের পর এক করে যাচ্ছে, সৃষ্টির সেবায় সব কাজই আমাদের এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানের সম্মিলিত ফল। স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্যে করা এই দানই আমরা মাটির ব্যাংকে জমা করি। কারণ প্রতিদিন ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা, ৫০০ টাকা দান জমা দেয়া অনেকের জন্যে কঠিন। আমরা একটু আগেই একটি হাদীস বলছিলাম যে, ‘আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে দান করলে সেই সাদাকা বা দান গ্রহীতার হাতে পৌঁছার আগেই আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায়’।

যখন যে নিয়ত করেই দান মাটির ব্যাংকে জমা করছেন, তা দাতার হাতে পৌঁছার আগে আল্লাহর হাতে চলে যাচ্ছে। দানের পুরস্কার আপনি তখনই পাওয়া শুরু করছেন। আপনি দেখুন, ২০১৯ সালে কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংক থেকে সংগৃহীত দানের পরিমাণ ছিল ৩২ কোটি টাকা। আপনার দান ৫০০ টাকা হতে পারে, পাঁচ হাজার হতে পারে, ৫০ হাজার হতে পারে, লাখ হতে পারে। আপনার দান তখন হয়ে যাচ্ছে ৩২ কোটি টাকার অংশ; বরং মাটির ব্যাংকে এ পর্যন্ত যত দান সংগৃহীত হয়েছে এবং আল্লাহর রহমতে

হাজার বছর ধরে যত দান সংগৃহীত হবে, আপনার দান সেই বিশাল দানের অংশ হয়ে যাবে! এই টাকা দিয়ে যে কাজগুলো হাজার বছর ধরে হবে, আপনার মৃত্যুর পরও সে কাজের সমস্ত সওয়াব আপনার আমলনামায় যুক্ত হতে থাকবে। মহাবিচারের দিনে দাতাদের সাথেই আপনার হাশর হবে।

আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। একটু একটু করে এত বছরের কাজগুলোর সওয়াব প্রত্যেক দাতা পেতে থাকবেন। তারা ফাউন্ডেশনে দানের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাঁচানোর সওয়াবের অধিকারী হতে থাকবেন।

গত ২০ বছরে আমাদের স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম থেকে প্রায় ১২ লক্ষ ব্যাগ রক্ত ও রক্ত উপাদান সরবরাহ করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রাণে বাঁচানোর জন্যে এই রক্ত সহযোগিতা করেছে। এই রক্তদাতারা যে-রকম সওয়াবের অধিকারী হবে, আপনার দানের অর্থ রক্তদান কার্যক্রমে থাকার ফলে লক্ষ মানুষের জীবন বাঁচানোর সওয়াবের অধিকারী আপনিও হচ্ছেন।

আমাদের আরো যত সেবামূলক কাজ আছে, তার মধ্যে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা পেয়েছে তিন লক্ষ ৫৮ হাজার জন। চোখের ছানি অপারেশন করা হয়েছে সাত শত ৫৫ জনের। মাতৃমঙ্গল থেকে সেবা পেয়েছেন ১২ হাজারেরও বেশি মা। সুন্নতে খতনা করা হয়েছে এক লক্ষ ৯৬ হাজার জনের। বিভিন্ন স্থানে ছয় লক্ষ ৫২ হাজারটি গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে। দাফন করা হয়েছে পাঁচ শত ৭৮ জনকে।

করোনা সংক্রমণকালে আমাদের দাফন কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। করোনায় আক্রান্ত হয়ে যারা মারা গেছেন, তাদের কাফন-দাফন নিয়ে যখন আতঙ্ক বিরাজ করছিল তখন আমরা অনুভব করলাম, সমাজের সচেতন মানুষ হিসেবে এই সেবায় আমাদের এগিয়ে আসা উচিত। কারণ মৃতের কাফন-দাফন করা ফরজে কিফায়া। মৃতের প্রতি সম্মান দেখানো আল্লাহর রসুলের সুন্নত। কী রকম সুন্নত, তা একটি ঘটনা থেকে পরিষ্কার হতে পারে।

'এক জায়গায় নবীজী (স) কয়েকজন সাহাবীসহ বসে আলাপ করছিলেন। এমন সময় তাদের সামনে দিয়ে শবযাত্রা যাচ্ছিল। নবীজী (স) উঠে দাঁড়ালেন। সাহাবীরাও উঠে দাঁড়ালেন। একজন সাহাবী বললেন, শবযাত্রা তো একজন ইহুদির। তখন নবীজী (স) বলেন, যখনই শবযাত্রা তোমার পাশ দিয়ে যাবে, তখন উঠে দাঁড়াবে।' *[জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা); বোখারী, নাসাঈ, আবু দাউদ]*

আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি—মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে সুন্নত পালন এবং ফরজে কিফায়া আদায় করার জন্যে আমাদের স্বেচ্ছাকর্মী ও কোয়ান্টিয়াররা এ-কাজে আনন্দিতচিত্তে অংশ নেন। মুক্তিযোদ্ধা, পুলিশ সদস্য, নারীসহ করোনায় আক্রান্ত হয়ে ৭০ জনেরও বেশি মৃতকে এখন পর্যন্ত ধর্মীয় সমস্ত রীতি-রেওয়াজ অনুসরণ করে সম্মানজনকভাবে আমরা শেষ বিদায় দিতে পেরেছি।

সেবা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ইবাদত। আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে (স) পাওয়ার পথ সেবা। যেখানেই সেবার প্রয়োজন হয়েছে, যখন কেউ এগিয়ে আসে নি, আমরা সেই কাজে নীরবে ঝাঁপিয়ে পড়েছি।

রসুলুল্লাহর (স) সবচেয়ে প্রিয় একটি কাজ এতিম-বঞ্চিতের লালন। আমরা সেই কাজে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পেরেছি। লামায় আমাদের কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে আড়াই হাজার বঞ্চিত অবহেলিত ছেলেমেয়ে আছে। তারা সেখানে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠছে। আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি দাতাদের প্রতি। তারা এখন শুধু দাতা নন, তারা দায়িত্ব গ্রহণকারী।

রসুলুল্লাহ (স) এতিমের দায়িত্ব গ্রহণকে কত সওয়াবের বলেছেন! তিনি বলেছেন, 'আমি [নবীজী (স)] এবং একজন এতিমের দায়িত্ব গ্রহণকারী, আমরা একসাথে জান্নাতে প্রবেশ করব। (তর্জনী এবং মধ্যমা একসাথে তুলে দেখিয়ে বললেন, এই দুই আঙুলের মতো) জান্নাতে একসাথে থাকব।' *[সহল ইবনে সাদ (রা); বোখারী, মুসলিম]*

আপনারা অনেকে এতিমের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। কেউ একজনের, কেউ কেউ দুজন, তিন জন, চার জন, আবার কেউ আংশিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। দান করা এবং কাউকে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা—দুটো এক বিষয় নয়। এ-ক্ষেত্রে দানের চেয়েও নবীজী (স) যে বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন, সেটা হচ্ছে—দায়িত্ব গ্রহণ করা। যারা দায়িত্ব গ্রহণ করছেন তাদের অভিনন্দন জানাই। যারা দায়িত্ব গ্রহণ করতে চান তাদেরকেও স্বাগত জানাই।

আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আমি তো ধ্যান করি নাই, আমি কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট না, মাস্টার না, আমি কি ফাউন্ডেশনের এই সেবামূলক কাজে দান করতে পারি? এই সদকায়ে জারিয়াতে আমিও কি অংশ নিতে পারি? অবশ্যই পারেন। সেবার দ্বার সবার জন্যে উন্মুক্ত। আপনি অনায়াসে এতিমের দায়িত্ব নিতে পারেন, আপনি আপনার দান মাটির ব্যাংকে জমা করে

তিন মাস, চার মাস পরে ফাউন্ডেশনে এসে জমা দিতে পারেন। আমরা বিশ্বাস করি—দাতা হিসেবে আল্লাহ আপনাকে কবুল করবেন। কারণ আমরা দানের প্রতিটি টাকা মানুষের কল্যাণে ব্যয় করি।

রমজান মাসে আল্লাহর রসুল (স) বেশি বেশি দান করতেন। কারণ এই সময় দানের সওয়াব অনেক বেশি। আপনারা সমস্ত দান এই সময়ে করতে পারেন। আমরা হিসাব করে দেখেছি, মোটামুটি আট হাজার টাকা দিয়েই [২০২০ সালের হিসাব অনুযায়ী] একজন ছাত্রের প্রত্যেক মাসের লেখাপড়া, কাপড়চোপড় থেকে শুরু করে সবরকম প্রয়োজন মেটানো যায়। এতিমান ফান্ডে যারা মাসে মাসে দিচ্ছেন, তারা সেভাবেই দিন। কারো যদি সামর্থ্য থাকে এসময় পুরো বছরের টাকা একসাথে দেয়ার, দিয়ে দিতে পারেন।

এতিমান ফান্ডে আপনি আপনার যাকাতের টাকাও দিতে পারেন। এখন দান করার সুযোগ আরো বেশি। আপনি বিকাশ করতে পারেন। ঘরে বসে দানের অ্যাপসের মধ্য দিয়ে আপনি অনলাইনে দান করতে পারেন। যেভাবেই আপনি দান করেন, ইলেক্ট্রনিক মানি রিসিট আপনার মোবাইলে পৌঁছে যাবে।

যেহেতু ফাউন্ডেশন কোনো ব্যক্তি নয়, ফাউন্ডেশন একটা ইনস্টিটিউশন, একটা সঙ্ঘ—হাজার হাজার মানুষের শ্রম-মেধা-অর্থ এবং দোয়া এই কাজের সাথে সংযুক্ত, তাই এই কাজের বরকত আলাদা।

রমজান মাসে দান করা অনেক সওয়াবের বা পুণ্যের। যে কোয়ান্টিয়ার (স্বেচ্ছাসেবক) এবং যে আর্ডেন্টিয়াররা (দায়িত্বশীল) কাজ করছেন, মানুষকে দানে উদ্বুদ্ধ করছেন, দান সংগ্রহ করছেন, তাদের আমলনামাতেও সওয়াব যুক্ত হচ্ছে একইভাবে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) মসজিদে নববীতে এতেকাফ করছিলেন। এই সময়ে এক দুর্দশাগ্রস্ত এলো। লোকটির কথা শুনে তার দুর্দশা মোচনের জন্যে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেলেন। সেই ব্যক্তি তাকে প্রশ্ন করল, আপনি তো এতেকাফে ছিলেন, এতেকাফ ছেড়ে বেরোচ্ছেন! ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, 'এই মসজিদে নববীতে যিনি শুয়ে আছেন, তিনি বলেছেন, কোনো দুর্দশাগ্রস্তের দুর্দশা মোচনের জন্যে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাওয়া, মসজিদে বসে ১০ বছর এতেকাফের চেয়েও বেশি সওয়াবের।' *[ইবনে আব্বাস (রা); তাবারানী, মুস্তাদরাক আল হাকেম]*

কয়েকজন প্রশ্ন করেছেন যে, আল্লাহর পথে কতটা ব্যয় করব এবং কীভাবে করব? সূরা বাকারায় ২১৯ নম্বর আয়াতে এর উত্তর আল্লাহ তায়ালা

সুস্পষ্টভাবে দিয়েছেন—‘... তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, আল্লাহর পথে কী ব্যয় করব? বলো, ‘প্রয়োজনের অতিরিক্ত’ সবকিছুই ব্যয় করতে পারো। ...’

যা আপনি দান করলেন, আল্লাহর পথে ব্যয় করলেন, সেটাই আপনার। যা জমিয়ে রেখে পৃথিবী থেকে চলে গেলেন, সেটা কিন্তু আপনার নয়, ওয়ারিশদের। ওয়ারিশরা সেটা ভালো পথে ব্যয় করলে আপনি সেখান থেকে কল্যাণ পাবেন। আর ওয়ারিশরা যদি ভালো পথে ব্যয় না করে, তো সেটা আল্লাহই ভালো বলতে পারেন ...। যা আপনি ব্যয় করলেন অন্যের জন্যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সেটাই আপনার পরকালীন সঞ্চয় হয়ে থাকল।

দান সবসময় আনুপাতিক হারে হওয়া উচিত। একজন মানুষের আয়ের কমপক্ষে ১০ শতাংশ দান হওয়া উচিত। ২০ শতাংশ হলে আরো ভালো। ৩০ শতাংশ হলে আরো ভালো।

আমাদের সেবামূলক কাজগুলো যাতে আমরা সুন্দরভাবে চালিয়ে নিতে পারি এবং যে শিশুদের দায়িত্ব আমরা নিয়েছি, তাদের লালনপালনে যেন কোনোরকম ঘাটতি না হয়, সেজন্যে রমজানের এই ক’দিন যত পারা যায় নিজে দান করার পাশাপাশি পরিচিতদের দানে উদ্বুদ্ধ করুন। ফলে একদিকে যে-রকম অফুরন্ত সওয়াবের অধিকারী হবেন, অপরদিকে বালা-মুসিবত থেকে মুক্তির পথ সুগম হবে। আপনার গুনাহ মাফ হবে। জাহান্নাম এবং আপনার মাঝখানে এই দান একটা পর্দা বা আড়াল হিসেবে থাকবে।

আমরা আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি যে, রমজানে তিনি আমাদেরকে স্রষ্টা-সচেতন, সমমর্মী, ধৈর্যশীল ও সহনশীল হওয়ার এবং মানুষের কল্যাণে কাজ ও আত্মশুদ্ধির সুযোগ দিয়েছেন। মৃতকে সম্মানজনক শেষ বিদায় জানানোর ও হাজারো এতিমের কল্যাণে কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন। এত সুন্দর সুযোগ আল্লাহ তায়ালা খুব কম মানুষকেই দিয়েছেন। সেই কম মানুষদের মধ্যে থাকতে পারার জন্যে আমরা আবারো তার কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। শবে কদরের রাতে—হাজার মাসের চেয়ে উত্তম যে রাত—যথাযথভাবে সারারাত জেগে ইবাদতের মধ্য দিয়ে একটা মোবারক রাত হিসেবে পালন করার তওফিক যেন আল্লাহ আমাদেরকে দান করেন, সেই প্রার্থনাই আমরা করি।

ঘরে ঘরে সাদাকায়ন (অডিও) : ১৫ মে ২০২০

ঋণের অভিশাপ থেকে মুক্ত হোন

প্রিয় সুহৃদ, দেখতে দেখতে রমজান মাস শেষ হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য এবারের রমজান একেবারেই ব্যতিক্রমী রমজান। অনেকের জীবনেই দ্বিতীয় বার এমন রমজান আসবে কিনা এটা আল্লাহ আলিমুল গায়েবই ভালো জানেন।

এবারের রমজানে আমরা অধিকাংশই সুযোগ পেয়েছি ঘরে থাকার, পরিবারের সাথে থাকার, আশেপাশের মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার। অনেক মানুষ করোনাভাইরাসের আতঙ্কে ঘরের মধ্যে কুঁকড়ে ছিল—এই বুঝি করোনা এলো! এই বুঝি করোনা এলো! এই বুঝি আমি গেলাম!

ধ্যান ও ইতিবাচক চিন্তার সাথে যারা জড়িত এবং যারা মানুষের অফুরন্ত শক্তি ও সম্ভাবনায় বিশ্বাস করেন, তারা এই সময়টাকে শারীরিক মানসিক আত্মিক যত্নায়নের কাজে লাগিয়েছেন। আন্তরিক সময় দিয়ে পরিবারে সমমর্মিতাকে আরো বাড়িয়েছেন। ফলে তারা মানসিকভাবে চাঙ্গা থেকেছেন এবং স্বাভাবিকভাবেই তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আগের চেয়ে বেড়েছে।

যারা করোনাকে পুঁজি করে ব্যবসা করতে চায়, আতঙ্ক প্রচারের হয়তো মূল কারিগর তারাই। কারণ মানুষ যত আতঙ্কিত হবে তত তার দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হবে। সে করোনা প্রতিরোধে সাহস হারিয়ে ফেলবে। তখন তার এই অসহায়ত্বকে পুঁজি করে ওষুধ বা প্রতিকারের নামে যে-কোনো জিনিস বিক্রি করা যাবে এবং টাকা কামানো যাবে।

তবে বাস্তবতা হচ্ছে, মিথ্যা প্রচারণা, আতঙ্ক প্রচারণা কিছু সময়ের জন্যে কাজ করে। আস্তে আস্তে যখন সত্য বেরিয়ে আসে, যখন বাস্তবতা দৃশ্যমান

হয় তখন মিথ্যা এবং আতঙ্ক তার শক্তি হারাতে থাকে। আসলে আতঙ্কিত হওয়ারও একটা শেষ আছে। আতঙ্কের পরিমাণ বেশি হয়ে গেলে আতঙ্কিত মানুষও ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে যে, আর কত আতঙ্কিত হবো!

বাংলাদেশের মানুষ দুর্যোগ-দুর্বিপাক, রোগশোকের সাথে লড়াই করেই টিকে আছে, বেঁচে আছে এবং এগুলোর সাথে লড়াই করে ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও সে শুধু বেঁচে থাকবে না, এগিয়ে যাবে। কারণ যে-কোনো বিপর্যয়, যে-কোনো দুর্যোগ থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর আমাদের জাতিগত সামর্থ্য অন্য অনেক জাতির চেয়ে বেশি।

পাশ্চাত্যের জাতিগুলোর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আমাদের তুলনায় অনেক কম এবং করোনায় সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার সেখানে সবচেয়ে বেশি।

বিস্ময়ের সাথে দেখছিলাম, যে দেশে ঋণ যত বেশি, করোনার সংক্রমণ এবং মৃত্যুর হার সেখানে তত বেশি। সারা পৃথিবীতে করোনায় যত মানুষ মারা গেছে, তার ৭০ শতাংশই মারা গেছে ঋণজর্জরিত পাঁচটি দেশে। ব্যক্তিগত এবং দেশজ ঋণজর্জরিত দেশের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। তারপর যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইতালি এবং স্পেন।

করোনায় মৃত্যুতে শীর্ষস্থান অধিকারী যুক্তরাষ্ট্রে মৃতের সংখ্যা ইতোমধ্যেই ৯০ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। তাদের ব্যক্তি ঋণ এবং দেশজ ঋণ দুটোই বেশি। দেশজ ঋণ ২০ ট্রিলিয়ন ডলার। আর প্রতি ক্রেডিট কার্ডের বিপরীতে ঋণ ছয় হাজার একশত ৯৪ ডলার। তারা ক্রেডিট কার্ডকে কাবুলি কার্ড বলে। অনেকে কার্সড কার্ড, অর্থাৎ অভিশপ্ত কার্ডও বলে। সেখানে কোনো কোনো পরিবারের ১১টিরও বেশি ক্রেডিট কার্ড রয়েছে। শুধু শ্রমিকই না, মধ্যবিত্তদেরও উপার্জন করার আগেই টাকা ব্যয় হয়ে যায়। কোনো কারণে যদি তারা দুমাস বেতন না পায়, তাহলে তার পক্ষে ক্রেডিট কার্ডের কিস্তি পরিশোধ করা কষ্টসাধ্য।

স্বাভাবিকভাবে আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, ক্রেডিট কার্ডের কিস্তি পরিশোধের সাথে অথবা ঋণের সাথে করোনার সম্পর্কটা কী? ভালোভাবে যদি খেয়াল করি, তাহলে আমরা দেখি—ভাইরাসজনিত রোগ মোকাবেলায় দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা মূল ভূমিকা পালন করে। সাধারণ ফ্লুর যেমন ওষুধ বের হয় নি; ইবোলা, সার্স—এগুলোরও কোনো কার্যকরী ওষুধ বের হয় নি। একইভাবে করোনারও পরীক্ষিত কোনো ওষুধ বের হয় নি। যখন একজন মানুষ ঋণগ্রস্ত হয়, তার ঋণ পরিশোধের বা কিস্তি পরিশোধের চাপ থাকে, তখন তার স্নায়ুর ওপর স্ট্রেস সৃষ্টি হয়। স্ট্রেস যত বাড়ে, তত তার ইমিউন

সিস্টেম দুর্বল হতে থাকে। তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভঙ্গুর হতে থাকে।

এই কিস্তি, এই সুদী ঋণ যে শুধু মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমায় তা না, জীবনকেও দুর্বিষহ করে তোলে। আসলে পুঁজিবাদী বেনিয়া শোষণের মূল অস্ত্র হচ্ছে এই ঋণ। অতীতে মহাজনরা ঋণ দিয়ে নিম্নবিত্তের সর্বনাশ করত। ঋণ বলতে আসলে এই সুদী ঋণকেই বোঝায়।

বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে বা আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে ধার নেয়া এক জিনিস। আর যখন মহাজনের কাছ থেকে আপনি সুদে ঋণ নিচ্ছেন, কিস্তিতে শোধ করার ফলে ঋণ আর শোধ হয়ে উঠত না। যার ফলে যে ঋণ নিত, সে বাধ্য হতো মহাজনের বাড়িতে, বাগানে, কারখানায় দাস-শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে। অনেক সময় বংশানুক্রমে এরা দাস শ্রেণিতে রূপান্তরিত হতো। তারপরও তাদের সেই ঋণশোধ হতো না।

এই সুদখোরদের প্রকৃতি কী? শেক্সপিয়ারের *মার্চেন্ট অব ভেনিস* নাটকে সুদখোর শাইলকের যে চরিত্র! আসলে সুদখোর, ঋণদাতারা পোশাকে, চেহারা-সুরতে হয়তো পলিশড হয়েছে, কিন্তু যুগে যুগে এরা একই প্রকৃতির। আর তা হচ্ছে খাতকের কাছ থেকে সবকিছু নিংড়ে নেয়া। পুঁজিবাদী শোষণের মূল মাধ্যম হচ্ছে এই ঋণ, যার পোশাকি রূপ হচ্ছে ক্রেডিট কার্ড এবং কনজ্যুমারিজম। হাইপার-ক্যাপিটালিজম বা হাইপার-পুঁজিবাদকে পোপ ফ্রান্সিস ‘শয়তানের বিষ্ঠা’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

প্রতিটি ধর্ম সুদ ও ঋণ থেকে মুক্তির আকুতিকে জোর দিয়েছে। পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারায় আল্লাহ তায়ালা সুদখোরদের ‘শয়তানের স্পর্শে সহজাত বিচারবুদ্ধি লোপ পাওয়া ব্যক্তির মতো’ বলে ঘোষণা করেছেন।

সর্বকালে সর্বযুগে ঋণ দ্বারা মানুষ শোষিত হয়েছে বলেই বাইবেলে ঋণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত খ্রিষ্টান ধর্মীয় পুরুষরা ঋণকে অত্যন্ত জঘন্য একটি পাপাচার হিসেবে বর্ণনা করত।

ঋণ একজন মানুষকে কী দুরবস্থার মধ্যে নিয়ে যায়—৩৬৫ খ্রিষ্টাব্দে সেইন্ট বাসিল ঋণ গ্রহণকারীর অবর্ণনীয় অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন, প্রত্যেক দিন এবং রাত খাতকের জন্যে একটা দুঃসহ যন্ত্রণা। তার জীবন থেকে ঘুম হারিয়ে যায় এবং একটা অনিশ্চয়তায় সে সবসময় ভুগতে থাকে। মানুষের সামনে যখন সে যায়, লাঞ্ছিত হয়। যখন সে ঘরে থাকে, তখন সে চৌকির নিচে লুকিয়ে থাকে। দরজায় প্রত্যেকটা অপ্রত্যাশিত ঠকঠকানিতে সে চমকে ওঠে—এই বুঝি পাওনাদার এলো! রাতে তার ঘুম ভেঙে যায় দুঃস্বপ্নে

যে, পাওনাদার বোধ হয় তার বালিশের পাশেই এসে গেছে।

সেইন্ট অ্যামব্রোস লিখেছেন, যারা ঋণগ্রস্ত পিতা তারা বাধ্য হচ্ছেন তাদের সন্তানদের ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে দিতে। আর ঋণী লজ্জায় আত্মহত্যা করছে। যে কারণে তিনি বলেছেন, সুদী ব্যবসা, ঋণ-ব্যবসা—ডাকাতি এমনকি খুনের সাথে তুলনীয়।

আমরা শবে কদরের আলোচনায় এবং বিশেষ মেডিটেশনে নবীজীর (স) একটি প্রার্থনা পড়ে শুনিয়েছিলাম। তিনি প্রায়শই প্রার্থনা করতেন, 'আউযুবিল্লাহি মিনাল কুফরি ওয়াদ্দাইন।' অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাই ঋণ ও কুফরি থেকে।' *[আবু সাঈদ খুদরী (রা); নাসাঈ]*

রসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ঋণী হয়, সে যখন কথা বলে—মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে, তা ভঙ্গ করে।' *[আয়েশা (রা); বোখারী]*

ঋণ এখন পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং শোষকদের শোষণের সবচেয়ে বড় ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর কনজ্যুমারিজমের নতুন বিকাশ ঘটতে লাগল। পণ্যের উৎপাদন বেড়ে গেল। সাধারণভাবেই ক্রেতা যখন নগদে কেনে তখন সে বাছবিচার করে কেনে। কোনটা কিনবে, কোনটা কিনবে না, তা সে চিন্তা করে। অপ্রয়োজনীয় বিলাসদ্রব্যের পেছনে টাকা খরচ করবে কি করবে না, এটা সে ভাবে! বেনিয়ারা দেখল, তাকে যদি বাকিতে কিনতে উদ্বুদ্ধ করা যায়; যে, এখন তো আমাকে টাকা দিতে হচ্ছে না। আচ্ছা, পরে দিয়ে দেবো! এই চিন্তা যদি তার মধ্যে ঢোকানো যায়, তাহলে সে তার সামর্থ্যের বাইরেও কিনবে।

এই ভাবনা থেকেই পঞ্চাশের দশকে আমেরিকাতে প্রথম ক্রেডিট কার্ড চালু হয়। যারা ক্রেডিট কার্ডের উদ্যোক্তা কোম্পানি ছিল, ২০ থেকে ২৫ বছর তারা অনেক লস করে। আস্তে আস্তে সাধারণ মানুষের বাকিতে জিনিস কেনার প্রবণতা প্রবল হতে থাকে। সত্তরের দশকের পরের ৫০ বছর, অর্থাৎ এই শতাব্দীতে এসে আমেরিকানরা আকণ্ঠ নিমজ্জিত এই দেনায়।

সিএনবিসি-র ৪ মে ২০২০ সালের রিপোর্ট অনুসারে, ৪০ শতাংশ আমেরিকানের বাকিতে কিনতে কিনতে এমন অবস্থা হয়েছে যে, মিনিমাম এমাউন্ট পেয়েবল-এর চেয়ে বেশি তারা শোধ করতে পারে না। প্রতি ক্রেডিট কার্ডের পেছনে আমেরিকানদের যে প্রায় গড় ৬,২০০ ডলার ঋণ, তা কয়েক বছর আগেও চার হাজার ডলার ছিল। এত ঋণ হওয়ার কারণ হচ্ছে গাড়ির

লোন, বাড়ির মর্টগেজ ও স্টুডেন্ট'স লোন। যা উপার্জন করে তা দিয়ে কিস্তি দিতে দিতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নগদে কেনার পয়সা আর থাকে না। সেটাও তাদের কিনতে হয় বাকিতে।

যে ব্যক্তির জীবনে ঋণ ঢুকেছে, যে পরিবারে ঋণ ঢুকেছে, যে দেশে ঋণ ঢুকেছে, ঋণ সেখানে ভেতর থেকে ঘুণের মতো খেয়ে ফেলে। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার অর্থনৈতিক উপদেষ্টা বলেছিলেন, ঋণ হচ্ছে আমেরিকান সমাজের ক্যান্সার। ক্যান্সার যেভাবে দেহকে ধ্বংস করে, আমেরিকার ধ্বংসের পেছনেও সবচেয়ে বড় কারণ হয়ে থাকবে এই ঋণ।

ঋণগ্রস্ত মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্তে রূপান্তরিত হয়। নিম্নবিত্ত আরো গরিব হয়ে যায়। এদিকে ধনীর সম্পদ বাড়তেই থাকে। ২০১০ সালে বিশ্বের অর্ধেক মানুষের সমপরিমাণ সম্পত্তির মালিক ছিল ৩৮৮ জন ধনকুবের। এটা কমতে কমতে ২০১৮ সালে এসে দাঁড়াল ২৬ জনে। অর্থাৎ ২৬ জন ধনীর সম্পদের পরিমাণ হচ্ছে ৩৮০ কোটি মানুষের সম্পদের সমান। এই ২৬ ধনীর সম্পদের পরিমাণ ২০১৮ সালে ছিল এক লাখ ৪০ হাজার কোটি ডলার।

জেফ বেজোসের সম্পদের মাত্র এক শতাংশ ইথিওপিয়ার ১০ কোটি ৫০ লক্ষ জনসংখ্যার দেশের পুরো স্বাস্থ্য বাজেটের সমান। ভারতের শীর্ষ ধনী মুকেশ আম্বানি। স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ খাতে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এবং সকল রাজ্য সরকার মিলে যা ব্যয় করে তার চেয়ে বেশি টাকার মালিক এই মুকেশ আম্বানি।

এখন থেকে ১০০ বছর আগে সাধারণ মানুষ ছিল মহাজনী ঋণে আবদ্ধ। শেরে বাংলা ফজলুল হক ঋণ সালিশি বোর্ড করে এই মহাজনী ঋণ মাফ করে দেন। আমরা ঋণবিমুখ জাতিতে পরিণত হই। আমাদের দেশে ৩০/৪০ বছর আগে দোকানে স্টিকার লাগানো থাকত, 'বাকি চাহিয়া লজ্জা দিবেন না'। দুই ব্যবসায়ীর একটা ছবিও টাঙানো থাকত। একজন হ্যাংলাপাতলা দুর্বল। বাকিতে বিক্রি করে তার সিন্দুক খালি। আরেক ব্যবসায়ী বেশ নাদুসনুদুস ভুঁড়িওয়ালা। তার সিন্দুক ভর্তি টাকা। কারণ তিনি বাকি বিক্রি করেন না।

যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপ বিভিন্ন দেশের অর্থনীতি নিয়ে গবেষণা করে। ২০১৫ সালে তারা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, ১০ বছর পর ২০২৫ সালে ঢাকার মধ্যবিত্ত ও বিত্তবান জনগোষ্ঠীর আকার হবে বর্তমানের দ্বিগুণ। রাজশাহী ও বরিশালে তিন গুণ। খুলনায় হবে ছয় গুণ। তাদের পর্যবেক্ষণ

হচ্ছে, ভারত, চীন, ইন্দোনেশিয়ার তুলনায় বাংলাদেশে আশাবাদী মানুষের সংখ্যা বেশি। নিজের আর্থিক সমৃদ্ধির ব্যাপারে আশাবাদী হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ বাংলাদেশি অঢেল খরচের ব্যাপারে অনাগ্রহী। ফলে মধ্যবিত্ত ও বিত্তবান কনজ্যুমারদের মধ্যে মাত্র ছয় শতাংশ ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে। তাদের পরামর্শ ছিল, বাংলাদেশে ক্রেডিট কার্ডকে জনপ্রিয় করতে হবে।

আমেরিকানরা যখন দেখল, বাঙালির গলায় দাসত্বের শৃঙ্খল পরানো যাবে না, তখন আমাদের এই ক্রেডিট কার্ড ধরিয়ে দিলো। আমাদের দেশে একটি ব্যাংকের লক্ষ্যই শুধু ক্রেডিট কার্ড। ক্রেডিট কার্ডকে আমরা সবসময় বলে এসেছি কাবুলি কার্ড। তারা উঠে-পড়ে লেগেছে যে, কীভাবে আমাদেরকে ঋণী বানানো যায়। ঋণ করে ঘি খাওয়ার দলে নেয়া যায়। ফলে এখন অবস্থা হয়েছে, নগদে কিনতে সুপারশপে ঢোকা যেন একটা লজ্জার ব্যাপার; যে, এ নগদে কিনছে! সুপারশপ তো বটেই, এখন বড়-মাঝারি মুদি দোকানেও ক্রেডিট কার্ড পাঞ্চ করার ব্যবস্থা আছে। ক্রেতা-বিক্রেতা বাকিতে কিনতে আর লজ্জা বোধ করে না। বিক্রি করতেও লজ্জা বোধ করে না।

আমাদের সমাজের একটি শ্রেণির মানসিকতায় পরিবর্তন এসেছে। তারা বাকিতে কিনতে পারাকে স্ট্যাটাস সিম্বল মনে করছে। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, বাকিতে কেনাটা স্ট্যাটাস সিম্বল না, আপনার অক্ষমতারই প্রকাশ। আপনি যে নগদে কিনতে সক্ষম নন, এটাই প্রকাশ পায় বাকিতে কেনার ফলে।

হোম লোন, অটো লোন, মাইক্রো ক্রেডিট, ক্রেডিট কার্ড, সুদ এবং কিস্তি যে জিনিসগুলোর সাথে জড়িত, সেগুলো যদি আপনার ঘরে ঢোকে, তাহলে আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে, যেভাবে আমেরিকানদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়েছে। যেভাবে তারা ভাইরাসে এবং স্ট্রেসে আক্রান্ত হয়েছে, আপনার ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটতে পারে।

ভালো ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকেন; ফ্ল্যাটটা কিস্তিতে কেনা। কিস্তি শোধ হয় নি। লেটেস্ট মডেলের গাড়িতে চড়েন, গাড়িটা কিস্তিতে কেনা। কিস্তি শোধ হয় নি। কিন্তু যখন আয়ের মাঝে একটা ধাক্কা লাগে, আয় যখন কোনো কারণে কমে যায়, যখন কিস্তি শোধ করতে পারেন না, তখন তিনি বুঝতে পারেন কত ধানে কত চাল!

আপনি যদি আয় না করে ব্যয় করেন, যে-কোনো সময় অল্প ধাক্কাতেই পড়ে যাবেন। আর যদি আয় করে কিনতে চান, তাহলে সেটার জন্যে পরিশ্রম

করুন। আল্লাহর রহমতে আপনি আয় করেই তা কিনতে পারবেন—আজ, কাল বা পরশু। একটু ধৈর্য ধরতে হবে, কিন্তু আয় করেই আপনি তা কিনতে পারবেন। ঋণ করে ঘি খেয়ে আপনাকে সর্বস্বান্ত হতে হবে না।

রমজানের এই বিদায়ী মুহূর্তে আমাদের প্রত্যয় হোক, আমি আয় করব। আমি স্রষ্টার দেয়া এই মস্তিষ্কটাকে কাজে লাগাব। মেধাকে কাজে লাগাব। স্রষ্টার দেয়া শক্তি দিয়ে মেহনত করব। প্রার্থনা করব যে, আমি আমার সচ্ছলতা, ক্রয়ক্ষমতা, আমার দান ও সেবার হাতকে প্রশস্ত করতে চাই। অতএব প্রভু! তুমি আমাকে ঋণ থেকে মুক্ত রাখো। আমার উপার্জনের শত পথ উন্মুক্ত করে দাও।

পরিবারের সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বী সদস্যরা ঋণ থেকে বেঁচে থাকার জন্যে অথর্ববেদের প্রার্থনাটি করতে পারেন। অথর্ববেদ ষষ্ঠ অধ্যায় : শ্লোক **১১৭-১১৯**। যার মর্মার্থ হচ্ছে, 'ইহলোকে উত্তমর্ণের কাছে সকল ঋণশোধ করার শক্তি দাও। তোমার প্রাসাদে আমায় সকল ঋণ থেকে মুক্ত করো। ঋণনিমিত্ত নরকপাত থেকে আমায় মুক্ত করো। লৌকিক ও বৈদিক সকল ঋণ থেকে মুক্ত করো। দেহত্যাগের পর স্বর্গলোকে আমাকে মুক্ত করো।'

অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটার ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন। দেখবেন যে, আপনার ঋণ করতে হচ্ছে না। কারণ আমাদের ৭০-৮০ ভাগ কেনাকাটাই অপ্রয়োজনীয়। শুধু ফুটানি করার জন্যে, একটু হাততালি বা বাহবা পাওয়ার জন্যে অথবা লোক দেখানোর জন্যে আমরা ব্যয় করি। আপনার একটা মোবাইল প্রয়োজন। কিন্তু অমুক দামি ব্র্যান্ডের মোবাইল কিনতে হবে শুধু এটুকু বোঝানোর জন্যে যে, তোমারটার চেয়ে আমারটার দাম অনেক বেশি! আপনার কাজ চলা দরকার, কথা বলা দরকার, কথা শোনা দরকার। অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় খরচ যত কম করবেন তত ঋণ থেকে বেঁচে যাবেন।

যে-কোনো কেনাকাটার আগে নিজেকে তিনটি প্রশ্ন করবেন। প্রথম প্রশ্ন : এটা কি আমার প্রয়োজন? দ্বিতীয় প্রশ্ন : এটা কি এখনই কেনা প্রয়োজন? তৃতীয় প্রশ্ন : এটা ছাড়া কি আমার চলবেই না? আপনি দেখবেন, আপনার ৭০ শতাংশ কেনাকাটার প্রয়োজন হচ্ছে না। কেনাকাটার অপচয়-অপব্যয় থেকে আপনি নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন।

আজকের আলোচনার উপসংহারে আমরা বলতে পারি, উপার্জন না করে সুদী ঋণ দিয়ে যখনই আপনি কোনোকিছু কিনতে যাবেন, আপনার শান্তি

থাকবে না। সবসময় মনে রাখবেন, যেখানে কিস্তি আছে, সেখানে সুদ আছে। সুদের হার বলা হয় ২৫-২৭%। কিন্তু আপনি যদি নিখুঁতভাবে হিসাব করেন, এরা যে ঋণ দেয়, সেটা ক্ষুদ্র ঋণ বলেন আর বৃহৎ ঋণ বলেন, অধিকাংশ সময়ই এটা ২৭ শতাংশ না, ১২৫ শতাংশের ওপরে। কখনো ১৪১ শতাংশ। কখনো তার চেয়ে বেশি। অতএব আপনার ব্যক্তিজীবনে, পরিবারে যেন ঋণ এবং কিস্তি না ঢোকে। যে জীবনে ঋণ এবং কিস্তি ঢুকেছে, সেই জীবন নষ্ট হয়ে গেছে। ঘুণ যেভাবে একটা কাঠকে নষ্ট করে ফেলে। কাঠের ওপরে অনেক দিন পর্যন্ত শুধু খোলস থাকে। একসময় সেই খোলসটাও ধসে যায়।

আজকে রমজানের শেষ সাদাকায়নে আমাদের সবার প্রার্থনা হোক—'প্রভু! আমরা প্রত্যেকে এই রোজাতে আত্মশুদ্ধির মধ্য দিয়ে, নিজেকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করার মধ্য দিয়ে, সংযমের মধ্য দিয়ে যে শারীরিক মানসিক আত্মিক শক্তি লাভ করেছি, যে শক্তি তুমি দিয়েছ—এই শক্তিকে নিজের কল্যাণে এবং মানুষের কল্যাণে কাজে লাগানোর তওফিক দাও। ঋণের অভিশাপ থেকে আমাদের জীবনকে মুক্ত রাখো। শান্তি এবং প্রাচুর্যে, সচ্ছলতায় আনন্দে, কৃতজ্ঞতায় আমাদের জীবনকে ভরিয়ে দাও।'

সবার জন্যে ঈদের আগাম শুভেচ্ছা থাকছে। ঈদের পর থেকে আমরা যেন সুন্দরভাবে একটা সুস্থ কর্মচঞ্চল জীবনে প্রবেশ করতে পারি, এটাই হোক আমাদের সবার সম্মিলিত প্রার্থনা।

ঘরে ঘরে সাদাকায়ন (অডিও) : ২২ মে ২০২০

মৃত্যু ॥ জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি

সবার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। ঈদের পর আজই প্রথমবারের মতো আপনাদের সাথে কথা বলার সুযোগ পাওয়ায় পরম করুণাময়ের কাছে গভীর গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ...

বাংলাদেশে প্রতিদিন গড়ে আড়াই হাজার মানুষ মারা যায়। এই মৃত্যুর মধ্যে ৬৫ থেকে ৭০ শতাংশ মৃত্যু হয় অসংক্রমিত রোগের কারণে। এরপরই সড়ক দুর্ঘটনা, মাতৃত্বজনিত ও শিশুমৃত্যুর হার বেশি। আর ২৪ শতাংশ মৃত্যু হয় বার্ধক্যজনিত নানা ধরনের সমস্যার কারণে। দৈনিক গড় মৃত্যুর হার আড়াই হাজারের জায়গায় বর্তমানে ৩-৪ হাজার।

এর মধ্যে জুন মাসে একদিন শিরোনাম করা হলো—করোনায় তরুণদের আক্রান্তের হার সবচেয়ে বেশি! তারপরে বলা হলো, ২১ থেকে ৩০ বছর বয়সী তরুণরা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে। আতঙ্কের পারদ আরেক ধাপ বেড়ে গেল। কারণ এতদিন আমরা জেনে এসেছি, বার্ধক্যজনিত অসুস্থতাসহ নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া ষাটোর্ধ্ব প্রবীণ জনগোষ্ঠী ঝুঁকির মুখে রয়েছেন এবং সেই সংবাদ বিশ্লেষণ করলেই আমরা আসল চিত্রটা বুঝতে পারি।

করোনায় তরুণ ও যুবকদের আক্রান্তের হার ২৮ শতাংশ, যাদের বয়স ৩০-এর নিচে। দ্বিতীয় স্থান হচ্ছে ৩০ থেকে ৪০ বছর বয়সীদের, আক্রান্তের হার ২৭ শতাংশ। কতটা বেশি এই দুই গ্রুপের মধ্যে? মাত্র ১ শতাংশ! ৪১ থেকে ৫০ বছর বয়সীদের আক্রান্তের হার ১৭ শতাংশ, ৫১ থেকে ৬০ বছর বয়সীদের ১১ শতাংশ, ৬০ বছরের বেশি বয়সীদের ৭ শতাংশ। তাহলে যদি আমরা ৪১ বছর বয়স থেকে ধরি, তাহলে কত শতাংশ হয়? ৩৫ শতাংশ।

আক্রান্ত হওয়া, সংক্রমিত হওয়া এবং মৃত্যু, এই তিনটি বিষয় তো এক নয়। সংক্রমণ হতেই পারে। সংক্রমণ নিয়ে সতর্কতার প্রয়োজন আছে। সংক্রমণ নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই।

আমাদের দেশে মৃত্যুর যে হার, সেখানে দেখি—পঞ্চাশোর্ধ্বদের মধ্যে মৃত্যুর হার ৬৯ শতাংশ। অর্থাৎ যারা মারা যাচ্ছেন, তার মধ্যে ৬৯ শতাংশের বয়সই ৫০-এর ওপরে। ৩১ শতাংশের বয়স ৫০-এর নিচে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যাদের দেহে সংক্রমণের কোনো লক্ষণ নেই, তাদের দ্বারা সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা খুবই কম। কারণ যার ভেতরে ভাইরাস ঢুকেছে, তার মধ্যে লক্ষণই প্রকাশ করতে পারল না, সেই ভাইরাস অন্যের মধ্যে কতটা লক্ষণ প্রকাশ করতে পারবে—যে-কারো মনেই প্রশ্নের উদয় হতে পারে!

আসলে আতঙ্কের ব্যাপারীরা সবসময় আতঙ্ক প্রচারের জন্যে নানারকম অজুহাত সৃষ্টি করে। মানুষকে যত আতঙ্কের মধ্যে রাখা যাবে, যত তাকে কর্মহীন রাখা যাবে, বেনিয়াদের লাভের অঙ্ক তত বাড়তে থাকবে। গরিব আরো গরিব হতে থাকবে। এজন্যে কতভাবে মানুষকে আতঙ্কিত করা যায় সেই চিন্তাই তারা করে। প্রথম বলা হয়েছিল যে, সংক্রমণের তৃতীয় মাসে পরিস্থিতি চরম আকারে পৌঁছবে। এখন বলা হচ্ছে, চতুর্থ মাসেও সংক্রমণ ঊর্ধ্বমুখী থাকবে! পরিস্থিতির আরো অবনতি হওয়ার শঙ্কা আছে।

সংক্রামক রোগে সংক্রমণ বাড়বে এটাই স্বাভাবিক। যত দ্রুত সংক্রমণ বাড়ে তত আমাদের জন্যে মঙ্গল। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, সংক্রামক রোগের একমাত্র দাওয়াই হচ্ছে হার্ড ইমিউনিটি (Herd Immunity)। সংক্রমণ ৮০ শতাংশ হয়ে গেলে হার্ড ইমিউনিটি সৃষ্টি হবে। আমাদের জাতির জীবনে এই করোনা তাহলে আর দ্বিতীয় বার আসবে না, যদি ৮০ শতাংশ মানুষ সংক্রমিত হয়।

আমরা বলেছিলাম, আমাদের আবহাওয়া করোনার জন্যে উপযোগী নয়। আমাদের এখানে করোনা ইনশাআল্লাহ তার তীব্র মরণযন্ত্রণা নিয়ে আঘাত হানতে পারবে না। করুণাময়ের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি যে, আমরা যা ধারণা করেছিলাম বাস্তবতা এখন সেই দিকেই যাচ্ছে।

আমাদের দেশের কৃতী সন্তান বিজ্ঞানী ড. বিজন কুমার শীল করোনাভাইরাস শনাক্তকরণ কিট উদ্ভাবক দলের প্রধান। তিনি এর মধ্যেই এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, বাংলাদেশে জুন মাসে করোনা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে

হার্ড ইমিউনিটি গড়ে উঠবে। দেশে করোনার তীব্রতা তুলনামূলকভাবে কমে গেছে। তিনি খুব স্পষ্টভাবে বলেছেন, ৩০ থেকে ৪০ ভাগ মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়ে গেছেন। তারা হয়তো জানেনও না! হয়তো সামান্য জ্বর হয়েছে, কাশি হয়েছে, দুর্বলতা অনুভব করেছেন। তবে তারা সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

করোনা ইউরোপ-আমেরিকাকে যেভাবে নাস্তানাবুদ করেছে, বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি কোনো হিসাবেই করোনাভাইরাসের প্রভাব সেই আকারে দেখা যাচ্ছে না। এর কারণ হিসেবে ড. বিজন কুমার শীল বলেন, ইউরোপসহ উন্নত বিশ্বের তুলনায় বাংলাদেশের মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি।

ড. বিজন তার গবেষণালব্ধ জ্ঞান থেকে যে কথাগুলো বলছেন, তিন মাস আগে আমরাও আল্লাহর রহমতের ওপর ভরসা করে এই কথাগুলো বলেছিলাম। প্রথমদিনই আমরা বলেছি—করোনা নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই, প্রয়োজন হচ্ছে সতর্কতা। আর মৃত্যুকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। মৃত্যু যখন আসার তখন আসবে। কোনো অর্থ-সম্পদ, কোনো দেয়াল, কোনো হাসপাতাল, চিকিৎসাব্যবস্থা মৃত্যুর হাত থেকে মানুষকে বাঁচাতে পারে নি।

আপনারা জানেন সম্রাট আলেকজান্ডারের কাহিনী। আলেকজান্ডার মৃত্যুর আগে উইল করলেন তিনটি বিষয়ে। এক. তার কফিন যে পথ দিয়ে যাবে, সে পথের দুই ধারে সোনা-রুপা-মুদ্রা ছড়াতে ছড়াতে যেতে হবে। দুই. কফিনে তাকে যখন শোয়ানো হবে, দু-হাত দুই পাশে ছড়ানো থাকবে। হাতের তালু ওপর দিকে থাকবে। তিন. চিকিৎসকেরা তার কফিন বহন করবে।

সম্রাট আলেকজান্ডার তখনকার জ্ঞাত বিশ্বের সম্রাট। সেই মিসর, গ্রিস থেকে শুরু করে সিন্ধু পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ড তার পদানত। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো—মহামান্য সম্রাট! সোনা-রুপা ছিটানো হবে, এটা তো খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু আপনার দুই হাতের তালু ফাঁকা করে উন্মুক্ত রাখা হবে কেন? তিনি বলেছিলেন, দেখ, আজ যখন আলেকজান্ডার পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে, সে খালি হাতে যাচ্ছে। কোনো ধনসম্পদ সে নিয়ে যেতে পারছে না।

তখন সভাসদরা আরজ করল, মহামান্য সম্রাট! এটা বুঝলাম। কিন্তু চিকিৎসকেরা কেন আপনার কফিন বহন করবে? সম্রাট বললেন, মানুষকে শুধু এটা জানানোর জন্যে যে, চিকিৎসকদের কাছে রোগের ওষুধ আছে, কিন্তু মৃত্যুর কোনো ওষুধ নেই।

সম্রাট আলেকজান্ডারের কফিন তার চিকিৎসকরাই বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন সমাধি পর্যন্ত।

এর মধ্যে একটা রিপোর্ট পড়েছিলাম, জানি না এটা কত দূর সত্য। বাংলাদেশের একটা শিল্প গ্রুপ, তারা দেশের শীর্ষ ধনীদের মধ্যে অন্যতম। আটটা ব্যাংক তারা দখল করে ফেলেছে। তিনটা ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান, দুটি বীমা কোম্পানিসহ মোট ৩৪টি কোম্পানির মালিক তারা। শুধু বাংলাদেশে না, সিঙ্গাপুর এবং কানাডার ধনীদের তালিকায়ও স্থান পেয়েছে এই গ্রুপটি। গ্রুপে পাঁচ ভাইসহ মোট ছয় জন করোনা আক্রান্ত। এর মধ্যে দুই ভাইয়ের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন, কিন্তু তাদের জন্যে হাসপাতালে দেয়া হয়েছে একটাই আইসিইউ বেড। একবারে একজনকেই সেবা দিতে পারবে এই ইউনিটের যন্ত্র, অথচ দুজনই মরণাপন্ন। অন্তিম মুহূর্তে ছোট ভাইয়ের মুখ থেকে খুলে নিয়ে বড় ভাইকে দেয়া হলো ভেন্টিলেশন সাপোর্ট। কিন্তু ততক্ষণে ফুসফুসের কার্যক্ষমতা পুরোপুরি হারিয়ে মারা গেলেন বড় ভাই। তড়িঘড়ি করে যন্ত্রটি আবার দেয়া হলো ছোট ভাইয়ের মুখে। মৃত্যুর সঙ্গে এখনো লড়ছেন তিনি।

তাদের মতো দুয়েকজন উদ্যোক্তা দেশের পুরো স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে পাল্টে দিতে পারতেন। কিন্তু তারা কি জানতেন যে, এমন দিন আসবে যখন কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢাললেও সিঙ্গাপুর-থাইল্যান্ডের দরজা খুলবে না! মহামারির বিশ্বায়ন হবে আর জাতি-রাষ্ট্রগুলো নিজ নিজ বাউন্ডারির মধ্যে খিল এঁটে বসে থাকবে! কোনো কারেন্সি দিয়েই এই দরজা আর খোলা যাবে না!

বাংলাদেশে করোনা-উত্তর যে উদ্যোক্তারা বেঁচে থাকবেন, তাদের কি মনে থাকবে এই ঘটনা? এই যে আটটি ব্যাংক আর ৩৪টি কোম্পানির মালিকের এত টাকা, এত সম্পদ—জীবিত থাকতেই তার কী কাজে এলো! সুতরাং যেখানেই আপনি থাকুন না কেন—১৮ তলা, ২৪ তলা, বাংকারের মধ্যে, কোনো লাভ নাই। করোনা ওখানে গিয়ে আপনাকে ধরবে যদি করোনায় আপনার মৃত্যু লেখা থাকে।

মৃত্যু যখন আসে তখন অর্থ ক্ষমতা পেশিশক্তি—কোনোকিছুই কোনো কাজে লাগে না। আপনি যেখানেই লুকান, মৃত্যু আপনাকে সেখানেই গিয়ে ধরবে। যখন এই বিবরণটি পড়ছিলাম, তখন সূরা লাইলের ৮ থেকে ১১ আয়াতের কথাই বার বার মনে পড়ছিল—'আর কেউ যদি কৃপণতা করে, স্রষ্টাবিমুখ হয় এবং চিরায়ত ভালো ও সত্যকে অস্বীকার করে, তবে আমি তার জন্যে দুঃখকষ্ট ও ধ্বংসের পথে চলাকে সহজ করে দেবো। কবরে গেলে ধনসম্পত্তি তার কোন কাজে লাগবে?'

হিটলার মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্যে এমন বাংকার তৈরি করেছিলেন যে, পারমাণবিক বোমা ফেললেও তার কিছু হবে না। পারমাণবিক বোমার প্রয়োজন হয় নি, হিটলার সেই বাংকারে নিজেই নিজের রিভলবারের গুলিতে আত্মহত্যা করেছিলেন। তা-ও গুলি ঠিকমতো লাগাতে পারেন নি। পরে তার আরেকজন সহকর্মী গুলি করে তার মৃত্যু নিশ্চিত করেন এবং পেট্রোল দিয়ে তার দেহ পুড়িয়ে দেয়া হয়। আর মৃত্যু যদি না থাকে, মৃত্যুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেও মৃত্যু আপনাকে স্যালুট করে সরে যাবে।

আমরা ইতিহাসের একজন বীরকে জানি—খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা)। তিনি শতাধিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তার মধ্যে ৫০টিরও বেশি ছিল বড় বড় যুদ্ধ। পৃথিবীর একমাত্র সমরনায়ক যিনি কোনো যুদ্ধেই পরাজিত হন নি। তিনি ৫৮ বছর বয়সে অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুয়ে মারা যান। মৃত্যুর সময় তিনি কাঁদছিলেন এই বলে—'আমি শহিদ হওয়ার জন্যে প্রতিটি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। প্রতিপক্ষ সেনাপতির সাথে যুদ্ধের শুরুতেই দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছি। তিনি তার এক পুরনো বন্ধুকে নিজ শরীর দেখিয়ে বলেছেন, আমার হাত-পা, বুক-শরীর—কোথাও একহাত জায়গা পাও কিনা দেখ, যেখানে আঘাতের চিহ্ন নেই। হয় বল্লমের আঘাত, না হয় তলোয়ারের আঘাত, না হয় তীরের। অথচ আমাকে আজ মারা যেতে হচ্ছে বিছানায় শুয়ে!'

দ্বন্দ্বযুদ্ধে মৃত্যু মুহূর্তের ব্যাপার। কয়েক মিনিট। কিন্তু এত আঘাত, এত আহত হওয়ার পরেও তিনি মারা যান বিছানায় শুয়ে। অতএব মৃত্যুভয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নাই। ১৬ কোটি মানুষের দেশ। যে দেশে মানুষ ছোট ছোট ঘরে এক বিছানায় গাদাগাদি করে ঘুমায়, তাদের বরং আতঙ্ক অনেক কম। আসলে যার ফুটানি যত বেশি, তার আতঙ্ক তত বেশি। অপব্যয়-অপচয় যার বেশি, আতঙ্ক তার তত বেশি!

আমাদের ইমিউনিটি বাড়ানোর জন্যে প্রয়োজনীয় নিয়মগুলো আমরা অনুসরণ করব। কারণ এখন কর্মের সময়। সুস্থ থেকে কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আমরা যারা উপার্জন করি, যারা দিন আনি দিন খাই, তাদের জন্যে কর্মহীন দিন মানে অন্নহীন দিন। আমরা অন্নহীন দিন কাটাতে চাই না। কর্মে পরিপূর্ণ, অন্নে পরিপূর্ণ দিন আমরা চাই। এজন্যে আমাদের সুস্থ থাকতে হবে। সুস্থ থাকার জন্যে সুস্থ জীবনদৃষ্টি প্রয়োজন, সুস্থ জীবনাচার প্রয়োজন।

করোনা সংক্রমণ যে-রকম প্রাণঘাতী বলা হচ্ছে যে, করোনা যেন এই ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং আপনাকে খেয়ে ফেলল! সেটা মোটেই ততটা প্রাণঘাতী

নয়। আমরা বলেছিলাম, আমরা আপনার পাশে আছি। আপনার চিন্তার কিছু নেই। আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। এই করোনাকালে যতভাবে সম্ভব আমরা সবার পাশে থাকার চেষ্টা করছি।

যখন সব রক্তদান কেন্দ্রগুলো বন্ধ হয়ে গেছে, আমরা কিন্তু একঘণ্টার জন্যেও আমাদের রক্তদান সেবা বন্ধ করি নি। সকল রক্তগ্রহীতার তরফ থেকে, উপকৃত মানুষের তরফ থেকে আমরা আমাদের রক্তদান কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। তারা ২৪ ঘণ্টা রক্তদান কেন্দ্র চালু রেখেছেন। যে-সব কর্মীর পক্ষে দূর থেকে আসা সম্ভব হয় নি, তারা ল্যাবে থেকে গেছেন। আমাদের স্বেচ্ছাসেবক—আর্ডেন্টিয়ার, কোয়ান্টিয়াররা পূর্ণ সুরক্ষা নিয়ে মোটরসাইকেলে করে বিভিন্ন জায়গা থেকে ব্লাড ডোনারদের নিয়ে এসেছেন, আবার ডোনারদের পৌঁছেও দিয়েছেন।

আমাদের মোবাইল ক্যাম্প সমস্ত নিয়ম মেনে সবসময়ই তৎপর ছিল। যারা রক্তের জন্যে এসেছেন, তাদের সবাইকে আমরা যে রক্ত দিতে পেরেছি তা নয়। কিন্তু অধিকাংশকেই আমরা এই সেবা দিতে পেরেছি।

রক্তের সরবরাহ ঠিক রাখার জন্যে আপনারা ল্যাবে এসে রক্ত দিয়ে যান। এটা এই সময়ের একটা বড় প্রয়োজন। আমাদের এই সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্যে কর্তৃপক্ষ আমাদের যে সহযোগিতা করেছেন, আমরা তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সামনে ডেঙ্গুর সিজন। ডেঙ্গু মোকাবেলায় আমরা আগাম প্রস্তুতি নিতে চাই। ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীদের প্লাটিলেট সরবরাহ করে গত বছর যেভাবে সফলভাবে আমরা ডেঙ্গুর মোকাবেলা করেছিলাম, এবারও আমরা সেটা করতে চাই। আর যারা ঘরে বসে আছেন, তাদের প্রতি অনুরোধ জানাব যে, আপনার বাসস্থানের চারপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে ফেলুন। ওখানে যাতে ময়লা না থাকে। এমন কোনোকিছু যাতে না থাকে, যেটা মশার ফ্যাক্টরি হয়ে যাবে। পানি জমে থাকতে পারে এমন পাত্রগুলো পরিষ্কার করে ফেলুন।

এসময়ে আতঙ্কিত মানুষের সবচেয়ে অমানবিক রূপ আমরা দেখেছি করোনা-মৃতদের নিয়ে। যখন আমরা দেখলাম—আপনজনও লাশ দাফন করতে আসছে না। মহল্লায় মহল্লায় বাধা দেয়া হচ্ছে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত মৃতের লাশ দাফন করতে, তখন আমরা অনুভব করলাম যে, এটাই আমাদের সেবা দেয়ার সময়। যেখানে কেউ এগোচ্ছে না ভয়ে-আতঙ্কে,

আমাদের সেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। তারা আমাদেরকে ঢাকায় দাফন কার্যক্রম শুরু করার অনুমতি দিলেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই—তারা দাফন করার শরীয়তসম্মত প্রক্রিয়া সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান আমাদেরকে দান করলেন। আমরা ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আমরা আমাদের কোয়ান্টিয়ার বা স্বেচ্ছাসেবীদের আহ্বান জানালাম—স্বেচ্ছায় যারা ঝুঁকি নিতে চান এবং করোনা-শহিদদের সম্মান জানাতে চান, তারা এগিয়ে আসুন। সমাজের সর্বস্তর থেকে বিভিন্ন পেশার মানুষ এসে নাম লেখালেন।

আমরা আমাদের এই স্বেচ্ছাকর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্যে যা যা করা প্রয়োজন, করেছি। মৃতের মাধ্যমে যাতে কোনোরকম সংক্রমণ না হয় সেজন্যে আন্তর্জাতিক মানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়েছি। যদিও এটা ব্যয়বহুল। তারপরও এই কাজে যখন এই মুহূর্তে কেউ এগিয়ে আসছে না, আমরা ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

এই কাজ করতে গিয়ে আমরা কত যে ঘটনার সাক্ষী হয়েছি! ঘটনাগুলো আমাদের ওয়েবসাইট থেকে আপনারা পড়বেন। চোখের পানি ধরে রাখতে পারবেন না। মুক্তিযোদ্ধা, খ্যাতিমান ডাক্তার, অধ্যাপক—এমন অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃতদেহ প্রথম অবস্থায় দাফন হয়েছে অনেকটা বেওয়ারিশের মতোই। তাদের পাশে আমাদের স্বেচ্ছাসেবীরা ছাড়া আর কেউই ছিল না। তবে আস্তে আস্তে মানুষ ভয়-আতঙ্ককে কাটিয়ে উঠেছে। বেরিয়ে আসছে আতঙ্কবাদীদের প্রচারণা থেকে। স্বেচ্ছাসেবীদের পাশাপাশি তারাও জানাজায় অংশ নিচ্ছে। বাবার কবরে, ভাইয়ের কবরে, মায়ের কবরে মাটি দিচ্ছে।

স্বেচ্ছাসেবীদের মধ্যে আমাদের পরিবারের সনাতন এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরাও রয়েছেন। হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের পরামর্শক্রমে পূর্ণ ধর্মীয় মর্যাদায় সনাতনদের মরদেহ সৎকারের ব্যবস্থার জন্যে যা যা প্রয়োজন তার সবকিছুই আমরা করেছি।

এই কাজে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান—সবাই একাকার হয়ে গেছে। ওয়াইএমসিএ কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দেই। তারা একটা ফ্লোর এই মানবিক কাজের জন্যে বিনা ভাড়ায় আমাদেরকে ব্যবহার করতে দিয়েছেন।

এটি একটি ব্যয়বহুল কাজ। এই কাজে অনেক সহৃদয় ব্যক্তি আর্থিক সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। অনেক মহিলা তাদের গয়না দিয়ে গেছেন। একজন মহিলা তার বিয়ের সমস্ত মূল্যবান গয়না দিয়ে গেছেন এই শহিদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে, যাতে আমরা দাফন কার্যক্রম ঠিকভাবে চালাতে পারি। আমরা আমাদের শুভানুধ্যায়ী দাতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। তাদের দানের অর্থে ইতোমধ্যেই রাজশাহীর জন্যে একটা লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্স আমরা কিনেছি। রাজশাহীতে সেটা দিয়ে কাজ শুরু হয়েছে। লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্সের অভাবে সেখানে কাজ খুব বিঘ্নিত হচ্ছিল।

চট্টগ্রামের জন্যেও আমরা একটা লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্স কিনেছি। সেখানেও এই অ্যাম্বুলেন্সের ফলে কাজ করাটা সহজ হয়েছে। ইনশাআল্লাহ! আপনাদের সহযোগিতায় লাশবাহী ফ্রিজিং গাড়ি কেনারও পরিকল্পনা রয়েছে।

আমরা ১৫ বছর আগে রাজশাহী থেকে বেওয়ারিশ লাশ দাফন কার্যক্রম শুরু করেছিলাম। সেখানেও গত ১৫ বছরে পাঁচ শতাধিক বেওয়ারিশ লাশ আমরা দাফন করেছি। এখন শুধু বেওয়ারিশ নয়, যাদের ওয়ারিশ আছে, কিন্তু দাফনের ব্যবস্থাপনা নেই, এই মানবিক কাজে পরিপূর্ণ সহযোগিতার জন্যে সেইভাবে আমাদের স্থাপনা গড়ে তুলতে চাই। অর্থাৎ শুধু করোনায় মৃতদের জন্যে নয়, যে-কোনো মৃতের সম্মানজনক কাফন-দাফনের ব্যবস্থা আমরা করতে চাই। সৎকারের জন্যে যা যা প্রয়োজনীয়, সেটাও যেন করতে পারি।

আমরা আপনাদের সাথে নিয়েই ফাউন্ডেশনের সমস্ত কাজ করেছি। এই কাজটিও ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে নিয়ে করব। দাফন কার্যক্রমে যারা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে অংশ নিতে চান, তাদের প্রতিও নাম তালিকাভুক্ত করার আহ্বান জানাচ্ছি। তাদেরকে এ-কাজের জন্যে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হবে, যাতে তারা যে-কোনো স্থানে দাফন বা সৎকারে অংশ নিতে পারেন।

পুরো করোনাকালে সবচেয়ে দুঃখজনক হচ্ছে, আতঙ্কবাদীরা একশ্রেণির মানুষকে এত আতঙ্কিত করে ফেলেছে যে, তারা করোনাকে ভাইরাস মনে করছে না, বরং আক্রান্ত ব্যক্তিকেই ভাইরাস হিসেবে ঘৃণা করছে। তাকে অচ্ছুৎ করে ফেলছে, সমাজবিচ্ছিন্ন করে ফেলছে।

অথচ সত্যটা কী? যিনি করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন, তার মর্যাদা হচ্ছে শহিদের মর্যাদা। এই শহিদের মর্যাদা রসুলুল্লাহ (স) দিয়ে গেছেন। সুনান আন নাসাঈয়ের ১৮৪৬ নম্বর হাদীস, সুনান আবু দাউদের ৩১১১ নম্বর হাদীস—জাবির ইবনে আতিক (রা) বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (স) বলেছেন,

'আল্লাহর পথে নিহত হওয়া ছাড়াও সাত ধরনের শহিদ রয়েছেন। এই সাত ধরনের শহিদদের প্রথম ধরন হচ্ছে যারা মহামারিতে মারা যান।'

সহীহ বোখারী ২৬৭৪ নম্বর এবং সহীহ মুসলিমের ১৯১৪ নম্বর হাদীস, আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত : 'আল্লাহর রসুল (স) বলেছেন, যে পাঁচ ধরনের শহিদ রয়েছেন, তার মধ্যে প্রথম ধরন হচ্ছে যিনি মহামারিতে মারা গেছেন'।

সেই জামানায় মহামারি ছিল প্লেগ। সহীহ আল বোখারী ৩৪৭৪ এবং ৬৬১৯ নম্বর হাদীস, মা আয়েশা (রা) বর্ণিত—'আমি আল্লাহর রসুলকে জিজ্ঞেস করলাম (প্লেগ) মহামারি সম্পর্কে। তিনি বললেন, এটা আল্লাহর তরফ থেকে শাস্তি, যাদের তিনি শায়েস্তা করতে চান। আর বিশ্বাসীদের জন্যে এটি হচ্ছে তাঁর দয়া ও করুণার উৎস। যে আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কারের আশায় মহামারি চলাকালে নিজের দেশে ধৈর্যের সাথে এই বিশ্বাস নিয়ে অপেক্ষা করবে যে, আল্লাহ লিখে রাখেন নি এমন কিছুই আমার হবে না, সে একজন শহিদের সমান পুরস্কার পাবে।'

ইমাম ইবনে হাজার আল আশকালানী (রহ) ব্যাখ্যা করেছেন, 'প্লেগ বা মহামারিতে মারা গেলেই তিনি শুধু শহিদ হিসেবে পুরস্কৃত হবেন না, যিনি ধৈর্যের সাথে আল্লাহর ওপর নির্ভর করবেন তিনিও সমানভাবে পুরস্কৃত হবেন'। অর্থাৎ ধৈর্যের সাথে মহামারির মোকাবেলা করে যিনি বেঁচে থাকবেন এবং আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখবেন, তিনিও শহিদ হিসেবে পুরস্কৃত হবেন।

শহিদ হিসেবে পুরস্কারটা কী? ইবনে মাজাহ-র ৪৩১৩ নম্বর হাদীস, উসমান (রা) বর্ণিত। আল্লাহর রসুল (স) বলেছেন, 'মহাবিচার দিবসে তিন শ্রেণির মানুষ আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারবে। প্রথম শ্রেণি হচ্ছে নবী-রসুলরা, দ্বিতীয় শ্রেণি হচ্ছে জ্ঞানীরা, তৃতীয় শ্রেণি হচ্ছে শহিদরা।'

আবু দাউদ শরীফের ২৫২২ নম্বর হাদীস, আবু দারদা (রা) বর্ণিত। রসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, 'মহাবিচার দিবসে একজন শহিদ ৭০ জনের পরিত্রাণের জন্যে সুপারিশ করতে পারবে।'

অতএব যারা করোনায় মারা গেছেন, তাদের মর্যাদা হচ্ছে শহিদের মর্যাদা। যে কারণে আমরা প্রথম দিন থেকেই নির্দ্বিধায় বলেছি, মহাবিচার দিবসে নবী-রসুল এবং জ্ঞানীদের মতো করোনা শহিদরাও সুপারিশ করতে পারবে। অর্থাৎ করোনায় যারা মারা গেছেন, তারা মৃত্যুর পরে সম্মানজনক অবস্থায় অবস্থান করবেন!

করোনা-শহিদদের যথাযথভাবে সম্মান জানানো আমাদের সবারই

দায়িত্ব। করোনায় আক্রান্ত হয়ে যারা শহিদ হয়েছেন, যারা ধৈর্যের সাথে করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন এবং করোনার রোগীদের বাঁচাতে গিয়ে যারা শহিদ হয়েছেন তাদের সবার জন্যে আমাদের দোয়া করা উচিত।

একজন মৃতকে দাফন করা হচ্ছে ফরজে কিফায়া। অর্থাৎ এটা ফরজ, অবশ্য পালনীয় কর্তব্য সমাজের জন্যে। আমরা এই ফরজে কিফায়া আদায় করছি। ফরজে কিফায়া যে-কোনো নফল ইবাদতের চেয়ে ৭০ গুণ বেশি সওয়াবের। এই কাজে শ্রম দিয়ে আপনিও অংশ নিতে পারেন। স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যে-রকম অংশ নিতে পারেন, দূর থেকে দোয়া করে এবং দান করেও আপনি অংশ নিতে পারেন। তাদের কাফন-দাফন যাতে সম্মানজনকভাবে করা যায়, সুন্দরভাবে করা যায়, সেজন্যে দোয়া করবেন। অনেক সময় লাশ অনেক দূরে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়, তাদেরকে যেন আমরা ফ্রিজিং অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে যেতে পারি, সেজন্যে আপনারা দোয়া করবেন।

আপনারা আন্তরিকভাবে দান করবেন, যাতে আমরা এই কাজটি খুব সুন্দরভাবে করতে পারি। দোয়া এবং দানের মধ্য দিয়ে আপনিও অফুরন্ত পুণ্যের ভাগীদার হবেন। শেষবিচার দিবসে এই শহিদদের সুপারিশ যেন আমরা সবাই পেতে পারি, সেইভাবে আমরা এতে অংশগ্রহণ করব।

আপনাদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ। পুরো রমজান মাস আমি আপনাদের সাথে থাকতে পেরেছি সাদাকায়নে। আপনারা যে আমাদের জন্যে দোয়া করেছেন, সেটা আমি অনুভব করেছি। আল্লাহ আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুন, সবাইকে সুস্থ রাখুন এবং এই সৎ কাজে আমাদের সবাইকে অংশগ্রহণ করার তওফিক দান করুন।

ঘরে ঘরে সাদাকায়ন (অডিও) : ১২ জুন ২০২০

রোগ প্রতিরোধে কী খাবেন, কী খাবেন না!

সুস্থতা স্রষ্টার সবচেয়ে বড় নেয়ামত। সুস্থ থাকার জন্যে প্রয়োজন সুস্থ জীবনদৃষ্টি। প্রয়োজন দেহ-মনের যথাযথ যত্ন নেয়া। রাজসিক-তামসিক নয়, প্রয়োজন সাত্ত্বিক খাবার গ্রহণ। স্বাস্থ্যসম্মত খাবার, পুষ্টিবিজ্ঞানসম্মত খাবার। তাহলেই দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে। যে-কোনো ভাইরাস বা সংক্রামক ব্যাধির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় শক্তি ওষুধ, ইনজেকশন বা টিকা নয়; সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে আপনার দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা। ভাইরাস আক্রমণ করলেও আপনার প্রতিরোধ ব্যবস্থা আক্রমণকারী শত্রুকে দ্রুত বিনাশ করে আপনাকে সুস্থ করে তুলবে।

পাশ্চাত্যে করোনার আগ্রাসী সংক্রমণ হয়েছে। সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধূমপায়ী, অ্যালকোহল গ্রহণকারী, এনার্জি ড্রিংকস, সফট ড্রিংকস, ফাস্ট ফুড ইত্যাদি গ্রহণকারীদের ওপর আক্রমণ হয়েছে জটিল ও প্রাণঘাতী।

সঠিক ও পুষ্টিবিজ্ঞানসম্মত খাবার গ্রহণ সম্পর্কে শুধু জানা নয়, সেটা অনুসরণ তখনই আমরা করতে পারব যখন সুস্বাস্থ্যের গুরুত্ব বুঝতে পারব। যদি শুধু অর্থবিত্তের পেছনে—স্বাস্থ্য, পরিবার-পরিজন, সমাজ—কোনোদিকেই না তাকান, তাহলে শুধু অর্থ আপনাকে সুস্বাস্থ্য দিতে পারবে না। সুস্বাস্থ্য শুধু টাকা দিয়ে কেনা যায় না। এর জন্যে প্রয়োজন শারীরিক মানসিক সামাজিক এবং আত্মিক—প্রতিটি ক্ষেত্রে সুস্থ জীবনদৃষ্টি।

সুস্বাস্থ্য কত বড় নেয়ামত তা একজন মানুষ বোঝেন তখন, যখন তিনি অসুস্থ হন। যখন তার শরীরে নানারকম রোগের উপসর্গ দেখা দেয়। এ ব্যাপারে এক ধনকুবের সম্পর্কে প্রচলিত একটি গল্প আছে। একবার এক

সাংবাদিক তার সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন। নানান প্রশ্নোত্তরের পরে শেষ প্রশ্নটি ছিল, গত ছয় মাসে আপনার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আমাদের বলুন। তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, দিন ১৫ আগে আমি একটা অর্ধ সেদ্ধ ডিমের অর্ধেক কুসুম খেয়েছিলাম এবং সেটা হজম হয়েছিল। এটাই গত ছয় মাসে আমার জীবনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা!

আমরা অনেকেই প্রতিদিন ডিম খাই। অর্ধ সেদ্ধ না, পুরো সেদ্ধ ডিম খাই। আমাদের জন্যে এটা কোনো ঘটনা না। কারণ ডিম যেমন পুষ্টিদায়ক, এটা ওজনও নিয়ন্ত্রণ করে। ডিমের পুরোটা খাবেন। সাদা-হলুদ, যা আছে সব খাবেন (যদি না বিশেষ কোনো রোগের কারণে কোনো নিষেধাজ্ঞা থাকে)।

আস্ত সেদ্ধ ডিম খেয়ে হজম করতে পারা আমাদের জন্যে কোনো ঘটনা না, কিন্তু ওনার জন্যে কেন ঘটনা? কারণ উনি কোনোকিছুই খেয়ে হজম করতে পারতেন না, মাতৃদুগ্ধ ছাড়া। মাতৃদুগ্ধ সংগ্রহ করার জন্যে বিভিন্ন হাসপাতালে তার এজেন্টরা থাকত। তারা মাতৃদুগ্ধ সংগ্রহ করে আনত। তিনি তা-ই খেতেন। এটাই তার হজম হতো, অন্য কিছু নয়। অতএব কোটি কোটি টাকার পাহাড় আপনি জমাতে পারেন। কিন্তু আপনার শরীরের সিস্টেম যদি নষ্ট হয়ে যায়, টেবিলে খাবার থাকবে, অন্যেরা খাবে, আপনি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবেন। যদি সুস্থতা না থাকে, আপনি হয়তো জাউ খাবেন চামচ দিয়ে।

জীবনে সবকিছুর প্রয়োজন আছে। অর্থেরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু অর্থ তখনই আপনার কল্যাণে আসবে, যখন আপনি অর্থের ব্যবহার জানবেন। তখন এটা আপনাকে তৃপ্তি দেবে। অর্থ ব্যয় করতে জানতে হবে। অপচয় সবাই করতে পারে। অপচয় করার জন্যে কোনো জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ব্যয় করার জন্যে জ্ঞানের প্রয়োজন।

ধরুন, একটা বিশাল প্রাসাদ বানালেন। সেখানে টয়লেট অত্যাবশ্যক। জীবনের জন্যে অর্থও একই রকম অত্যাবশ্যক। আবার আপনি সোনা দিয়ে টয়লেটের কমোড বানান, সেটার ফ্ল্যাশিং সিস্টেম যদি ঠিক না থাকে, তো আপনি সেই সোনার কমোড কয়দিন ব্যবহার করতে পারবেন? ফ্ল্যাশিং সিস্টেম না থাকলে আপনি ওটাকে আর ব্যবহার করতে পারবেন না। মানি ইজ লাইক আ টয়লেট। এসেনশিয়াল, কিন্তু ফ্ল্যাশিং সিস্টেম থাকতে হবে।

নিজের কল্যাণে, মানুষের ও সমাজের কল্যাণে উপার্জন করতে জানতে হবে। ব্যয় কীভাবে করতে হয় সেটাও জানতে হবে। তাহলে অর্থ আপনাকে সত্যিকার তৃপ্তি দেবে। আপনি নিঃসন্দেহে তখন ভাগ্যবানদের একজন হবেন।

শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যে, সুস্থতার জন্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হচ্ছে খাবার। খাবারের ব্যাপারে সহজ ফর্মুলা হচ্ছে, সুপাচ্য-সহজ খাবার গ্রহণ করতে হবে। অতিরিক্ত মসলা, তেল-ঝাল, ভাজাপোড়া বর্জন করবেন। মাঝেমধ্যে একটু মসলা, একটু তেলতেলে খাবার, একটু ঝাল, ভাজাপোড়া এক-আধদিন খেলেন। কিন্তু ক্রমাগত অতিরিক্ত মসলা, তেল-ঝাল, ভাজাপোড়া বর্জন করবেন।

খাবারের ব্যাপারে এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, ধ্যান করলে বা যোগচর্চা করলে শুধু নিরামিষ খেতে হবে। আসলে ধ্যানের সাথে, যোগব্যায়ামের সাথে আমিষ-নিরামিষের কোনো সম্পর্ক নেই। সব খাবেন। যা-কিছু আপনার রুচি, ধর্মবিশ্বাস ও পুষ্টিবিজ্ঞান অনুমোদন করে—সব খাবেন। অর্থাৎ খাবারটা ধর্মসম্মত, পুষ্টিবিজ্ঞানসম্মত এবং রুচিসম্মত হতে হবে। যে সিজনে যে শাকসবজি পাওয়া যায়, যে ফল পাওয়া যায়—খাবেন। মাছ-মাংস খাবেন। শাকসবজির মধ্যে বিশেষত বাঁধাকপি, লালশাক, পুঁইশাক, ডাঁটাশাক, পাটশাক, কচুশাক খাবেন। সজনে পাতা এবং আঁশজাতীয় সবজি বেশি খাবেন। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করার জন্যে ফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আয়ুর্বেদের সূত্র হচ্ছে : শাকে বাড়ায় মল, আর ফলে বাড়ায় বল।

আয়ুর্বেদের আরেকটি সূত্র হচ্ছে : যে অঞ্চলে যে মৌসুমে যে ফল হয়, সে অঞ্চলে সে মৌসুমে যে রোগ থাকে, সে রোগের প্রতিষেধক ওই ফলের মধ্যে থাকে। মনে রাখবেন, ফল মানে হচ্ছে দেশজ ফল, মৌসুমি ফল।

আমরা জানি—ফলের রাজা আম। কিন্তু ফলের মহারাজা হচ্ছে কাঁঠাল। কাঁঠাল আমাদের জাতীয় ফল। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত ফল পাওয়া গেছে, তার মধ্যে কাঁঠাল হচ্ছে সবচেয়ে পুষ্টিকর এবং এর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি। শুধু কাঁঠাল না, কাঁঠালের বিচিও সমান পুষ্টিকর! কেউ কেউ মনে করে, আমরা আপেল-আঙুর খাব, বেদানা খাব। কিন্তু এগুলোর চেয়ে কাঁঠালের পুষ্টিগুণ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশি। পাশ্চাত্যের মানুষেরা এখন কাঁঠালের খোঁজ পেয়েছে। যারা ভেগান, তারা কাঁচা কাঁঠাল সবজি হিসেবে, পাকা কাঁঠাল ফল হিসেবে খাওয়া শুরু করেছেন।

কাঁঠালের সিজনে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যে প্রতিদিন এই ফল খাবেন। আট/ দশ কোষ করে কাঁঠাল খান। দুই বেলা খান। কাঁঠাল একদিকে যে-রকম বলকারক, অন্যদিকে রোগ প্রতিরোধক এবং ফর্সাকারক। কাঁঠাল ত্বককে উজ্জ্বল করে, মসৃণ করে।

কেউ কেউ বলতে পারেন যে, কাঁঠাল গুরুপাক। হজম হতে চায় না। ফর্মুলা কিন্তু খুব সহজ। কাঁঠাল খান ছয় কোষ, আট কোষ। অর্থাৎ আপনি যতটা খেতে চান, খাওয়ার পরে কাঁঠালের একটা কাঁচা বিচি চিবিয়ে রস খান। যা খেলেন, সব হজম হয়ে গেল। সারাবছর আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অটুট থাকবে। অতএব কাঁঠালের সিজনে প্রতিদিন কাঁঠাল খাবেন।

এখন আমের সিজন। আম খাবেন, পেয়ারা খাবেন, কুল খাবেন, আমড়া খাবেন। দাঁতটাকে ব্যবহার করবেন। শিশুদেরকেও দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খেতে উৎসাহ দেবেন। শুধু চিকেন ফ্রাই, চিপস, জুস, পুডিং ধরনের খাবার খাওয়াবেন না। আখ চিবাতে বলবেন। আমড়া, পেয়ারা কামড়ে ও চিবিয়ে খেতে বলবেন। দেশি মুরগির হাড় চিবাতে দেবেন। দাঁত যত ব্যবহার করবে, দাঁত তত ভালো থাকবে, সুন্দর থাকবে।

বাজারে এখন জাম পাওয়া যায়। জাম খাবেন। আয়ুর্বেদে ডায়াবেটিসের ওষুধের মূল উপাদান জামের বিচি। যাদের ডায়াবেটিস আছে, জামের বিচি খাবেন এবং রাতে আধা চা-চামচ মেথি ভিজিয়ে রাখবেন। সকালবেলা মেথি ভেজানো পানি পান করবেন। আরো চমৎকার জিনিস খেতে পারেন—প্রতিদিন সকালে এক গ্লাস করলার জুস! বলবেন, তিতা! তিতা বলবেন না। বলুন, টেস্টি তিতা। তিতারও তো স্বাদ আছে। কিশোরী ও তরুণীদের ব্রন বেশি হয়। লেজার করে কোনো লাভ নেই। ছয় মাস প্রত্যেক দিন এক গ্লাস করলার জুস খাবেন। ত্বক মসৃণ হবে, ইনশাআল্লাহ!

আমলকি খাবেন, বেল খাবেন, কদবেল, জাম্বুরা খাবেন। আমরা তো ভাবি—যাদের পয়সা আছে, তারা কমলা খাবে, মাল্টা খাবে। আসলে কমলা-মাল্টার চেয়ে জাম্বুরা অনেক উপকারী। আগস্ট মাস থেকে জাম্বুরা পাওয়া যাবে। যাদের খুব বেশি ঠান্ডা লাগে, তারা প্রতিদিন অর্ধেক জাম্বুরা খাবেন। শীতের সময়ও ফিনফিনে কাপড় পরে ঘুরে বেড়াতে পারবেন! ঠান্ডা আপনাকে কাবু করতে পারবে না। আনারসের সিজনে আনারস খাবেন। অর্থাৎ যে মৌসুমে যে ফল পাওয়া যায়, সেই ফল খাবেন।

কিন্তু ফলের জুস বলে যা পাওয়া যায়, এগুলো নিজেরা খাবেন না, শিশুকে খাওয়াবেন না। প্যাকেটজাত বা টিনজাত জুস বলে যা পাওয়া যায়, বর্জন করবেন। ফ্রেশ ফল খাবেন। আর জুস যদি খেতেই হয় তো ফ্রেশ ফলের জুস করে খান। তবে জুসের চেয়ে ফল চিবিয়ে খাওয়া অনেক বেশি উপকারী। টিনজাত-প্যাকেটজাত প্রসেসড ফুড যত না খান তত ভালো।

স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর হচ্ছে সাদা চিনি অর্থাৎ হোয়াইট পয়জন। সাদা চিনি খাবেন না। পুরোপুরি বর্জন করবেন। ক্যান্সার থেকে বাঁচার একটা বড় পথ হচ্ছে চিনি ও চিনি জাতীয় মিষ্টি বর্জন করবেন। দুধ চা স্টমাকের জন্যে ক্ষতিকর। ফাস্ট ফুড যত বেশি খাবেন, আজরাইল আপনার দিকে তত ফাস্ট অগ্রসর হবে। ফাস্ট ফুড টেস্টি হওয়ার কারণ হলো—অন্যান্য উপকরণের সাথে এতে ফ্যাট বা তেল ব্যবহার করা হয় বেশি। যত বেশি তেল খাবেন, তত তেলতেলে হবেন। তত আপনার ওজন বাড়বে এবং তত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে। সফট ড্রিংকস, এনার্জি ড্রিংকস, অ্যালকোহল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমায়। এগুলো ডায়াবেটিস এবং কিডনি বিনাশের কারণ।

বৈজ্ঞানিক কারণটা কী? সফট ড্রিংকস সবচেয়ে বেশি টেস্টি হয় যখন এটা চিল্ড অবস্থায় থাকে। যত ঠান্ডা তত স্বাদ। আর পানি সবচেয়ে ঠান্ডা এবং ঘন হয় যখন এটার তাপমাত্রা চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পৌঁছায়। চার ডিগ্রির নিচে চলে গেলে দ্রুত এটা বরফ হয়ে যায়। সফট ড্রিংকস যদি জমে যায়, কতক্ষণে এটা গলবে, কতক্ষণে আপনি খাবেন! আপনার ধৈর্য থাকবে না। সফট ড্রিংকস যাতে জমতে না পারে এজন্যে ড্রিংকস কোম্পানিগুলো একটা অ্যান্টিফ্রিজার কেমিক্যাল—ইথিলিন গ্লাইকল ব্যবহার করে। ইথিলিন গ্লাইকল সফট ড্রিংকসের তাপমাত্রা চার ডিগ্রিতে স্থির রাখে। এর নিচে আর নামতে দেয় না। এই ইথিলিন গ্লাইকল কিডনির জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

আমাদের দেশের খুব বড় কিডনি বিশেষজ্ঞ ব্রিগেডিয়ার মরহুম সিরাজ জিন্নাতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। ১৯৯৩ সালে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবসে এক সেমিনারে তিনি প্রথম *সফট ড্রিংকসের ক্ষতিকর দিক* বিষয়ে নিবন্ধ পাঠ করেন। সেখানে প্রথমবারের মতো বৈজ্ঞানিক তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করে তিনি বলেন, দেশে আজ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের যে কিডনি ও ইউরিনারি প্রবলেম, ডায়াবেটিস, এর প্রধান কারণ হচ্ছে সফট ড্রিংকস।

অতএব দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অটুট রাখার জন্যে কী কী বর্জন করবেন, তা আবারো আপনাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি। সাদা চিনি, ফাস্ট ফুড, প্রসেসড ফুড, সফট ড্রিংকস, এনার্জি ড্রিংকস বর্জন করবেন। ধূমপান বর্জন করবেন। ধূমপান আর বিষপানের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই।

আমরা দেখছি, করোনায় আক্রান্তদের ৫৫ শতাংশের বয়স হচ্ছে ২১ থেকে ৪০। কারণটা খুব স্পষ্ট। এই বয়সীদের মধ্যেই মিষ্টি, ফাস্ট ফুড, সফট ড্রিংকস, এনার্জি ড্রিংকস গ্রহণ এবং ধূমপানের হার বেশি। বিশ্ব স্বাস্থ্য

সংস্থার তথ্য অনুসারে, বাংলাদেশি ধূমপায়ীদের ৬৩ শতাংশ ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সী। অতএব যারাই ধূমপান করছেন, সফট ড্রিংকস, এনার্জি ড্রিংকস, ফাস্ট ফুড এবং চিনিজাতীয় খাবার খাচ্ছেন, খুব সতর্ক হয়ে যান। আমরা দোয়া করি আপনাদের জন্যে, যাতে এগুলো বর্জন করে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পারেন। সুস্থ জীবনাচারে অভ্যস্ত হতে পারেন।

শরীরের এনার্জি লেভেল ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ডাব খাবেন। ডাবের মধ্যে ১৯টি উপকারী উপাদান রয়েছে। কচি ডাবের পানি এবং রক্তের ফ্লুইড—তরল অংশ, একই উপাদানে তৈরি। ফলে কখনো যদি স্যালাইন পাওয়া না যায়, ডাক্তাররা কচি ডাবের পানি সরাসরি রোগীর ভেইনে প্রবেশ করিয়ে দেন। অতএব ডাব খাবেন।

প্রতিদিন খাবারে এককোষ রসুন, ২০-৪০টা কালোজিরা, এক চা-চামচ মধু, এক গ্লাস দুধ, একটা কলা এবং একটা ডিম রাখবেন। প্রতিদিন সবুজ সালাদ খাবেন। যে সবজিগুলো কাঁচা খাওয়া যায় সেগুলোই সবুজ সালাদ।

টক দই খাবেন। যেটাকে ইয়োগার্ট বলে। চীনাবাদাম খাবেন। বিশেষত পুরুষরা প্রত্যেক দিন ৫০ গ্রাম করে চীনাবাদাম খাবেন। এটি হৃদরোগ এবং টেস্টিসের ক্যান্সার প্রতিরোধক। পুরুষদের একটা বয়সের পর টেস্টিসে ক্যান্সার হতে চায়। আরো যত ধরনের বাদাম এবং বিন আছে, খাবেন।

আলু খাবেন, মিষ্টি আলু খাবেন। আমাদের দেশে খাদ্যের কোনো অভাব নেই। কিন্তু খাদ্যজ্ঞানের অভাব রয়েছে। চাল ও ভুট্টা যে-রকম কার্বোহাইড্রেট, আলুও কিন্তু কার্বোহাইড্রেট। কিন্তু আলু আমরা তরকারি হিসেবে খাই! আলু হতে পারে চালের বিকল্প। আমরা চাল একটু কমিয়ে অর্থাৎ ঘরে যদি দিনে তিন কেজি চাল লাগে, সে-ক্ষেত্রে দু-কেজি চাল এবং এক কেজি আলু ব্যবহার করতে পারি। তাহলে আমরা চাল রপ্তানিকারক দেশ হয়ে যাব।

আমাদের সবচেয়ে পছন্দের খাবার ভাত। ভাত না খেলে আমরা যে ভরপেট খেয়েছি, এটা অনেকেই মনে করি না! সবসময় খেয়াল রাখা উচিত, সাদা চালের ওপর যে লাল আবরণ থাকে, এই আবরণসহ খেতে হবে। অর্থাৎ ঢেঁকিছাঁটা লাল চাল। ঢেঁকিতেও এমনভাবে ছাঁটতে হবে, যাতে লাল অংশটা পুরোপুরি থাকে। এই চাল হচ্ছে সবচেয়ে উপকারী চাল।

চালের আসল শক্তিটা কিন্তু ওই লাল খোসায়। অতএব সাদা চালের পরিবর্তে ঢেঁকিছাঁটা লাল আবরণসহ চালের ভাত খাওয়ার অভ্যাস যদি আমরা করতে পারি, আমাদের সুস্থ থাকার পরিমাণ অনেক বেড়ে যাবে।

সব ধরনের ডাল খাবেন। খিচুড়ি খাবেন। শাকসবজি আধা সেদ্ধ খাবেন। অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে যে, শাকসবজি যত সেদ্ধ করা হবে, হজম তত দ্রুত হবে। আসলে শাকসবজি যদি বেশি সেদ্ধ করা হয়, তাহলে হজম হতে দেরি হয়। কারণ শাকসবজিতে প্রাকৃতিক এনজাইম থাকে। যখন আপনি বেশি সেদ্ধ করছেন, তখন এই প্রাকৃতিক এনজাইমটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তখন এটা হজম করার জন্যে স্টমাককে আবার নতুন করে এনজাইম তৈরি করতে হয়।

সবসময় সুষম খাবার খাবেন। অর্থাৎ খাবারের মধ্যে ব্যালেন্স করবেন। দুই দিন নিরামিষ, দুই দিন ছোট মাছ, দুই দিন বড় মাছ, একদিন মাংস খান।

মাছের ক্ষেত্রে সামুদ্রিক মাছ যত খাবেন তত ভালো। মনে রাখবেন, যত পা তত কোলেস্টেরল। চিংড়ি-কাঁকড়ার অনেক পা, কোলেস্টেরল সবচেয়ে বেশি। গরু, খাসি, পাঁঠা—চার পা। হাঁস মুরগি—দুই পা। মাছের কোনো পা নেই, তাই মাছে কোনো কোলেস্টেরলও নেই।

কী খাবেন, এটা এতক্ষণে আপনাদের কাছে পরিষ্কার হলো। কতটুকু খাবেন, কখন খাবেন—এটাও গুরুত্বপূর্ণ। শরীরের যত্ন আরো কীভাবে নেবেন, ইনশাআল্লাহ এটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

আলোচনার উপসংহারে সহজভাবে বলতে চাই যে, জাতিগতভাবে আমাদের এমনিতেই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে। এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটাকে অটুট রাখার জন্যে দুটি কাজ করতে হবে। এক. যে-সব খাবার ও পানীয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়, সেগুলো বর্জন করতে হবে এবং দুই. শাকসবজি ফলমূলসহ যে খাবারগুলো আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, সেগুলো খেতে হবে।

বিন্দু বিন্দু যত্ন স্বাস্থ্য গড়ে তোলে, আর বিন্দু বিন্দু অবহেলা-অযত্ন, অনাচার আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়, স্বাস্থ্য নষ্ট করে দেয়। নিজের সুস্থ থাকার দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হবে।

ঘরে ঘরে সাদাকায়ন (অডিও) : ২৬ জুন ২০২০

কখন খাবেন কতটুকু খাবেন

প্রিয় সুহৃদ! আজকের সাদাকায়নে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আপনারা আতঙ্কের জমাট অন্ধকার ভেঙে ধীরে ধীরে বিশ্বাসের আলোয় আলোকিত হচ্ছেন, সচেতন হচ্ছেন, আতঙ্কের অসারতা বুঝতে পেরেছেন। এজন্যে আপনাদের বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আতঙ্কবাদীরা মানুষকে আতঙ্কিত করে, ভীতসন্ত্রস্ত করে, সাধারণ মানুষকে তাদের শোষণের কাঁচামাল বানাতে চায়। তাদের জীবনকে তছনছ করে দিতে চায়। সাধারণ মানুষের জীবনের স্বাভাবিকতাকে নষ্ট করতে চায়। সেখান থেকে আপনারা ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছেন। বলা যেতে পারে, এখন আপনারা আগের চেয়ে অনেক সচেতন, অনেক সাহসী।

করোনাভাইরাস নিয়ে আতঙ্কবাদীরা আতঙ্ক সৃষ্টি করার প্রতিটি কৌশলই কাজে লাগিয়েছে। তারা প্রথম থেকেই বলেছে, লকডাউন অত্যাবশ্যক। তা না হলে আমরা সবাই মরে যাব। এ মৃত্যুর তুঙ্গ পিরিয়ড হবে মে-র শেষ এবং জুনের প্রথম অংশ। আমাদের দেশের আতঙ্কবাদীরাও এই একই কথা বলে এসেছে। তথাকথিত গবেষকেরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছে—শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই ২২ লক্ষ লোক মারা যেতে পারে! তারা এমনও বলেছে যে, যদি হাসপাতালে সকল রোগীর চিকিৎসা করা হয়ও, তবুও যুক্তরাষ্ট্রে ১২ লক্ষ লোক মারা যাবে। এজন্যে তারা জোরেশোরে লকডাউন করেছিল।

লকডাউন আসলে কতটা উপকার (!) করেছে যুক্তরাষ্ট্র বা সেখানকার মানুষের, আমেরিকান ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিক রিসার্চ লকডাউনের ১০০ দিন পর গত ২৫ জুন এ নিয়ে একটি গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশ করেছে।

ওয়াশিংটন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেকটা স্টেটকে সর্বোচ্চ চাপ দিয়েছিল লকডাউন করার জন্যে। কিন্তু উত্তর ডাকোটা, দক্ষিণ ডাকোটা, নেব্রাস্কা, আইওয়া, আরকানসাস, ওকলাহোমা, ওয়াইওমিং, ইউটাহ—এই আটটি স্টেট লকডাউন করে নি। এর মধ্যে ওকলাহোমা, ওয়াইওমিং ও ইউটাহ কোনো কোনো শহরে লকডাউন করেছিল। বাকি পাঁচটি স্টেট কোনো লকডাউন করে নি। ১০০ দিন পর পরিসংখ্যান বলছে, এই আটটি স্টেটে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৯১ হাজার একশত ১৮। মৃত্যু এক হাজার আট শত আট।

পক্ষান্তরে লকডাউন স্টেটগুলোতে আক্রান্তের সংখ্যা ২১ লক্ষ দশ হাজার একশত ৫৩; মৃতের সংখ্যা এক লক্ষ ১৬ হাজার পাঁচ শত এক। লকডাউন যারা করে নি, সেই স্টেটগুলোতে করোনা মৃত্যুর হার ১.৮ শতাংশ। আর লকডাউন করা স্টেটগুলোতে করোনা মৃত্যুর হার হচ্ছে ৫.৫ শতাংশ। অর্থাৎ লকডাউন স্টেটগুলোতে মৃত্যু প্রায় চার গুণ বেশি!

লকডাউন আমেরিকান অর্থনীতিকে যেভাবে নকডাউন করেছে, এটা তারা কবে নাগাদ কাটিয়ে উঠতে পারবে তা আল্লাহই ভালো জানেন। লকডাউন সারা পৃথিবীর অর্থনীতিকে নিঃসন্দেহে নকডাউন করে দিয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষতির প্রসঙ্গ বাদ দিয়েও শুধু মহামারি থেকে সুরক্ষার জন্যে লকডাউনের পক্ষে কোনো যুক্তি আর অবশিষ্ট থাকে কি? স্বাভাবিকভাবেই এই বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যাশা করব, আমাদের দেশ থেকে লকডাউন উঠে যাবে। ছুটি শেষ হবে। আমরা দেশের অর্থনীতি নির্মাণে ঝাঁপিয়ে পড়ব। সাধারণ মানুষের জন্যে কর্মহীন দিন আর অন্নহীন দিন একই কথা। কর্মপূর্ণ দিন এবং অন্নপূর্ণ দিনের প্রত্যাশা নিয়ে আজ সাদাকায়নের মূল আলোচনায় প্রবেশ করব।

করোনা বা যে-কোনো মহামারি বা যে-কোনো রোগের বিরুদ্ধে আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে আমাদের দেহের ইমিউন সিস্টেম। দেহের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। কোয়ান্টাম মেথডের শুরু থেকে আমরা পরিষ্কারভাবে বলেছিলাম—আপনি যখন অসুস্থ হবেন, তখন আপনার একমাত্র পরিচয় আপনি রোগী। আপনি তখন ক্লিনিক ব্যবসায়ীদের শোষণের কাঁচামাল ছাড়া আর কিছু নন। দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যে সুষ্ঠু জীবনদৃষ্টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সুস্থ থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আসলে শারীরিক মানসিক সামাজিক এবং আত্মিকভাবে ভালো থাকার নাম হচ্ছে সুস্থ থাকা। শারীরিকভাবে ভালো থাকার জন্যে গত সাদাকায়নে খাবারের ওপর আমরা গুরুত্ব আরোপ করেছিলাম। কী খাবেন এবং কী বর্জন

করবেন—এটার একটা স্পষ্ট নীতিমালা আমরা তুলে ধরেছিলাম।

সুস্থ থাকার জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে দম। দম হচ্ছে জীবনের মূল ছন্দ। এই দমই আপনার দেহের অন্য সকল ছন্দকে নিয়ন্ত্রণ করে। সঠিক ও পরিপূর্ণ দম প্রতিটি জীবকোষকে প্রকৃতির ছন্দে ছন্দায়িত করে। প্রতিটি জীবকোষকে প্রাণবন্ত করে। এই দমটাই হচ্ছে প্রাণ।

আমাদের মুনি-ঋষি, সাধক, অলি-বুজুর্গদের সুস্থতার একটি মূল রহস্য ছিল এই দম। এখন থেকে চার হাজার বছর আগে মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার ধ্বংসাবশেষের যে নিদর্শনাবলি আমরা পাই, সেখানে দেখা যায়, তারা দমচর্চা করতেন। তারা দমচর্চাকে বলতেন 'প্রাণায়াম'। অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ায় দম নিলে মানুষ প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত হয়, সেটাকে বলা হয় প্রাণায়াম। তারা ৪০০ ধরনের প্রাণায়ামের চর্চা করেছেন। কোনো কোনো প্রাণায়াম এত জটিল যে সার্বক্ষণিক শিক্ষকের উপস্থিতি ছাড়া সেটা চর্চা করা যায় না!

সাধারণভাবে প্রাণবন্ত থাকার জন্যে আমরা সহজ কিছু প্রাণায়ামের চর্চা করতে পারি। তার মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে উজ্জীবন। যখন যেখানে থাকুন—দাঁড়িয়ে বা বসে—মেরুদণ্ড সোজা করবেন, নাক দিয়ে দম নেবেন। বুক ফুলিয়ে দম নেবেন এবং ধীরে ধীরে মুখ দিয়ে দম ছাড়বেন। একবার হলো। এরকম একসাথে ১৫/২০ বার দম নেবেন, দম ছাড়বেন। একদফা হবে। সারাদিনে ৫/৭ দফা দম নেবেন। এটি হচ্ছে সহজ উজ্জীবন। যত বুক ফুলিয়ে দম নেবেন, তত ফুসফুসের স্থিতিস্থাপকতা বাড়বে। ফুসফুসের প্রতিটি কোষে অক্সিজেনের প্রবাহ বাড়বে এবং আপনি প্রাণবন্ত হবেন।

করোনার মূল আক্রমণ ফুসফুসের ওপরে, শ্বাসযন্ত্রের ওপরে। দমচর্চা করলে আপনার শ্বাসযন্ত্রের শক্তি এবং স্থিতিস্থাপকতা, এর ফাইটিং পাওয়ার অনেক বেড়ে যাবে। যে-কোনো বয়সের যে-কেউ এই দমচর্চা, অর্থাৎ প্রাণায়াম বা সহজ উজ্জীবন করে উপকৃত হতে পারেন। শুধু ছয় মাস এই দমচর্চা করুন, নিজের প্রাণবন্ততা দেখে, নিজের প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত হওয়া দেখে আপনি নিজে বিস্মিত হবেন।

কী খাবেন, কী খাবেন না—বিষয়টি এর আগে আমরা আলোচনা করেছি। বলেছি, সাদা চিনি হচ্ছে বিষ। সাদা চিনি যদি আপনি পুরোপুরি বর্জন করতে পারেন, তাহলে অনেক জটিল রোগ থেকে রক্ষা পাবেন। সাদা চিনি দিয়ে তৈরি মিষ্টি এবং চকলেটও বর্জন করবেন। কোনো বাসায় বেড়াতে গেলে,

আনন্দ-উৎসবে অথবা শিশুদের জন্যে মিষ্টি বা চকলেটের পরিবর্তে খেজুর নিয়ে যাবেন অথবা অন্য কোনো ফল নিয়ে যাবেন।

খাবারের ব্যাপারে গত সপ্তাহে সহজ ফর্মুলা বলেছিলাম, সুপাচ্য-সহজ খাবার খাবেন। অতিরিক্ত ভাজাপোড়া, অতিরিক্ত তেল-ঝাল বর্জন করবেন। যারা এসি রুমে থাকেন, তারা অতিরিক্ত ঝাল মরিচ খাবেন না। আলসার হবে। আবার যারা রোদে কাজ করেন, তাদের জন্যে মরিচ খুব ভালো। রোদের তীব্রতা থেকে, রোদের উত্তাপ থেকে দেহ সুরক্ষিত থাকবে মরিচ খেলে। শাকসবজি আধা সেদ্ধ খাবেন। তাতে হজম দ্রুত ও সুন্দর হবে।

খাবার সময় অটোসাজেশন দেবেন 'যা খাব মজা করে খাব, যা খাব সব হজম হবে'। আপনি দেখবেন যে, হজমে সমস্যা হচ্ছে না। কারণ আমাদের স্টমাকে এত পাওয়ারফুল এসিডের নিঃসরণ হয় যে, সেখানে আস্ত লোহার টুকরা দিয়ে দিলে তা হজম হয়ে যাবে। অতএব খাবার হজম না হওয়ার কোনো কারণ নেই। হজমটা মনোদৈহিক ব্যাপার। আপনি এই বিশ্বাস নিয়ে খাবেন—যা খাব সব হজম হবে।

খাবার টেবিলে বসে পরচর্চা-পরনিন্দা করবেন না, গীবত করবেন না। গীবত, পরনিন্দা-পরচর্চা করলে আপনার এসিডিটি কখনো ভালো হবে না। কারণ খাবার হচ্ছে নেয়ামত। আপনার দেহের জন্যে কল্যাণকর একটি বস্তু। আর পরচর্চা-পরনিন্দা-গীবত হচ্ছে নেতিবাচক শক্তি। খাবারের সাথে এসব নেতিবাচক শক্তি যুক্ত হলে এসিডের ক্ষরণ বেশি হয়।

অতএব খাবার টেবিলে প্রার্থনা করে পরম করুণাময়ের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। মনোযোগ দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খান। যত সময় নিয়ে চিবিয়ে খাবেন, মনোযোগ দিয়ে খাবেন, খাবারের পুষ্টি ও প্রাণশক্তি তত আপনার ভেতরে প্রবাহিত হবে। অল্প খাবারও আপনাকে তৃপ্তি, পুষ্টি এবং শক্তি দেবে।

'কী খাবেন'-এর পরের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে কতটুকু খাবেন? পরিমিত খাবেন। যত বেশি খাবেন, রোগ তত বেশি হবে। টাকা থাকলেই খাওয়া যায় না; বরং আমরা দেখি—যার টাকা যত বেশি, তার খাবারের টেবিলে খাবার তত বেশি, কিন্তু তিনি নিজে খান সবচেয়ে কম। তিনি ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ বা আরো অনেক জটিল রোগের কারণে খেতে পারেন না।

এ-ক্ষেত্রে নবীজীর (স) একটি হাদীস রয়েছে। তিনি বলেছেন, 'তোমার পাকস্থলীর এক-তৃতীয়াংশ শক্ত খাবার, এক-তৃতীয়াংশ তরল ও পানি এবং এক-তৃতীয়াংশ ফাঁকা রাখো। *[মিকদাম ইবনে মাদিকারিব (রা); তিরমিজী]*

আপনি বলতে পারেন, এক-তৃতীয়াংশ বুঝব কীভাবে? আসলে খাবার গ্রহণ করার পরে আপনি আরো দুই লোকমা খেতে পারেন—এরকম সময় খাবার গ্রহণ বন্ধ করে দেবেন। অর্থাৎ একটু ক্ষুধা রেখে খাওয়া শেষ করবেন। এই নিয়মে যদি খান, তাহলে মৃত্যুর দিনও দেখা যাবে যে, পোলাও-কোরমা খেয়ে মারা যাচ্ছেন।

কেন? কারণটা খুব সহজ। খাবার পরিমিত খেলে আপনার পাকস্থলী ভালো থাকবে। আরেকটা কারণ হতে পারে যে, একজন মানুষ কী পরিমাণ খাবে—প্রত্যেকের জন্যে সেটা বরাদ্দ থাকে। আমরা যখন বিভিন্ন ধরনের মুখরোচক খাবার, যেমন : চাইনিজ, ফাস্ট ফুড, বিরিয়ানি, পোলাও-কোরমা খাই, ভাতের চেয়ে তা বেশি খাই। আপনি যদি আগেই আপনার বরাদ্দ শেষ করে ফেলেন তো টেবিলে খাবার থাকবে, কিন্তু আপনি খেতে পারবেন না। অতএব সবসময় পরিমিত খাবেন।

কী খাবেন, কতটুকু খাবেন—এটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, কখন খাবেন—তা-ও একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ। হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক করে যারা মারা যেতে চান, তাদের জন্যে রাতে ভূরিভোজ হচ্ছে আদর্শ প্রেসক্রিপশন। আর রাতে যারা বেশি খাবেন, তাদের ওজন কখনো কমবে না। তাই সকালবেলা ভারী নাশতা করবেন। দুপুরে তৃপ্তির সাথে খাবেন। রাতে একদম হালকা খাবেন।

রাতের খাবার দুই টেবিল চামচ ভাত এবং ছোট এক বাটি সবজি। এভাবে যদি আপনি খেতে পারেন, আপনার ওজন সবসময়ই নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এর কারণটা কিন্তু খুব সহজ। ধরুন, সকাল ৮টায় নাশতা গ্রহণ করলেন এক-দেড় হাজার ক্যালরি। খাবারটা হজম হয়ে ক্যালরিতে রূপান্তরিত হওয়ার তুঙ্গ মুহূর্ত হচ্ছে পঞ্চম থেকে সপ্তম ঘণ্টা। আপনি যদি ক্যালরি বার্ন আউট করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। যখন সকাল ৮টায় খাচ্ছেন, দুপুর ১টা হচ্ছে পঞ্চম ঘণ্টা। ২টা হচ্ছে ষষ্ঠ ঘণ্টা। ৩টা হচ্ছে সপ্তম ঘণ্টা। এই সময় আপনি কোন লেভেলে থাকেন? বিটা-গামা। ইউ আর ওয়ার্কিং। আপনি তখন কর্মতৎপর অবস্থায়। যা ক্যালরি তৈরি হলো, বার্ন আউট হয়ে গেল।

আমাদের এখন অবস্থাটা কী? আমরা অনেকে সকালে কোনোরকম একটু নাশতা করি। অনেকে নাশতাও করি না। একটা টোস্ট বিস্কুট, কফি খেয়ে চলে যাই। দুপুরে কিছু একটা খেয়ে নিলাম। সন্ধ্যায় যখন বাসায় ফিরলাম—সারাদিন সে-রকম খানাপিনা হয় নি, তাই আয়েশ করে খেতে বসলাম।

ধরুন, রাত ৮টায় আপনি খাচ্ছেন। রাত ১টা পঞ্চম ঘণ্টা। ২টা ষষ্ঠ ঘণ্টা। ৩টা সপ্তম ঘণ্টা। তখন আপনি কোন লেভেলে? ডেল্টা লেভেলে। ক্যালরি তৈরি হলো, কিন্তু বার্ন আউট হলো না। কারণ আপনি তখন ঘুমে। সবচেয়ে কম ক্যালরি খরচ হচ্ছে সে-সময়। যখন ক্যালরি বার্ন আউট হলো না, তখন আপনার সিস্টেম এটাকে চর্বি বানিয়ে ফেলে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্যে। একবার যদি চর্বি জমে, সেটা শরীর সহজে খরচ করতে চাইবে না। আর আপনার নির্দিষ্ট ওজনের ওপরে এক কেজি অতিরিক্ত ওজন হলে মনে করবেন, আপনার জীবন থেকে একবছর বাদ হয়ে গেল।

শুধু পাশ্চাত্যে নয়, আমাদের দেশেও উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্তের এখনকার স্বাস্থ্যগত সমস্যার প্রধান কারণ হচ্ছে এই অতিরিক্ত ওজন। যত শরীরের চর্বি বাড়বে, তত দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে।

অতএব সকালে সবসময় ভারী নাশতা করবেন। দুপুরে তৃপ্তির সাথে খাবেন এবং রাতে একেবারে হালকা খাবার খাবেন। এক টেবিল চামচ বা দুই টেবিল চামচ ভাত অথবা ছোট দুটো রুটি, ছোট একবাটি সবজি। ওজন আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকবে। আপনার দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে এবং আপনি সুস্থ থাকবেন। ডাক্তারের কাছে অনেক কম যেতে হবে।

দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যে খাবারের পাশাপাশি পরিশ্রম করতে হবে, মেহনত করতে হবে। আমাদের দৈহিক শ্রম এখন অনেক কমে গেছে। সবসময় মনে রাখবেন, যত আরাম তত ব্যারাম। যত ব্যস্ত তত সুস্থ।

আপনার খাবার থেকে যে ক্যালরি তৈরি হলো, এই ক্যালরি ব্যয় করে ফেলতে হবে। শরীরটাকে আরাম কম দেবেন। শুয়ে থাকলে ক্যালরি ব্যয় হয় সবচেয়ে কম। বসলে ক্যালরি ব্যয় হয় তার চেয়ে বেশি। দাঁড়িয়ে থাকলে ক্যালরি ব্যয় হয় তার চেয়েও বেশি। মনে রাখবেন—যত আরামদায়ক চেয়ার, আরামদায়ক সোফা—শরীরের জন্যে, মেরুদণ্ডের জন্যে সেটা তত ক্ষতিকর, তত ব্যাকপেইন। এজন্যে যখন টিভি দেখবেন, সোফায় না বসে দাঁড়িয়ে দেখুন। যখন মোবাইলে কথা বলবেন, দাঁড়িয়ে বলুন।

স্থূলতা অবশ্যই ক্ষতিকর কিন্তু আলস্য ও নিষ্ক্রিয়তায় আরো বেশি ক্ষতি। ২০১৪ সালের একটি রিপোর্ট হচ্ছে : স্থূলতাজনিত রোগে ইউরোপে মারা যায় ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার মানুষ। আর আলস্য ও নিষ্ক্রিয়তাজনিত রোগে মারা যায় ৬ লক্ষ ৬৭ হাজার। একেবারে দ্বিগুণ। এজন্যে শরীরটাকে যত কাজের মধ্যে

রাখবেন, তত আপনি ভালো থাকবেন। আর যখনই সুযোগ পান—হাঁটবেন। ঘরের মধ্যেও শুয়েবসে না থেকে দাঁড়াবেন, হাঁটবেন, চলাফেরা করবেন। রান্না করা, কাটাকুটির কাজ বসে করার চেয়ে দাঁড়িয়ে করবেন। রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে কাটাকুটি এবং রান্নার ব্যবস্থা রাখবেন। আপনি ভালো থাকবেন।

আর শরীরটাকে সুস্থ রাখার জন্যে, দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যে ইয়োগা বা যোগব্যায়ামের কোনো বিকল্প নেই। আজ পর্যন্ত যোগব্যায়ামের চেয়ে ভালো ব্যায়াম স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীরা বের করতে পারে নি। যোগব্যায়াম বা ইয়োগার মধ্যে কোয়ান্টাম ইয়োগা হচ্ছে লেটেস্ট। যত নিয়মিত কোয়ান্টাম ইয়োগা করবেন, তত আপনি সুস্থ থাকবেন। দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে।

আমরা আমাদের আজকের আলোচনার উপসংহার টানতে পারি।

আতঙ্কবাদীরা লকডাউনের সপক্ষে যে প্রচারণা চালিয়েছে যে, লকডাউন না হলে আমরা সবাই মারা যাব, এই প্রচারণা যে কত অর্থহীন সেটি ২৫ জুন প্রকাশিত আমেরিকান ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিক রিসার্চ-এর তথ্য থেকে আমরা দেখিয়েছি। যুক্তরাষ্ট্রের যে আটটি স্টেট লকডাউন করে নি, সেখানে সংক্রমণও কম, মৃত্যুর হারও কম। আর যারা লকডাউন করেছে, সেখানে সংক্রমণও বেশি, মৃত্যুর হারও বেশি। আর লকডাউন আমেরিকান অর্থনীতিকে যেভাবে নকডাউন করেছে, এটা তারা কবে নাগাদ কাটিয়ে উঠতে পারবে তা আল্লাহই ভালো জানেন!

সবসময় দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যে দমের চর্চা বা প্রাণায়ামের চর্চা যেমন করতে হবে, তেমনি কোয়ান্টাম ইয়োগার অনুশীলনে যত আপনি একাত্ম হবেন, তত আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে।

ঘরে ঘরে সাদাকায়ন (অডিও) : ৩ জুলাই ২০২০

দান ও সেবায় আমরা অনন্য

প্রিয় সুহৃদ! আমাদের অধিকাংশের চিন্তার জগৎ এখনো আচ্ছন্ন করে রয়েছে করোনাভাইরাস। আমরা বলেছিলাম, করোনাভাইরাসের সাথে আমাদের বসবাস করতে শিখতে হবে। অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেছিলেন যে, লকডাউন দিলেই করোনা বিদায় নেবে। কিন্তু করোনা পৃথিবী থেকে বিদায় নেয় নি। বরং এখন বিশেষজ্ঞরাও বলছেন যে, করোনার সাথেই বসবাস করতে হবে।

ইকোনমিস্ট, জুলাই ৪ তারিখের সংখ্যায় এমআইটির এক গবেষণা প্রতিবেদনের উল্লেখ করে লিখেছে, ২০২১ সালের মাঝামাঝি করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াতে পারে ২০-৬০ কোটি মানুষে! আরো বেশি হতে পারে বা আরো কম হতে পারে। কারণ সবটাই সম্ভাবনা। যতক্ষণ পর্যন্ত করোনার কোনো কার্যকর ওষুধ বের না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে নির্ভর করতে হবে করোনা মোকাবেলায় আপনার নিজস্ব প্রস্তুতির ওপর।

আমরা বলেছি, করোনা মোকাবেলার দায়িত্ব নিজেকে নিতে হবে। যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। গরম ভাপ নিতে হবে, গরম পানি দিয়ে গার্গলও করতে হবে। আমরা যখন প্রথম বলেছিলাম কালোজিরা, রসুন ও মধু খেতে, গরম পানির গার্গল এবং গরম ভাপ নেয়ার কথা, অনেকে নাক সিঁটকিয়ে ছিল। এরকম মহারানি অথবা মহারাজা করোনা! শুধু ভাপ নিলে আর গরম পানির গার্গল করলে কী হবে! কিন্তু এখন ইউরোপের ডাক্তাররাই বলছেন, উষ্ণ লবণ-পানির গার্গল সর্দি-কাশিতে যেমন কার্যকর, করোনার ক্ষেত্রেও একইভাবে কার্যকর!

আসলে করোনা নিয়ে ইউরোপ বা যুক্তরাষ্ট্রে প্রাথমিক মৃত্যুর মূল কারণ ছিল আতঙ্ক। দুই নম্বর কারণ হচ্ছে, তাদের সমাজব্যবস্থায় অমানবিকতা।

স্পেন এবং ইতালিতে ওল্ড এজ হোমের সেই বয়স্ক মানুষগুলোকে জেনেশুনেই সমস্ত চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। নির্দেশনা ছিল, এদের চিকিৎসার চেষ্টা করার প্রয়োজন নেই। স্পেনে এই অমানবিক নির্দেশনাই বয়স্কদের মৃত্যুর প্রধান কারণ। আমেরিকাতেও আতঙ্কের কারণে দিনে তিন হাজার মানুষও মারা গেছে! আর এখন আতঙ্ক কমে আসায় দিনে গড় মৃত্যুর সংখ্যা হাজারের নিচে।

মানবদেহের সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে, তার ইমিউন সিস্টেম। ইমিউন সিস্টেমের সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে ভয়-আতঙ্ক। যখন মানুষ আতঙ্কিত হয় বা ভয় পেয়ে যায়, তখন তার ইমিউন সিস্টেম অকার্যকর হয়ে যায়। আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি যে, আমরা প্রথম থেকেই আতঙ্কমুক্ত ছিলাম। বলেছিলাম, দেহের যত্নায়ন, স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ, যোগব্যায়াম, প্রাণায়াম চর্চা করলে আপনি খুব সফলভাবেই করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবেন।

মৃত্যু জীবনের এক অবধারিত সত্য। করোনাকে যেভাবে প্রাণঘাতী বলা হচ্ছে, করোনা সেই রকম প্রাণঘাতী মহামারি নয়। মৃত্যু, আক্রান্তের হার এবং সুস্থতার হার দেখলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

৫ জুলাই পর্যন্ত পৃথিবীতে মোট আক্রান্ত হয়েছে এক কোটি ১৪ লক্ষ ১৭ হাজার পাঁচ শত নয় জন। মারা গেছে পাঁচ লক্ষ ৩৪ হাজার দুই শত ৭৯ জন। আক্রান্ত হওয়ার পরে সুস্থ হয়েছে ৬৪ লক্ষ ৬৫ হাজার পাঁচ শত পঞ্চাশ জন। অর্থাৎ ৬০ শতাংশ মানুষ ইতোমধ্যেই সুস্থ হয়েছে। আর আমাদের দেশে যাদের করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে, তার মধ্যে ৫০ শতাংশ সুস্থ হয়েছে। এক লক্ষ ৬২ হাজার চার শত ১৭ জন শনাক্তের মধ্যে মোট মৃত্যু দুই হাজার ৫২ জনের। অর্থাৎ আমাদের সুস্থতার হার অনেক বেশি। কারণ আমাদের দেশের মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি। তাই আমাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে মৃদু সংক্রমণ।

এখন সাধারণ মানুষ করোনা নিয়ে মোটেই আতঙ্কিত নয়। সে সচেতন হয়েছে। প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি অধিকাংশই অনুসরণ করার চেষ্টা করছে। আবার অনেকে মনে করছে যে, করোনা আর সর্দিকাশি একই রকম। এটা নিয়ে অত মাথা ঘামানোর কিছু নেই। তবে আমরা সবসময়ই সতর্কতার পক্ষে, যত্নের পক্ষে।

এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হচ্ছে, আতঙ্কমুক্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়া। যারা এসি রুমে থাকেন, প্রতিদিন দরজা-জানালাগুলো খুলে দেবেন।

বাইরের গরম বাতাস ঢোকার সুযোগ দেবেন। কারণ ঠান্ডা বাতাস করোনার জীবাণুকে দীর্ঘক্ষণ জীবিত রাখতে পারে। করোনাভাইরাসের ওপরে চর্বির প্রলেপ আছে। এই প্রলেপের জন্যে সবচেয়ে বেশি উপযোগী হচ্ছে ঠান্ডা আবহাওয়া। অতএব এসি রুমের মধ্যে আটকে না থেকে দরজা-জানালা খুলে বাইরের মুক্ত বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা করা উত্তম। গায়ে একটু রোদ লাগানো উত্তম। প্রখর রোদ আরো ভালো।

আপনি যত আতঙ্কিত থাকবেন, যত ভীতসন্ত্রস্ত থাকবেন, তত ভাইরাস আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবে। আপনি ভাইরাসের টার্গেট হবেন। কারণ প্রতিপক্ষ সবসময়ই দুর্বল শত্রুর ওপরেই আঘাত হানতে চায়। করোনাও ভীতসন্ত্রস্ত আতঙ্কিতদের বেশি পছন্দ করে।

ভয় এবং আতঙ্ক থেকে মুক্ত থাকার ফর্মুলা আমরা অনুধাবন করেছি এবং সেটা আমরা আমাদের জীবনে প্রয়োগ করেছি। আলহামদুলিল্লাহ! কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীরা সবচেয়ে সাহসী। তারা শারীরিক-মানসিক দিক থেকে ভালো আছেন, সুস্থ আছেন।

পবিত্র ধর্মবাণীতে সবকিছুরই দাওয়াই আছে। যারা অনুসন্ধান করেন, তারা সেই তথ্য, সেই জ্ঞান লাভ করেন।

সূরা বাকারার ২৭৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা তাদের উপার্জন থেকে রাতে বা দিনে, প্রকাশ্যে বা গোপনে, সচ্ছল বা অসচ্ছল অবস্থায় দান করে, তাদের জন্যে তাদের প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোনো ভয় বা পেরেশানি থাকবে না।'

ঋগ্‌বেদে চমৎকারভাবে বলা হয়েছে, 'নিঃশর্ত দানের জন্যে রয়েছে চমৎকার পুরস্কার। তারা লাভ করে আশীর্বাদধন্য দীর্ঘজীবন ও অমরত্ব।' *[ঋগ্‌বেদ : ৬.৭৫.৯]*

বাইবেলে একইভাবে বলা হয়েছে, 'অভাবীদের সাহায্য করো। ঈশ্বরের সন্তুষ্টিমূলক কাজে অগ্রগামী থাকো।' *[রোমীয় ১২ : ৯-১৩]*

বুদ্ধবাণী ইতিবুত্তকে বলা হয়েছে, 'দানের অনন্ত কল্যাণ সম্পর্কে আমি যা জানি, যদি মানুষ তা জানত তাহলে কাউকে না দিয়ে সে অন্ন গ্রহণ করত না।' *[ইতিবুত্তক : ২৬]*

পৃথিবীর সকল ধর্মেই দানের এই কল্যাণ খুব পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। আমরা শুধু যে নিজেরা দান করছি তা না, আমরা এর সাথে সাথে আরেকটি

গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছি। সেটা হচ্ছে, অন্যকে দানে উদ্বুদ্ধ করছি। নিজে দান করা যে-রকম সওয়াবের, আরেকজনকে দান করতে উদ্বুদ্ধ করাও একই রকম সওয়াবের, পুণ্যের, কল্যাণের। কারণ আপনার দান করার মতো অর্থ না-ও থাকতে পারে। তখন যা আছে সেখান থেকে দেবেন। আরেকজনকে যখন আপনি দানে উদ্বুদ্ধ করছেন, তখন তিনি যা দান করলেন, সমপরিমাণ পুণ্য আপনার নামে লেখা হবে। অর্থাৎ দান করা এবং দানে আরেকজনকে উদ্বুদ্ধ করা সমান সওয়াবের, সমান পুণ্যের।

আমরা দানে তখনই উদ্বুদ্ধ করতে পারব, যখন আমাদের মধ্যে দুর্গত ও অসহায় মানুষের জন্যে সমমর্মিতা সৃষ্টি হবে। জাতিগতভাবে যে-কোনো দুর্যোগ মোকাবেলায় আমাদের শক্তির মূল রহস্য হচ্ছে সামাজিক নৈকট্য এবং সমমর্মিতা। যুগে যুগে এই শক্তি দিয়েই আমরা মহামারিকে জয় করেছি, দুর্ভিক্ষকে জয় করেছি। এই শক্তি দিয়েই সমস্ত বাধা-বিপদ-বিপর্যয়কে নতুন সম্ভাবনায় রূপান্তরিত করেছি।

আমাদের ঐতিহ্য হচ্ছে দান। শুধু দুর্ভিক্ষের সময় নয়, আমাদের পূর্বপুরুষরা সবসময় দান করতেন। আমরা জাতি হিসেবে দাতার জাতি। অথচ আমাদের এখনকার ধনিক প্রজন্মের একটা বড় অংশ দেশের টাকা বিদেশে নিয়ে গিয়ে ভোগবিলাসে মত্ত হয়েছে।

ইংরেজরা আসার আগে এই বাংলার এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ ছিল ওয়াকফ সম্পদ, যা মুসলমানরা দাতব্য কাজের জন্যে ওয়াকফ করে গিয়েছিল। নিজের সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ ওয়াকফ করা হাজার বছর ধরে তাদের ঐতিহ্যের অংশ ছিল। অবশ্য ইংরেজরা এই ওয়াকফ সম্পত্তি পুরোটাই বাজেয়াপ্ত করে ফেলে বাংলা দখল করার পরে। আমাদের দেশে দেবোত্তর সম্পত্তিরও কোনো অভাব ছিল না। গত দুশ বছর ধরে দেশের আনাচে-কানাচে স্কুল-কলেজের একটা বড় অংশ দানকৃত সম্পত্তির ওপরে গড়ে উঠেছে। ইংরেজ আমলে যখন দুর্ভিক্ষ হয়েছে, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বিত্তবানরা লঙ্গরখানা করেছেন মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে।

হাজী মুহাম্মদ মহসিন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ যখন দুর্ভিক্ষে মারা যায়, সেই সময়ে তার সম্পদের কোটি টাকা ব্যয় করেছিলেন লঙ্গরখানার পেছনে। তার ম্যানেজাররা বলছিলেন, হাজী সাহেব! এভাবে যদি লঙ্গরখানা খুলতে থাকেন, তাহলে আপনার সম্পদ বলে তো আর কিছু থাকবে না! হাজী মহসিন বিনয়ের সাথে বলেছিলেন, আমার সম্পদ থাকা

সত্ত্বেও যদি আমার দেশের মানুষ না খেয়ে মারা যায়, তো এই সম্পদের ওপর আল্লাহর লানত পড়ুক। এই সম্পদের কোনো প্রয়োজন আমার নেই।

আমাদের উপকরণ যত সীমিত হোক না কেন, জাতিগতভাবে যে-কোনো সমস্যা আমরা সাহসিকতার সাথে মোকাবেলা করেছি যা আছে তা নিয়েই।

মার্চ মাসে সোশ্যাল মিডিয়া ভয়াবহ আতঙ্ক সৃষ্টি করল করোনা নিয়ে। কারো করোনা হওয়া মানে সে যেন একজন অপরাধী। তখন করোনা হয়েছে শুনলেই তাকে অচ্ছুৎ করে ফেলার এবং করোনায় আপনজন মারা গেলে পরিচয় না দেয়ার মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। দাফন বা দাহ করার জন্যে কেউ এগিয়ে আসছিল না। তখন শুধু আমরা না, আমাদের দেশের বিভিন্ন পেশার সচেতন সাহসী মানুষ এগিয়ে এলেন। তরুণ-তরুণীরাও ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বললেন, এরা আমাদের ভাই, এরা আমাদের মা, এরা আমাদের বাবা। এদের শেষ বিদায় জানাতে হবে সম্মানজনকভাবে। এটা সামাজিক দায়িত্ব। এই দায়িত্ব আমরা পালন করব।

আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। আজ তিন মাস পরে আপনজনের লাশ ফেলে পালিয়ে যাওয়া লোকের সংখ্যা খুব কম। আপনজনরা আসেন। তারাও জানাজায় অংশ নেন। শেষকৃত্যে অংশ নেন। সৎকারে অংশ নেন। স্বেচ্ছাসেবীদের জন্যে তারা দোয়া করেন। তারা বলেন, আপনারা আমাদের ভয়টাকে ভাঙিয়ে দিয়েছেন।

আসলে জাতিগতভাবে যে-কোনো সমস্যা মোকাবেলায় আমাদের যে শক্তি, এটা সবসময়ই অসাধারণ। সীমিত উপকরণ কখনো আমাদেরকে আটকে রাখে নি। এবার দাফন কার্যক্রমে যারা অংশ নিয়েছেন এবং নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের সবার জন্যে দোয়া করি যে, সময়ের একটি সঠিক কাজ তারা করেছিলেন। মানুষের মন থেকে করোনা ভয় দূর করার জন্যে এই কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। পরম করুণাময়ের অশেষ রহমত যে, প্রত্যেকটা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের যে স্বেচ্ছাসেবকেরা এই কাজটা করেছেন, তারা আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন, সবাই সুস্থ আছেন এবং সবাই তাদের কাজ অব্যাহত রেখেছেন।

এই কাজটি করতে গিয়ে আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদের অন্তরে একটা নতুন অনুভূতি এসেছে। নতুন সত্যকে তারা উপলব্ধি করেছেন; যে, মৃত ব্যক্তি বিত্তবান হোন অথবা বিত্তহীন, মৃত্যুর সাথে সাথে তিনি নিঃস্ব! শত-কোটি টাকা ব্যাংকে থাকলেও চেক কাটার সামর্থ্য তার নেই। একটি

পয়সা ব্যয় করার সামর্থ্য তার নেই। তার যা-কিছু অর্জন, যা সে নিজের মনে করেছে, সবকিছুই তার ওয়ারিশদের। ওয়ারিশরা যত খুশি ব্যয় করতে পারে।

আমরা যখন অনুভূতি বিনিময় করছিলাম, এই সত্যকে উপলব্ধি করার পরে একটা নতুন প্রস্তাব উঠে এলো। শুধু করোনা মৃত বা করোনা শহিদদের জন্যে নয়; প্রতিটি মানুষ, যেভাবেই তিনি মারা যান না কেন, মমতা দিয়ে তাকে পরিচ্ছন্ন করা, তার দাফন করা, তার সৎকার করার কাজটি আমরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে করতে পারি।

আগে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে কাজটি করা হতো। অধিকাংশ ছেলেমেয়ে জানেই না যে, মা মারা গেছে—কী করতে হবে! আসলে মৃতের কাফন-দাফনের প্রস্তুতির বিষয়গুলো যিনি জানেন এবং যার মধ্যে সমমর্মিতা রয়েছে, তিনি যত আন্তরিকতার সাথে মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পারবেন, সেটা কোনো পেশাদারকে দিয়ে সম্ভব নয়।

এই উপলব্ধির পর চিন্তা করলাম, দাফনসেবাকে আমরা একটি স্থায়ী সেবার রূপ দিতে পারি। যিনিই মনে করবেন—তার স্বজনের কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, আমরা স্বেচ্ছাসেবীরা সেখানেই ছুটে যাব। তাকে গোসল করানো থেকে শুরু করে কাফন পরানো, কবরস্থান বা শ্মশানঘাটে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত যা-কিছু করা প্রয়োজন, স্বজনের মমতায় করব।

যারা দাফনসেবায় স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করতে চান, তারা নাম তালিকাভুক্ত করতে পারেন। কাজটিকে আমরা এখন বড় শহরগুলোতে এবং ক্রমান্বয়ে সারাদেশে সম্প্রসারিত করব। আমাদের আত্মীয় ও পরিচিতজনদের শেষ বিদায়টা যেন খুব যত্নে, খুব মমতায় হয়, সেজন্যে আমরা কাজ করব।

করোনার পাশাপাশি দেশে এবার দীর্ঘস্থায়ী বন্যার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছিল। ধারণা করা হচ্ছিল—১৯৯৮ সালের পরে এটি হতে পারে সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা। আল্লাহ মেহেরবান! তিনি আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আমাদের এত ভালো থাকার কারণ—আমরা দান করি, দানে উদ্বুদ্ধ করি।

গত তিন মাস আমরা ক্রমাগত দোয়া করে যাচ্ছি। আমাদের দেশে ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের আঘাত হানার আশঙ্কা ছিল। আম্ফানের গতিপথ সেরকমই ছিল। কিন্তু অল অন এ সাডেন স্রষ্টার রহমতে গতিপথ পাল্টে গেল!

দোয়া হচ্ছে সবচেয়ে বড় শক্তি! আমরা আশা করি, যানবাহন সব শীঘ্রই চালু হবে। অফিস-আদালত খুলে যাবে। আমাদের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্যে আমরা সবাই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারব।

এই সময়ে করোনা এবং বন্যাদুর্গতদের সাহায্য-সহযোগিতা করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। অনেকে চাইতে পারে, লঙ্গরখানায় যেতে পারে, রিলিফের জন্যে লাইনে দাঁড়াতে পারে। তাদের মোটামুটি একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু বহু মানুষ আছে—এমনকি আমাদের পরিবারের মধ্যেও এমন মানুষ আছে, যারা ঘরে চাল না থাকলেও কারো কাছে হাত পাতবে না। এদের সহযোগিতা করাটা খুব প্রয়োজন। এদের আমরা সহযোগিতা করতে চাই নীরবে।

সামনে কোরবানির ঈদ। এবার ঈদে অনেকেই খরচ কম করবেন বা অনেকে খরচ করতেও পারবেন না। কিন্তু যাদের খরচ করার সামর্থ্য রয়েছে, এবারের বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোরবানির ঈদের খরচ কিছুটা বাঁচিয়ে তা রিলিফ ফান্ডে দান করতে পারি। আমার মনে হয় এটি অনেক বড় পুণ্যের, বড় সওয়াবের কাজ হবে।

কারণ এক. করোনাজনিত কারণে অর্থনৈতিক দুর্গতি। দুই. বন্যার কারণে ক্ষয়ক্ষতি মিলিয়ে মানুষের অবস্থা খুব করুণ। সেই দুর্গত মানুষগুলোর পাশে আমরা দাঁড়াতে চাই আমাদের সামর্থ্যের সর্বোচ্চটুকু নিয়ে। অতএব এবারে কোরবানির ঈদের জন্যে আমাদের খরচটাকে আমরা রিলিফ ফান্ডে দান করব, যেন এই দানের ওসিলায় পরম করুণাময় আমাদেরকে সমস্ত বালা-মুসিবত ও ভয়ভীতি থেকে মুক্ত রাখেন। আমাদের পরিবারগুলোকে যেন সহি-সালামতে রাখেন।

ঘরে ঘরে সাদাকায়ন (অডিও) : ১০ জুলাই ২০২০

বিত্তবানরা কেন দান করতে ভয় পায়?

প্রিয় সুহৃদ! পরম করুণাময়ের কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে, তিনি আমাদেরকে সাদাকায়নে মিলিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন।

দানের ব্যাপারে সকল ধর্মের শিক্ষা খুব পরিষ্কার। দান অভাবমোচন করে। ভয়-পেরেশানি দূর করে। রোগমুক্ত করে। রসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, 'তোমরা রোগমুক্তির জন্যে সাদাকা দাও। সাদাকা বা দান অকল্যাণের ৭০টি দরজা বন্ধ করে দেয়।' *[জামে উস-সগীর ও আহমদ]*

করোনাকালে ধনীদের দান নিয়ে চমৎকার সব খবর বেরিয়েছে। সংবাদপত্রের হেডিং করা হয়েছে, 'করোনাকালে ধনীদের দান : এটা দান নাকি উপহাস'? আরেকটি হেডিং—'বিশ্বসেরা ধনীদের গরিবী দান'।

আমাকে বেশ কয়েকজন এ নিয়ে প্রশ্ন করেছেন—ধনীরা দান করতে পারে না কেন? স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন অনেকের মনেই রয়েছে। বিষয়টা কিন্তু খুব সহজ। আসলে যাদেরকে আমরা ধনী মনে করি, তারা খুব পুওর মিলিওনেয়ার বা বিলিওনেয়ার। খুব গরিব কোটিপতি। কারণ এদের ব্যাংক-ব্যালেন্স অনেক। কিন্তু হৃদয়টা ইঁদুরের অথবা বলতে পারেন, চিকেন হার্টেড। অর্থাৎ হৃদয়টা করোনার মতোই খুব ছোট। যাদেরকে আমরা ধনী মনে করি, এই গরিব কোটিপতিরা দান করতে পারে না কেন?

খ্রিষ্টানদের বর্তমান সর্বোচ্চ ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন, হাইপার ক্যাপিটালিজম বা হাইপার কনজ্যুমারিজম হচ্ছে 'ডেভিল'স ডাঙ'। শয়তানের বিষ্ঠা। শয়তানের বিষ্ঠার যারা নিয়ন্ত্রক, তাদের মন ভালো হবে কীভাবে? তাদের মন বড় হবে কীভাবে? একজন ধনকুবের হতে পারেন, কিন্তু মন বড়

না হলে তিনি ধনী হতে পারেন না। যে কারণে তাদের 'ধনী' বলা হলে 'ধনী' শব্দটিকে অপমান করা হয়। ধনী তো তিনি, যিনি বিলিয়ে দিতে পারেন।

তারা দান করতে না পারার পেছনে কারণটাও কিন্তু খুব পরিষ্কার। অর্থ তাদের কাছে প্রয়োজন নয়। অর্থ হচ্ছে তাদের দেবতা। তাদের উপাস্য। উপাস্যের উপাসনা করা যায়। উপাস্যকে দান করা যায় না। এজন্যেই এই ধনকুবেররা দরিদ্র। এই ধনকুবেররা হৃদয়ের দিক থেকে কখনো ধনী হতে পারে না। যে কারণে তারা দাতা হতে পারে না।

অধিকাংশ ধনকুবের কখনো দান করে না, তারা বিনিয়োগ করে। বিনিয়োগ করে অধিক মুনাফার জন্যে, যাতে গরিবকে আরো গরিব বানানো যায়। সেই গরিবের অর্থ তাদের ভাণ্ডারে গিয়ে জমা হয়। অতএব তাদের দান নিয়ে বিবেকবান মানুষের মাথা ঘামানোর কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ তাদের পরিণতি তারা ভোগ করবে।

গ্রিসের ধনকুবের এরিস্টটল ওনাসিস। ছিলেন জাহাজের খালাসি। সেখান থেকে বিশ্বের সেরা ধনীদের একজন হয়েছেন। সত্তরের দশকে দুনিয়াজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, কিন্তু তিনি সারাজীবন ছোট মনেরই থেকে গেছেন। অর্থবিত্ত সংগ্রহ করেছেন অনেক। সঞ্চয়ও করেছেন। কিন্তু ওনাসিসের মন কখনো বড় হয় নি।

জাতে ওঠার জন্যে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির বিধবা পত্নী জ্যাকুলিনকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি গর্বভরেই বলতেন, আমি দান করি না। কারণ আমি নিজে উপার্জন করেছি। আমার সম্পদ আমার ছেলেমেয়েরা ভোগ করবে। তার জীবদ্দশায় পুত্র আলেকজান্ডার ওনাসিস ২৬ বছর বয়সে দুর্ঘটনায় মারা যান। ওনাসিসের মৃত্যুর পরে এই সম্পদের মালিক হন তার কন্যা ক্রিস্টিয়ানা ওনাসিস।

ক্রিস্টিয়ানা ৩৩ বছর বয়সে বিলিয়ন ডলারের সম্পদ রেখে আত্মহত্যা করেন। থাকল ক্রিস্টিয়ানার স্বামী এবং তিন বছরের কন্যা। কন্যা বড় হলো। ২১ বছর বয়সে বাবার বিরুদ্ধে মামলা করল মায়ের সম্পত্তি উদ্ধারের জন্যে।

অর্থাৎ এরিস্টটল ওনাসিস যা রেখে গিয়েছিলেন, তার ছেলে বা মেয়ে কেউই তা ভোগ করতে পারে নি। একজন তার জীবদ্দশায় ২৬ বছর বয়সে দুর্ঘটনায় মারা গেল। আরেকজন বাবার মৃত্যুর পরে ৩৩ বছর বয়সে আত্মহত্যা করল।

ধনকুবেরদের জন্যে ধন কতটা 'আশীর্বাদ' বয়ে আনে, সেটা তিনি অন্তিম অবস্থাতে টের পান! আমরা তাদের প্রত্যেকের জন্যে দোয়া করি যে, আল্লাহ সবাইকে হেদায়েত করুন। সবাইকে ধনসম্পদের প্রকৃত ব্যবহারের জ্ঞানে জ্ঞানী করুন, যাতে তারা এই ধনসম্পদ দিয়ে নিজের এবং মানুষের ইহকালীন এবং পরকালীন কল্যাণ করতে পারে।

অবশ্য তারা যা করছে করুক। আমরা তাদের জন্যে দোয়া করি। আমাদের যা যা করণীয় সেটা আমরা করেছি। সেজন্যে পরম করুণাময় নিঃসন্দেহে আমাদেরকে অনেক ভালো রেখেছেন। আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি তাঁর কাছে। করোনাকালে পৃথিবীর সবচেয়ে দুশ্চিন্তামুক্ত, ভয় ও আতঙ্কমুক্ত মানুষের সংখ্যা বাংলাদেশে বেশি। আমাদের অধিকাংশ মানুষেরই উপাস্য বা দেবতা অর্থ নয়। আমাদের উপাস্য একজন। তাঁকে আমরা আল্লাহ নামে ডাকি, ভগবান বা ঈশ্বর নামে ডাকি। তিনি আমাদের ওপর অনেক দয়া করেছেন। তিনি আমাদেরকে অনেক ভালো রেখেছেন।

১৮ কোটি মানুষের দেশ। যাদের আক্রান্ত বলে শনাক্ত করা হয়েছে, তাদের সংখ্যা দু-লাখেরও কম। যারা সুস্থ হয়েছেন, তাদের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। আর মৃত্যুবরণ করেছেন এ পর্যন্ত আড়াই হাজারেরও কম। যেখানে করোনায় সুপার পাওয়ার আমেরিকার নাস্তানাবুদ অবস্থা।

জাতিগতভাবেই নিরাময়ের ফর্মুলা সচেতনভাবে বা অবচেতনভাবে আমরা অনুসরণ করি। আমরা কোয়ান্টামে বলি সুস্থতার সূত্র চারটি। ধ্যান, দোয়া, দান এবং দাওয়া। মানুষের ৭৫ ভাগ রোগ হচ্ছে মনোদৈহিক। এই রোগগুলোর লক্ষণ দেহে প্রকাশ পেলেও উৎস হচ্ছে মন। এজন্যে দান-দোয়া এত কার্যকরী। প্রার্থনা বা দোয়া বিপদমুক্তির জন্যে যে কত গুরুত্বপূর্ণ সেটাও আমরা দেখেছি। করোনাকালে শবে বরাত থেকে আমরা দোয়ার কার্যক্রম শুরু করেছি। রোগ এবং বিপদমুক্তির জন্যে দোয়া অত্যন্ত কার্যকরী এক প্রক্রিয়া।

নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ালে একজন মানুষের মধ্যে মৃত্যু থেকে বাঁচার যে আকুতি সৃষ্টি হয়, সেই আকুতি, সেই মিশে যাওয়াটাই দোয়া কবুলের জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যখন আপনার দোয়া, আপনি এবং দোয়া কবুলকারী সমান্তরালে চলে আসেন তখনই দোয়া কবুল হয়। বিপদমুক্তির জন্যে আমরা তাই দোয়ার ওপরে গুরুত্ব দিয়েছি।

করোনাতে এপ্রিলে সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা গেছে সারাবিশ্বে। প্রতিদিন ১০ হাজার! বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন যে, বছরের শেষ নাগাদ

করোনাজনিত গজবের কারণে সৃষ্ট ক্ষুধায় বিশ্বে গড়ে প্রতিদিন ১২ হাজার মানুষ মারা যেতে পারে। অতএব করোনাতে যারা মারা গেছে, তাদের চেয়েও ক্ষুধায় যারা মারা যেতে পারে, তাদের মৃত্যুর হার বেশি বলেই আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। অক্সফামের রিপোর্টে তা-ই বলা হয়েছে। আমরা বন্যা ও ক্ষুধার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে আন্তরিকভাবে দোয়ায় ডুবে যাব।

কর্ম ছাড়া প্রার্থনা কবুল হয় না। প্রার্থনার পেছনে অবশ্যই কর্ম থাকতে হবে। অতএব সমস্ত ভয়-আতঙ্ককে দূর করে আমাদের এখন কাজের সময়। এমন বহু মানুষ আছে, যারা ভয় বা আতঙ্কে তাদের রুম থেকেই বের হয় নি। ঘরে থেকেই করোনায় আক্রান্ত হয়েছে এবং মারা গেছে।

অতএব মৃত্যু যখন আসার, আসবে। কাজ বন্ধ রেখে ক্ষুধায় মারা যাওয়ার পেছনে কোনো যুক্তি নেই। স্বাস্থ্য-সুরক্ষার নিয়মকানুন মেনে কাজে নেমে পড়তে হবে। লকডাউনে কাজ না থাকার ফলে আপনার কী কী অসুবিধা হয়েছে এবং আপনার বর্তমান অবস্থাকে বিশ্লেষণ করুন। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নতুনভাবে আপনি কী করতে পারেন সেই চিন্তা করুন।

একজন মানুষ যখন তার লক্ষ্য অর্জনের জন্যে প্রাণান্ত প্রয়াস চালায়, তখন মৃত্যুও তাকে স্যালুট করে। কারণ সে-তো কাজ করছে নিজের এবং মানুষের কল্যাণে। অতএব মানুষ যখন লক্ষ্য স্থির করে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করে, স্রষ্টা তখন প্রার্থনা কবুল করেন।

জাতিগতভাবে আমরা ধর্মানুরাগী, অসাম্প্রদায়িক এবং মানবিক জাতি। এজন্যে আমাদের ওপর সবসময় আল্লাহর রহমত রয়েছে। বিপদ আসে তুফানের মতো। কিন্তু আমরা যখন প্রভুর চরণে নিজেকে সঁপে দিই; যে, প্রভু! তুমি ছাড়া রক্ষা করার কেউ নেই, তখন বিপদ চলে যায় বুদবুদের মতো। অতএব নতুন করে লক্ষ্য স্থির করুন। মনছবি করুন এবং নিজের কল্যাণে, মানুষের কল্যাণে কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।

আর সবসময় পরস্পরের জন্যে দোয়া করুন—প্রভু! তুমি সবাইকে হেফাজতে রাখো। সবাইকে কাজের সুযোগ দাও। সবাইকে ক্ষুধামুক্ত সচ্ছল সুন্দর মানবিক জীবন উপভোগ করার সুযোগ দাও। সবার জীবন সুন্দর হোক। সফল হোক। আজকের দিনে এটাই আমাদের প্রার্থনা।

ঘরে ঘরে সাদাকায়ন (অডিও) : ১৭ জুলাই ২০২০

বনের বাঘে খায় না, মনের বাঘে খায়

প্রিয় সুহৃদ! আজকের সাদাকায়নে যে গল্পটি দিয়ে আলোচনা শুরু করব, সেটি আপনাদের জানা গল্প। চিরায়ত গল্পের শিক্ষা নব নব পরিস্থিতিতে শুনতে আমাদের ভালো লাগে, যা সত্যকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।

এক যুবক লোকালয় থেকে অনেক দূরে জঙ্গলে গেছে সাধনার জন্যে। লক্ষ্য একটাই—ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্যে এক মনে ধ্যান করে যাওয়া। বাঘ ভালুক সাপ বিচ্ছু—চারপাশে কোনোকিছুর অভাব নেই। এ নিয়ে যুবকের কোনো ভাবনা নেই। যুবকের প্রতিও বাঘ-ভালুকগুলোর কোনো আগ্রহ নেই। এক মাস, দু-মাস, বছর—সাধনা করতে করতে ১২ বছর পার হলো।

ঈশ্বর সন্তুষ্ট হলেন। তিনি তাকে বর দিলেন যে, তুমি যা ভাববে এখন থেকে তা-ই হবে। যুবক তো মহাখুশি। যা ভাবব তা-ই হবে!

যুবক মনের আনন্দে চারপাশে তাকাতে লাগল। গহীন বন। হঠাৎ তার মনে হলো যে, গহীন বনে যদি একটা সোনার প্রাসাদ হয়, কত না ভালো হয়! একটু আরামে থাকা যাবে। সোনার এক বিশাল প্রাসাদ হয়ে গেল। যুবক মহানন্দে প্রাসাদের এপাশ-ওপাশ, ভেতরে-বাইরে দেখতে লাগল। চমকিত হলো এই ভেবে যে, এত সুন্দর! দুপুর পার হয়ে যাচ্ছে। তার খেয়াল হলো, কতদিন ভালো খানাপিনা হয় নি। জঙ্গলে ভালো খাবার আসবে কোত্থেকে? লতাপাতা ফলমূল—এই তো খাবার। ১২ বছর তা খেয়েই সে খুব ভালো ছিল। কিন্তু হঠাৎ মনে হলো ভালো খানাপিনা দরকার।

যেই মনে হলো 'ভালো খানাপিনা', সোনার থালায় খাবার আসতে লাগল। বিরিয়ানি কোরমা টিকিয়া কালিয়া কোপ্তা ফিরনি জর্দা হালুয়া মিষ্টি

আর বর্ণিল নানা পানীয়। যুবক আনন্দে আত্মহারা! এত খাবার জীবনে সে দেখে নি। খাওয়া শুরু করল। এখান থেকে একটু, ওখান থেকে একটু ...। খেতে খেতে পড়ন্ত বিকেল। পেটে আর জায়গা নেই। মনের আনন্দে পেটের ওপরে হাত বোলাতে থাকল। আহ! এরপর থেকে প্রতিদিন এভাবেই খাব।

তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে তুলতে সে উঠে দাঁড়াল। হাঁটার শক্তি নেই! ভাবল, একটা আরাম কেদারা হলে কত না সুন্দর হয়! সাথে সাথে আরাম কেদারা হাজির। কেদারায় গা এলিয়ে দিলো। একটু ঘুম ঘুম ভাব। চোখ বুজে এলো তৃপ্তিতে। যখন সে চোখ মেলল, তখন পশ্চিম দিগন্তে সূর্য অস্তমিত হচ্ছে। লাল আভাময়। চারপাশে আঁধার নেমে আসছে আস্তে আস্তে। হঠাৎ তার মনে হলো, অন্ধকার হয়ে গেলেই তো বাঘ-ভালুক, হিংস্র প্রাণী শিকারে বের হবে। এসময় যদি বাঘ আসে এবং আমাকে খেয়ে ফেলে তাহলে কী হবে!

যুবক ভগবানের বর পেয়েছিল—'যা ভাববে তা-ই হবে'। অন্ধকার নামল। বাঘ এলো এবং তাকে খেয়ে ফেলল। সোনার প্রাসাদ প্রাসাদের মতোই থেকে গেল। আর সেখানে পড়ে রইল তার কিছু হাড়গোড়।

যুবক জঙ্গলে ছিল ১২ বছর, চারপাশে বাঘ ভালুক সাপ বিচ্ছু নেকড়ে হায়েনা ছিল। কোনোদিন তার মনে ভয় আসে নি। কিন্তু যখন তার জীবনে সাফল্য এলো, 'যা ভাববে তা-ই' পাওয়ার ভগবানের বর পেল, তার মনে বাঘের ভয় ঢুকে গেল এবং বাঘ তাকে খেয়ে ফেলল। এই গল্প থেকেই বিখ্যাত প্রবচন সৃষ্টি হয়েছে যে, 'বনের বাঘে খায় না, মনের বাঘে খায়'।

করোনা নিয়ে গত ছয় মাসের কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে এই গল্পটি বার বার মনে পড়ছিল। চিরায়ত গল্প। শিক্ষাটাও চিরায়ত। কোটি কোটি টাকার অ্যাপার্টমেন্টে যারা বাস করে, তাদের মনে করোনা নিয়ে কত চিন্তা, কত হইচই-হাঙ্গামা, কত আতঙ্ক!

এটা যে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু, খেটে খাওয়া মানুষের মনে এই উপলব্ধিটাই আসে না। সমাজের সুবিধাভোগী তথাকথিত সফল মানুষ, দামি অ্যাপার্টমেন্টে থাকা মানুষ, সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্ম নেয়া মানুষ লকডাউনে নিজেদের যেভাবে লক-আপ করে রেখেছে, আক্রান্ত হওয়ার হার, মৃত্যুর হার তাদের মধ্যেই বেশি। যারা শাহী খানাপিনা করে, আরাম-আয়েশ, বিলাসিতায় ডুবে থাকে, আক্রান্ত হওয়ার হার তাদের মধ্যেই বেশি।

সে তুলনায় বস্তির মানুষের আতঙ্কও কম, আক্রান্ত হওয়ার হারও কম। তাদের ফ্লু হচ্ছে, সর্দি-কাশি হচ্ছে। অধিকাংশই তিন দিন, চার দিন, সাত

দিনে ভালো হয়ে যাচ্ছে। আর যারা করোনায় নিজ থেকেই ‘লকডাউন’ হয়ে আছেন, আতঙ্ক তাদের বেড়েই চলেছে। তারা অনেকে গত তিন মাস, চার মাস ঘর থেকে বের হয় নি। বের হলে কী না কী হয়ে যায়! যারা বের হয় নি, করোনা তাদেরকেও ছাড়ে নি। করোনা তাদের ঘরে গিয়ে হানা দিয়েছে।

এ নিয়েও গল্প আছে। সুন্দরবনের প্রখ্যাত বাঘ শিকারি পচাব্দি গাজীর গল্প। পচাব্দি গাজী ৬৫টি বাঘ শিকার করেছিলেন। তার বাবাও বাঘ শিকারি ছিলেন। তার দাদাও বাঘ শিকারি ছিলেন। দাদা বাঘের আক্রমণে মারা যান। বাবাও মারা যান বাঘের আক্রমণে।

তার এক বন্ধু একদিন তাকে বললেন, তোর বাবাকে বাঘে খেয়েছে, তোর বাঘকে ভয় করে না? পচাব্দি বললেন, ভয় করে না।

বন্ধু : তোর দাদাকেও তো বাঘে খেয়েছে। তারপরও তোর বাঘকে ভয় করে না? পচাব্দি বললেন, না।

এবার পচাব্দির পালা। পচাব্দি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা! তোর বাবা কীভাবে মারা গেছেন? বন্ধু বলল, বাবা রাতে ঘুমিয়েছিল। সুস্থ মানুষ। সকালবেলা দেখি মারা গেছে।

পচাব্দি : তোর দাদা কীভাবে মারা গেছেন?

বন্ধু : দাদাও রাতে ঘুমিয়েছিল। সকালবেলা দেখি বিছানায় মারা গেছে।

এবার পচাব্দি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, দেখ! তোর বাবাকে বিছানা খেয়েছে। তোর দাদাকেও বিছানা খেয়েছে। তুই কি এখনো রাতে বিছানায় ঘুমাস? তোর বিছানাকে ভয় করে না?

সুতরাং মৃত্যু যখন আসবে, বিছানায় শুয়ে থাকলেও আপনি মারা যাবেন। ১৮ তলা অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে থেকেও মারা যাবেন। বেরোনোরও সুযোগ পাবেন না। ওখান থেকেই আপনার লাশ নামিয়ে আনা হবে। আর মৃত্যু আসার সময় যদি না হয়, তাহলে কিচ্ছু হবে না।

বিলাসী ও সুবিধাভোগী মানুষের মধ্যে করোনার আতঙ্ক সবচেয়ে বেশি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবৈজ্ঞানিক জীবনাচারই এর মূল কারণ। আর ভয়-আতঙ্ক নামক ভাইরাসই করোনাভাইরাসের চেয়ে মানুষের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল করে দিয়ে তাদেরকে অসুস্থ করে তুলছে।

আসলে অসুস্থ জীবনাচার অনুসরণকারী মানুষের মধ্যে রোগশোকের এই যে আতঙ্ক, দেশের সাধারণ মানুষের আগে কখনো তা ছিল না। তারা বলতেন, ফ্লু-সর্দি-কাশি, এই নিয়েই বেশ আছি!

এর মধ্যে এক গৃহকর্মী বলছিলেন, স্যার! বস্তিতে আমাগো করোনা নিয়া কোনো চিন্তা নাই। আসল কথা কী জানেন, করোনা গরিব মাইনষেরে পছন্দ করে না। আমাগো ধারেকাছেও আসে না। আল্লাহর রহমতে আমরা ভালো আছি। শুধু খাওনের কষ্ট। আমি তো কাম করি। আমার কষ্ট নাই। কিন্তু আশেপাশের মানুষ! তাগো কষ্ট আছে। কাম-কাইজ নাই। যারা মানুষের বাসায় রান্নার কাম করত, সেই বাসার মালিক সেইখানে ঢুকতেই দেয় না। তারা নাকি অনলাইনে খাবার খায়!

আসলে অনলাইন নির্ভর মানুষগুলোর জন্যে খুব মায়া হয়! যারা নিজেদেরকে শিক্ষিত মনে করেন, যারা নিজেদেরকে অনেক কিছুর জান্তা মনে করেন, যারা সারাক্ষণ সোশ্যাল মিডিয়া আর অনলাইনে থাকেন, তারা আসলে বিভ্রান্তিকর প্রচারণা দ্বারা প্রতারিত হন। জীবনের সহজ সত্যটা অধিকাংশই উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন।

ফ্লু নিয়ে জীবনের সহজ সত্যটা কী? সহজ সত্য হচ্ছে, ওষুধ খেলে এক সপ্তাহ, ওষুধ না খেলে সাত দিন! অর্থাৎ ভাইরাসের কোনো ওষুধ নেই। সুস্থ জীবনাচার যদি আপনি অনুসরণ করতে পারেন, আপনি রোগমুক্ত থাকবেন, করোনামুক্ত থাকবেন। করোনা সংক্রমণ হলেও তা হবে মৃদু।

আমাদের দেশে করোনার রিপোর্ট হচ্ছে, গত শুক্রবার (১৭ জুলাই ২০২০) পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা আড়াই হাজার। আক্রান্তের সংখ্যা বিবেচনায় মৃত্যুর হার ১.২৭%। আর সুস্থতার হার ৫৪.৪৮%। করোনা আমাদের আবহাওয়ায় তেমন বিপজ্জনক রূপ নিতে পারবে না। কারণ আমাদের আবহাওয়া করোনার বিকাশে অনুকূল নয়। আমরা বলেছিলাম সাধারণ জ্ঞান থেকে। এখন বাংলাদেশ শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের জিনোমিক রিসার্চ ল্যাব বাংলাদেশে বিস্তার লাভকারী করোনার জিনরহস্য উন্মোচন করেছে। তারা বলেছে, করোনাভাইরাসের বিপজ্জনক প্রোটিনগুলো এখনো বাংলাদেশে সক্রিয় হতে পারে নি।

আমরা পরম করুণাময়ের কাছে শুকরিয়া আদায় করি। কারণ তিনি আমাদেরকে সবসময় সকল বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। আমরা তাঁর কাছে শবে বরাত থেকেই প্রার্থনা করছি। রোজায় প্রার্থনা করেছি। খতমে কামালিতে প্রার্থনা করেছি যাতে এই গজব, এই আতঙ্ক থেকে তিনি আমাদের মুক্তি দেন। তাঁর করুণায় করোনাভাইরাসের বিপজ্জনক প্রোটিনগুলো আমাদের দেশে সক্রিয় হতে পারে নি।

করোনা আতঙ্কে একশ্রেণির মানুষ ঘরে কুঁকড়ে আছে। তাদের এই ভয় করোনাভাইরাসের চেয়েও বিপজ্জনক। তাই ভয়কে জয় করতে হবে। বাঘ-ভালুক জঙ্গলে থাকবেই। যুবকটির দিকে বাঘ-ভালুক কোনোদিন তাকায় নি। কারণ বাঘ-ভালুকের চিন্তা তার মাথায় আসে নি। করোনাও আপনার দিকে তাকাবে না। তাকালেও গলাগলি করে চলে যাবে। কারণ আপনার মনে আতঙ্ক নেই।

যিনি যত বেশি আতঙ্কিত, তিনি তত বেশি আক্রান্ত হয়েছেন। তার সংক্রমণ তত জটিল হয়েছে। যেভাবে ভয় সাধারণ মানুষের মনে বাসা বাঁধতে পারে নি, সেখানে সচেতন মানুষ হয়েও কেন আপনার মধ্যে আতঙ্ক থাকবে? একটাই কারণ থাকতে পারে, যদি আপনি অসুস্থ জীবনাচার অনুসরণ করেন।

কোয়ান্টাম গত ২৮ বছর ধরে এই সুস্থ জীবনাচারের কথাই বলে আসছে। আপনার সুস্থতার দায়িত্ব, ভালো থাকার দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে। আল্লাহ নামে ডাকেন, ঈশ্বর নামে ডাকেন, ভগবান নামে ডাকেন—তাঁর প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন করুন। তিনি সর্বশক্তিমান মহামহান। তিনি আমাদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন কাজ করার জন্যে, নিজের এবং মানুষের কল্যাণ করার জন্যে। তাহলে তিনি আমাদের মঙ্গল করবেন। তিনিই সুরক্ষা দানকারী। তিনিই মৃত্যু দানকারী। তিনি যতদিন মৃত্যু লেখেন নি, করোনা আসবে, রোগশোক আসবে, গলাগলি করে আবার চলে যাবে। আর যখন মৃত্যুর সময় আসবে তখন কোনোকিছুই বাঁচাতে পারবে না। তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে। অতএব ভয়ের কী আছে!

যাদের ভয় বা আতঙ্ক বেশি, তারা ভয় জয়ের মেডিটেশনটি নিয়মিত করবেন। কোয়ান্টাম ওয়েবসাইট ও কোয়ান্টাম অ্যাপ থেকে ডাউনলোড করে নিন। ইনশাআল্লাহ! ভয়কে জয় করে আপনিও সাহসী ভূমিকা রাখতে পারবেন। নিয়মিত মেডিটেশন, ইয়োগা, প্রাণায়াম করুন। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন। ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে। নিয়ম মেনে পার্কে মাঠে রাস্তায় যাবেন। হাঁটবেন, দৌড়াবেন। মানুষের কাছে, প্রিয়জনের কাছে যাবেন। দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াবেন। ইনশাআল্লাহ! করোনা আপনাকে স্যালুট করবে।

লকডাউনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে অর্থনীতির। সারা পৃথিবীর অর্থনীতি বগ্‌ড ডাউন হয়ে গেছে। করোনায় যত মানুষ সারা পৃথিবীতে মারা গেছে গত চার মাসে, তার চেয়ে বেশি মানুষ করোনাজনিত বগ ডাউনে না খেয়ে মারা যেতে পারে, যদি আমরা সবাই সচেতন না হই।

আজ সাদাকায়নে সবাইকে ঈদুল আজহার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ঈদ সবার জীবনে সুস্থতার আনন্দ নিয়ে আসুক। কোরবানির ঈদে আমরা যদি সত্যিকার অর্থেই আমাদের স্বার্থপরতা, অর্থগৃধ্নুতা এবং দুই লাখ টাকার গরু ২০ লাখ টাকা দিয়ে কিনে ফুটানি করার অসুস্থ মনোভাবকে কোরবানি দিতে পারি, তাহলেই আমাদের কোরবানি সার্থক হবে।

করোনাজনিত অর্থনৈতিক মন্দা এবং বন্যায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, ঈদের খরচ বাঁচিয়ে সাধ্যমতো সেই প্রতিবেশী, সেই আত্মীয়ের পাশে যদি আমরা দাঁড়াতে পারি, তাহলেই এবারের কোরবানির ঈদ আমাদের জন্যে সার্থক হবে। যথার্থ কোরবানি হবে।

ঈদ সবার জন্যে আনন্দ ও স্বস্তির সুবাতাস নিয়ে আসুক। ঈদের পর নতুন বিশ্বাস, নতুন শক্তিতে করোনার আতঙ্কমুক্ত হয়ে আমরা যেন আমাদের জীবন পুনর্গঠনে নেমে পড়তে পারি। যিনি যে অবস্থায় আছেন, যা নিয়ে আছেন, তা নিয়েই যেন ঘুরে দাঁড়াতে পারেন। কারণ যা আছে তা নিয়েই শুরু করতে হয়। যা হারিয়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে, সেদিকে তাকাবেন না। তাকাবেন সামনের দিকে—এখন আমি কী করতে পারি, কতটুকু করতে পারি, কী দিয়ে করতে পারি। তাহলে আল্লাহর রহমতের ছায়া আপনার ওপর আপতিত হবে।

কর্মীর হাত কখনো অভুক্ত থাকে না। করোনা, লকডাউন যেখানেই নিয়ে ফেলুক না কেন, সেই মাটি থেকেই আপনাকে উঠে দাঁড়াতে হবে। শুধু চিন্তা করুন আপনি কী করতে পারেন। আমি আমার জীবনে বহু মানুষকে দেখেছি যে, সোনা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সেই ছাই থেকে তারা আবার প্রাসাদ গড়েছেন। একজন-দুজন নয়, শত শত মানুষ! তাদের রহস্য হচ্ছে—তারা কারো আশায় বসে থাকে নি। যা ছিল, সেই ছাইটুকু দিয়েই শুরু করেছেন।

আমরা ভুল করে ভাগ্যকে অথবা অন্যকে দোষারোপ করি। ভাবি, অমুকে করে দেবে। তারা আসলে জীবনে কিছু করতে পারে না। কেউ করে দেয় না। আপনার কাজ আপনাকেই করতে হবে। আপনার পথও আপনাকেই চলতে হবে। নতুনভাবে জীবন শুরু করার জন্যে গত শুক্রবার আমরা মনছবির মেডিটেশন করেছিলাম। এটি অব্যাহত রাখুন। লক্ষ্য স্থির করুন। যা আছে তা নিয়েই শুরু করুন। আল্লাহর রহমত আপনার ওপর থাকবে।

ঘরে ঘরে সাদাকায়ন (অডিও) : ২৪ জুলাই ২০২০

সামাজিক সংযোগায়ন জোগায় মানসিক শক্তি

পরম করুণাময় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের কাছে শুকরিয়া আদায় করছি যে, তিনি ঈদের আগেই আরেকবার সাদাকায়নে আপনাদের সাথে একাত্ম হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। আবারো ঈদ মোবারক!

এবার কোরবানির ঈদের কথা মনে হলেই চোখের সামনে ভেসে আসছে ঈদের নতুন ফ্যাশন—অনলাইন কোরবানি।

হজ সম্পাদনকারীদের জন্যে কোরবানি অবশ্য পালনীয়। আর আমাদের জন্যে ঈদুল আজহার আনন্দ হচ্ছে কোরবানি। ছোটবেলায় কোরবানি দিতে দেখেছি। খুব সাধারণ পরিবারে, সাধারণ পরিবেশে বেড়ে উঠেছি। তখন কোরবানির ঈদের আনন্দের একটি অংশ ছিল ঈদের কয়েকদিন আগে হাট থেকে গরু নিয়ে আসা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক পরিবারে নয়, আশেপাশের আরো ছয়-সাতটি পরিবার মিলে একটি গরু কেনা হতো। সাত পরিবারের সব কিশোর-কিশোরীদের সেই গরুকে ঘিরে কত আনন্দ! গরুকে ঘাস খাওয়ানো, গোসল করানো, মালা পরানো। কোরবানির গরুকে ঘিরেই সাতটি পরিবারের এই তরুণ সদস্যদের, কিশোর-কিশোরী সদস্যদের কী একাত্মতা!

তারপর অনেক সময় পেরিয়ে গেছে।

মক্কায় ২০-২৫ লক্ষ হাজীর সমাবেশ। সেখানে ১৫-২০ লক্ষ প্রাণী জবেহ করা, গোশত খাওয়া বা বিতরণ করা কার্যত অসম্ভব। বাস্তব অসুবিধার কারণে সেখানে নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কোরবানির ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের এখানে এবার অনলাইনের নামে যে কী কোরবানি হবে, এক গরু কতজনের নামে যে কোরবানি হবে, কার কোরবানির গোশত কার কাছে

যাবে—এটা আল্লাহ আলীমুল গায়েব ছাড়া আর কারো পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

কারণ অনলাইনে অনেক কিছু হচ্ছে, যেগুলো আমাদের মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা প্রাথমিকভাবে সম্ভব নয়। আমরা বুঝি একটু পরে। যে-রকম আমাদের দেশে একটা সময় 'ডেসটিনি' নামে একটি এমএলএম প্রতিষ্ঠান ছিল। এক গাছের ছবি দিয়ে নাকি তারা হাজার জনকে মালিকানার সার্টিফিকেট দিয়েছিল। হাজার জনের কাছে ওই একটি গাছ বিক্রি করা হয়েছিল; যে, ২০ বছর বা ৩০ বছর পরে গাছটির এত মূল্য হবে! রমরমা ব্যবসা ছিল তাদের। অনেক নামিদামি ব্যক্তিরাও এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, সবটাই ছিল ধাপ্পা।

কোরবানি নিয়ে যখন চিন্তা করছি, তার মধ্যেই আরেক সতর্কতা এলো। ২১ জুলাই, 'বিডি-২৪ রিপোর্ট ডট কম' একটা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। অনলাইন প্ল্যাটফর্ম 'ই-ভ্যালি'তে কেনাকাটার বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করেছেন সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব। তিনি লিখেছেন, অনলাইন কেনাকাটায় সরকারি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় গ্রাহক হয়রানির সুযোগ থাকছে। কেনাকাটায় ১০০ শতাংশ বা ১৫০ শতাংশ ক্যাশব্যাক অফার এবং ই-ভ্যালির পণ্য বিক্রি প্রক্রিয়ার কয়েকটি ফাঁক তিনি তুলে ধরেছেন।

সচিব মহোদয়ের এই সতর্কতার জন্যে আমরা তাকে সাধুবাদ জানাই। এটি তার সরকারি দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু এই কাজটি করে জাতির প্রতি তার যে নৈতিক দায়িত্ব, সেটা তিনি সুন্দরভাবে পালন করেছেন। এর মধ্যে কী কী ফাঁকে গ্রাহক প্রতারিত হতে পারে, এটি তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার আমরা আহ্বান জানাই।

আমাদের সবারই এটা বোঝা উচিত যে, বিক্রেতা বা কোম্পানি আপনাকে পণ্যের সাথে সাথে ১০০ শতাংশ বা ১৫০ শতাংশ টাকা ফেরত দিচ্ছে! নিশ্চয়ই তিনি পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রি করে বা নিজের পকেট থেকে টাকা দিচ্ছেন না। তিনি এই কাজটি অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বা অন্য কোনো অনৈতিক উপায়ে করছেন। আমরা অধিকাংশ সময়ই তদন্ত শুরু করি যখন অনেক পানি গড়িয়ে যায়, অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ডেসটিনির ব্যাপারটিও ছিল সেই রকম। এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রতিটি কোম্পানি অনুসরণ করছে কিনা, যথাযথ কর্তৃপক্ষের তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন, যাতে সাধারণ মানুষ প্রতারিত না হয়। যারা প্রতারিত হচ্ছেন, তাদের জন্যে খুব মায়া হয়। তারা ফোকটে সবকিছু পেতে চান এবং তাদের আম-ছালা দুটোই যায়!

অতএব যারা অনলাইন কেনাকাটায় অভ্যস্ত, তাদের যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। তাদেরকে আল্লাহ যে বুদ্ধি দিয়েছেন, তা যথাযথভাবে প্রয়োগ করার আহ্বান জানাই।

আমরা কোরবানি নিয়ে বলছিলাম। যারা হজ করতে যান নি অর্থাৎ আমরা যারা দেশে আছি, আমাদের জন্যে কোরবানি হচ্ছে ঈদুল আজহার আনন্দের একটা অংশ। আর এবছর যেহেতু করোনা ও বন্যায় কোটি কোটি মানুষ অভুক্ত অবস্থায় রয়েছে, আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত ঈদের খরচ কমিয়ে সেই অর্থ নিয়ে অন্নহীনের পাশে দাঁড়ানো। পরম করুণাময় আমাদের এই মমতা দান করুন। এই মমতাই হচ্ছে সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মানবতা বিকাশের সবচেয়ে বড় শক্তি।

মানবিকতা, সামাজিকতা, সামাজিক সংযুক্তি ও একাত্মতারই প্রকাশ ঘটায় ঈদ। আশরাফ-আতরাফ, ধনী-গরিব—সব এক কাতারে একাকার। সব ধরনের বর্ণ বৈষম্যের বিলোপই হচ্ছে ঈদের লক্ষ্য। এই শ্রেণি ও বর্ণ বৈষম্যের অবসানে ঈদ এসেছিল সামাজিক সাম্যের বাণী নিয়ে। তখন বর্ণবাদীরা জন্মগত কারণেই উঁচুনিচু জাতপাত ভেদাভেদ করে নিম্নবর্ণের মানুষকে অচ্ছুৎ করে রেখেছিল। ছুঁলে বা ছায়া মাড়ালেই জাত যাবে—এই আতঙ্ক প্রচার করেছিল। তারা সফলও হয়েছিল জাতপাতের বিভেদ তৈরি করতে।

কিন্তু এখন আতঙ্কবাদীরা শুধু উঁচুনিচু বিভেদই করে নি, শুধু নিম্নবর্ণ থেকে উচ্চবর্ণকে আলাদা করে নি, করোনা আতঙ্ক প্রচার করে স্বামী-স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, মা-বাবা, দাদা-দাদি, নানা-নানি অর্থাৎ প্রত্যেকটা মানুষ থেকে প্রত্যেকটা মানুষকে বিভক্ত করেছে। বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছে।

প্রত্যেকটা মানুষকেই প্রত্যেকটা মানুষ এখন অচ্ছুৎ মনে করছে। আগে তো ছুঁলে জাত যেত। এখন আতঙ্কবাদীদের প্রচারণার ফলে তারা আতঙ্কে ভুগছে; যে, ছুঁলে, কাছে গেলে, এমনকি ছায়া মাড়ালে শুধু জাত যাবে না, জীবনও যাবে।

বিভিন্ন মিডিয়াতে চরম অমানবিকতার যে ঘটনাগুলো এসেছে, আপনারা দেখেছেন। ছেলেমেয়ে মাকে জঙ্গলে ফেলে চলে যাচ্ছে। বাবাকে রাস্তায় ফেলে যাচ্ছে—এগুলো আমরা জানি। কিন্তু এর বাইরে যে কত বিয়োগান্ত ঘটনা, কত করুণ, কত অমানবিক ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে ঘরে ঘরে, মহল্লায় মহল্লায়, ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে, তার খবর আমরা কতটুকু জানি!

এক অবসরপ্রাপ্ত কর্মজীবী নারী বলছিলেন—তার মেয়ে ও মেয়ের জামাই ডাক্তার। নাতি-নাতনিদের তিনি নিজের কাছে রেখে বড় করেছেন। করোনার সময় একদিন তার ইচ্ছে হলো যে, নাতি-নাতনিদের দেখে আসবেন। তারা তো ঘর থেকে বেরুচ্ছে না, তিনিই যাবেন। তিনি রান্না করতে পছন্দ করেন। তাদের পছন্দের খাবার রান্না করে নিয়ে গেছেন। গিয়ে দেখেন, বাড়ির গেটে তালা। ফ্ল্যাটে আছে সবাই, কিন্তু তালা কেউ খুলবে না। ওপর থেকে বলা হলো গেটের কাছে খাবার রেখে চলে যেতে। তিনি খাবার রেখে কাঁদতে কাঁদতে চলে এলেন।

৩০ বছরের বন্ধুত্ব। বন্ধু গিয়েছেন বন্ধুর বাড়িতে। সেখানেও একই অবস্থা। ছয় তলার বারান্দা থেকে হাত নাড়িয়ে বন্ধুকে বিদায় করে দিলো নিচের গেট থেকেই। আসলে কেন এমন হলো? কারা এটা করল?

একজন মুক্তিযোদ্ধার সাথে কথা হচ্ছিল। ছাত্রজীবনে তিনি প্রগতিশীল আন্দোলনের সংগঠক ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই সচেতনতার আগুন এখনো তার মধ্যে রয়েছে। খুব সাধারণ জীবনযাপন করেন। তিনি বললেন, আতঙ্কের অপপ্রচার এবং এই সামাজিক ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা-দূরত্ব সৃষ্টির পেছনে এককভাবে যদি কোনো সংগঠন দায়ী থাকে, সেটা হলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কীভাবে? তিনি বললেন, তাদের অমানবিক প্রচারণা এজন্যে দায়ী। ২৩ মে ২০২০, নিউ সায়েন্টিস্ট পত্রিকার শেষ প্রচ্ছদে ডব্লিউএইচও একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছে। বিজ্ঞাপনের দৃশ্য হচ্ছে—একটা বন্ধ দরজা। দরজার পাশে ছোট্ট কাচের জানালা দিয়ে একটি মেয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটির বয়স ছয়/ সাত বছর হবে। নিচে লেখা, Save humankind by really not getting near it.

আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, বলেন! একটা ছোট মেয়ে, ঘরে একা। কেউ তার কাছে যাবে না? তার বাবা যাবে না? তার মা যাবে না? তার ভাই, তার বোন যাবে না তার কাছে? কী পাগলামি! তিনি বললেন, বর্ণবাদীরা হাজার বছর ধরে মানুষে মানুষে জাতপাতের বিভেদ সৃষ্টি করছে। একই পরিবারের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা, দূরত্ব সৃষ্টি করা—এটা কোনো বর্ণবাদীই আজ পর্যন্ত পারে নি। কিন্তু এখন যে ভয়াবহ নিঃসঙ্গতার সৃষ্টি হয়েছে মানুষকে নিয়ে—মানুষ মানুষের কাছে যেতে ভয় পাচ্ছে, ছায়া মাড়াতে আতঙ্কে ভুগছে। এর পেছনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এ ধরনের দায়িত্বহীন কথাবার্তাই দায়ী।

খুব উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি! তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম। বললাম, আসলে আপনি তাদের আঁস্তাকুড়ে ফেলতে চাচ্ছেন? এটার প্রয়োজন নেই। তাদের কাজ যদি অযৌক্তিক হয়, মানুষের জন্যে ক্ষতিকর হয়, তাহলে তাদেরকে ইতিহাসই আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করবে।

তার সাথে আলাপ করে একটা সত্যকে নতুনভাবে উপলব্ধি করলাম, হিংস্র বাঘরূপে করোনাকে উপস্থাপন করা হয়েছিল। অথচ সেই রোগে আক্রান্ত রোগীর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আপনজনের মমতা, স্বজনের মমতা, মায়ের, বোনের, ভাইয়ের, স্বামীর, স্ত্রীর এবং সন্তানের মমতা।

পাশ্চাত্যে করোনাভাইরাসে মৃত্যুর হার যে বেশি, এর প্রধান কারণ হচ্ছে—মমতা থেকে তারা বঞ্চিত। তাদের একজনের সাথে আরেকজনের কন্টাক্ট অর্থাৎ যোগাযোগ আছে কিন্তু তারা পরস্পর সংযুক্ত নয়। তাদের মধ্যে মমতার বন্ধন নেই।

এখন থেকে সোয়া শ বছর আগে বাংলার কৃতি সাধক স্বামী বিবেকানন্দ নিউইয়র্ক ভ্রমণ করেছিলেন। তখন একজন সাংবাদিক তার কাছে এলেন। স্বামীজী খুব ভালো ইংরেজি বলতেন। তার এক বক্তৃতার উদ্ধৃতি দিয়ে সাংবাদিক জিজ্ঞেস করলেন, আপনি বলছিলেন, কন্টাক্ট এবং কানেকশন নিয়ে। কন্টাক্ট এবং কানেকশনের পার্থক্য কী, একটু যদি ব্যাখ্যা করেন। আমি দ্বিধায় আছি।

স্বামীজী একটু হাসলেন। নজর অন্যদিকে ঘুরিয়ে বললেন, আপনি নিউইয়র্কে থাকেন? বাড়িতে কে কে আছেন? সাংবাদিক ভাবলেন, তিনি প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে চাইছেন, তাই এরকম ব্যক্তিগত প্রশ্ন করছেন। তবুও বিরক্তি চেপে রেখে সাংবাদিক বললেন, মা মারা গেছেন। বাবা আছেন। আর তিন ভাই ও এক বোন। সবাই বিবাহিত।

স্বামীজী মৃদু হেসে বললেন, বাবার সাথে শেষ কবে কথা হয়েছে? সাংবাদিক বললেন, মাসখানেক হবে। স্বামীজী জিজ্ঞেস করলেন, ভাইবোনের সাথে দেখা হয়? শেষ কবে ফ্যামিলি গেট-টুগেদার হয়েছে?

সাংবাদিক অনেকটা অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, দুবছর আগে ক্রিসমাসের সময়। সবাই দুদিন একসাথে কাটিয়েছি। স্বামীজী জিজ্ঞেস করলেন, বাবার পাশে বসেছিলেন কতক্ষণ? আপনারা কি একসাথে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার করেছিলেন? মা মারা যাওয়ার পর আপনার বাবা কীভাবে সময় কাটাচ্ছেন জিজ্ঞেস করেছিলেন?

সাংবাদিকের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। স্বামীজী এবার তার হাত ধরে বললেন, আমি দুঃখিত! আপনাকে অজান্তে আঘাত দিয়ে থাকলে। আসলে এটাই আপনার প্রশ্নের উত্তর। বাবার সাথে আপনার কন্টাক্ট, মানে যোগাযোগ আছে কিন্তু কানেকশন নেই, একাত্মতা নেই। কানেকশন, একাত্মতা, সংযুক্তি—এটা হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের হয়। একসাথে বসা, খাবার ভাগাভাগি করে খাওয়া, একে অপরের খেয়াল রাখা, স্পর্শ করা, একসাথে সময় কাটানোর মাধ্যমে হয়। আপনাদের সব ভাইবোনের মাঝে যোগাযোগ আছে কিন্তু কানেকশন নেই, একাত্মতা নেই, সংযুক্তি নেই।

সাংবাদিক চোখ মুছে বললেন, আপনার এই অবিস্মরণীয় শিক্ষার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।

আসলে এসময় একজন অসুস্থ মানুষের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন স্বজনের মমতা। সমাজে কিছু কিছু অমানবিকতার ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু অজস্র মানবিকতার ঘটনা আমাদের চারপাশে রয়েছে। মায়ের করোনা হয়েছে। দুই ছেলে মাকে সেবা করেছে ঘরে রেখে। মাকে হাসপাতালে আইসোলেশনে নিয়ে যেতে দেয় নি। অক্সিজেন সিলিন্ডার ঘরে নিয়ে এসেছে। ওষুধপথ্য ইনজেকশন ঘরে নিয়ে এসেছে। যা যা যত্নের প্রয়োজন, তারাই করেছে। মা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। অথচ দুই ছেলের কেউই করোনায় আক্রান্ত হয় নি।

মেয়ে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। বাবা তার সেবা করেছেন। বাবার মধ্যেও করোনার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। মেয়ে সুস্থ হয়েছে, বাবাও সুস্থ হয়েছেন। আসলে আইসিইউ-এর সেই নির্জন প্রকোষ্ঠে নিঃসঙ্গ মানুষকে দেখার কেউ নেই। তার হাত ধরার কেউ নেই। তাকে মমতার বাণী শোনানোর কেউ নেই। আমার পাশে কেউ নেই, পানি দেয়ার কেউ নেই, দেখার কেউ নেই, মা বলার কেউ নেই, বাবা বলার কেউ নেই, কেমন আছ জিজ্ঞেস করার কেউ নেই! নিঃসঙ্গতার এই জ্বালা, এই হাহাকার দোজখের শাস্তির চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

আমাদের দেশেই হাসপাতালগুলো করোনা-রোগীশূন্য হয়ে গেছে। মানুষ এখন বাসায় স্বজনের মমতাপূর্ণ সেবা পাচ্ছে। এই মমতা, এই মানবিকতা বাঙালির সবচেয়ে বড় শক্তি। স্বজনের মমতা সবসময়ই রোগীর রোগ নিরাময় ক্ষমতা কার্যকরী করার সবচেয়ে বড় অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। যত আমরা স্বজনের মমতা নিয়ে করোনা রোগীর পাশে দাঁড়াব, করোনা তত আমাদেরকে স্যালুট করবে। আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাবে।

এবারের ঈদ শুধু যোগাযোগের নয়, একাত্মতার ঈদ হোক। ঈদে আপনজনের ঘরে যাবেন। তাদের সাথে দেখা করবেন। তাদেরকে মমতা দেবেন, বিশ্বাস ও আস্থা জোগাবেন; যে, আমরা আছি একসাথে।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে আমরা সবাই একসাথে লড়েছিলাম। একইভাবে করোনাকেও আমরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে ঝেঁটিয়ে বিদায় করব আমাদের দেশ থেকে—পরস্পরকে মমতা দিয়ে, তাদের পাশে দাঁড়িয়ে, উদ্বুদ্ধ করে, স্বাস্থ্য-সুরক্ষার নীতিমালা অনুসরণে সহযোগিতা করে। নিজের এবং অন্যের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কীভাবে বাড়ে, সেটা সবাইকে বোঝাতে হবে। সবার সাথে একাত্ম হতে হবে। সাহস দিতে হবে। ভরসা দিতে হবে।

যত আপনি নিঃসঙ্গ থাকবেন, একা থাকবেন, তত আপনি শক্তিহীন। যত সঙ্ঘে থাকবেন, সমাজের সাথে থাকবেন, সামাজিক নৈকট্য অনুভব করবেন, সমাজকে ভালবাসবেন, প্রতিবেশীকে ভালবাসবেন, মানুষের পাশে দাঁড়াবেন, অসুস্থের পাশে দাঁড়াবেন, তত আপনি ভালো থাকবেন ইনশাআল্লাহ!

স্বামী বিবেকানন্দ সুস্পষ্টভাবে কথাটি বলেছিলেন, কন্টাক্ট ও কানেকশন এক নয়। তাই শুধু যোগাযোগ নয়, আমাদের একাত্ম হতে হবে সমাজের সাথে, মানুষের সাথে। দাঁড়াতে হবে প্রতিটি দুস্থের পাশে। তাহলেই ঈদ আমাদের জন্যে সত্যিকারের সার্থকতা নিয়ে আসবে। ঈদের পরে আমরা নতুনভাবে আমাদের জীবন শুরু করতে পারব।

সবাইকে আবারো সামাজিকভাবে সবার সাথে একাত্ম হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। এবারের ঈদ সত্যিকার সামাজিকায়নের ঈদ হয়ে উঠুক—এটাই আমরা কামনা করছি। সবাই ভালো থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।

ঘরে ঘরে সাদাকায়ন (অডিও) : ৩১ জুলাই ২০২০

সাফল্য ও কল্যাণের জন্যেই ব্যয় করব দিনের প্রতিটি মুহূর্ত

আজ সাদাকায়নের আলোচ্য বিষয় আপনারা জানেন—*সাফল্য ও কল্যাণের জন্যেই ব্যয় করব দিনের প্রতিটি মুহূর্ত*। অনেকগুলো পয়েন্ট। সাফল্য এবং কল্যাণ, তারপরে আমার দিন। কোনটা আমার দিন? কোনটা অন্যের দিন? এটা শনাক্ত করা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে, আপনার দিন কোনটা? What is your day? যখন আপনি কিছু করতে পারেন।

গতকাল আপনার দিন আর নেই। আগামীকালও আপনার দিন নয়। আপনার দিন হচ্ছে আজ, এই মুহূর্ত। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে আমরা এ নিয়ে আলোচনা করি সূরা আর রাহমানের একটি আয়াতের অংশ উদ্ধৃত করে—'কুল্লা ইয়াওমিন হুয়া ফি শান ...' আল্লাহ বলছেন, 'সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে আমার মহিমা নব নবরূপে দীপ্যমান। তোমরা আমার কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?'

অর্থাৎ Every moment has it's own quality। সময় সম্পর্কে এর চেয়ে পরিষ্কার, অর্থবহ সংজ্ঞা আর কোথাও আছে কিনা আমার জানা নেই।

যারা জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে চর্চা করেছেন তারা জানেন যে, মহাবিশ্বে সবকিছুই গতিশীল। যখনই কোনোকিছুর গতি থাকে, তখন সেটা সারাবিশ্বে একটা প্যাটার্ন সৃষ্টি করে, কনফিগারেশন তৈরি করে।

এটা ওখানে গেল, ওটা ওখানে গেল ... এই এঙ্গেলগুলো সবসময়ই পরিবর্তনশীল। কোনো এঙ্গেল, কোনো কনফিগারেশন মহাবিশ্বে দ্বিতীয় বার ঘটবে না। অর্থাৎ সময়টা এত মহিমান্বিত! এত ভ্যারাইটিজ সময়ের মধ্যে!

সাফল্য এবং কল্যাণ কী? ধরুন, আপনি একটা সার্ভিসে ঢুকলেন। আপনি এমডি হয়ে গেলেন, সচিব হয়ে গেলেন, এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট হলেন, বিশাল ব্যবসায়ী হলেন। এটুকুই কি সাফল্য এবং কল্যাণ? আপনি রিটায়ার করলেন এমডি হিসেবে, হারিয়ে গেলেন। সচিব হিসেবে রিটায়ার করলেন, হারিয়ে গেলেন। তারপর হয়তো বেঁচে ছিলেন আরো ১০ বছর, ১২ বছর, ১৫ বছর। কেউ আপনার প্রয়োজন অনুভব করল না।

আবার কতটুকু সম্পদ হলে আপনি খুশি হবেন? ধরুন, একজন শোকরগোজার মানুষের যদি বসবাসের মতো একটা ঘর থাকে, ঘরে খাবার থাকে, কারো কাছে চাইতে না হয়, তাহলেই সে তৃপ্ত। আবার এমন উদাহরণও আছে—একজনের সম্পদ ১৫ লক্ষ কোটি টাকা কমসে কম। করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সময় কেউ তার প্রয়োজন অনুভব করে নি। এমনকি তার ছেলেমেয়েরাও নয়। এটা কি সাফল্য? এটা কি কল্যাণ?

তাহলে সাফল্য কী? কল্যাণ কী?

চীনের একটা প্রাচীন গল্প। একজন কর্মকার। কর্মকার কাকে বলা হয়? লোহার কামার। বয়স ৯০ বছর। তার যখন ২৩ বছর বয়স, তখন থেকে চীনের সম্রাটের জন্যে তিনি তরবারি তৈরি করতেন। সম্রাট খুব সন্তুষ্ট ছিলেন যে, তার কর্মকার নিখুঁত তরবারি বানাতে পারে। যেমন : কাপড় সেলাই করতে পারে অনেকেই। কিন্তু সবার সেলাই ফ্যাশন হয় না, ডিজাইন হয় না। সব পোশাক পরে আরাম বোধ হয় না। কে সবচেয়ে ভালো ডিজাইনার? যার তৈরি পোশাক পরে আরেকজন তৃপ্তি পায় যে, এটা ফিট। আমি এটা পরে কমফোর্টেবল। সম্রাটও সেভাবে কর্মকারের তরবারিতে সন্তুষ্ট।

সম্রাট মারা গেলেন। এরপর তার ছেলে সম্রাট হলেন। তিনিও সন্তুষ্ট। এরপর নাতি সম্রাট হলেন। কর্মকারের বয়স তখন ৯০ বছর। নাতিও তার তরবারি দেখে সন্তুষ্ট। অর্থাৎ তিন প্রজন্মের সম্রাট তার প্রয়োজন অনুভব করেছেন; যে, তরবারি বানাতে হলে এই বৃদ্ধ কর্মকারের কাছে যেতে হবে। এটা হচ্ছে সাফল্য। যখন মৃত্যুর আগেও মানুষ আপনার প্রয়োজন অনুভব করবে। মনে করবে যে, আরো কিছুদিন যদি বেঁচে থাকত! তিনি একটু ভালো থাকুক। ভালো থাকলে আমি তার কাছ থেকে উপকৃত হতে পারব।

সম্রাট তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, এই বয়সেও আপনার এত নিখুঁত তরবারি বানানোর রহস্যটা কী? প্রভু কি আপনাকে কোনো বিশেষ মন্ত্র দিয়েছেন? তিনি হাসলেন। বললেন, মহামান্য সম্রাট! কোনো গোপন রহস্য

বা বিশেষ মন্ত্র নেই। 'রহস্য' একটাই। আমি তরবারি বানাতে শেখার পরে যেদিন প্রথম বানালাম, সেদিন যতটুকু মনোযোগ দিয়ে, মনপ্রাণ ঢেলে আমি তরবারি বানিয়েছি, আজকেও ততটুকু মনপ্রাণ ঢেলেই আমি তরবারি বানাই। গত ৬৬/৬৭ বছরে আমার মনোযোগ তরবারির বাইরে যায় নি। আমি তরবারির মধ্যেই ডুবে ছিলাম। প্রতিনিয়ত চিন্তা করেছি যে, আমার তরবারিটা আরেকটু ভালো কীভাবে হতে পারে।

আসলে অধিকাংশ মানুষ ব্যর্থ হয় কেন? কারণ সে লক্ষ্যের বিপরীত কাজগুলোর মধ্যে ডুবে যায়।

আমরা যখন তরুণ ছিলাম, তখন যে সিনেমা দেখি নি বা সিনেমা হলে যাই নি, এটা বললে কী হবে? ডাঁহা মিথ্যা। তখন 'বোয়িং বোয়িং' নামে একটা মুভি ছিল। কেন মুভিটা আমার মনে দাগ কেটেছে? মানুষ যে এরকম আহাম্মক হতে পারে, সেই সিনেমার নায়ককে দেখে প্রথম বুঝলাম।

নায়ক হচ্ছে রিপোর্টার। আমি একসময় রিপোর্টার ছিলাম। ভাবলাম, আচ্ছা, নায়ক রিপোর্টার—মুভিটা দেখি তো! সে ছিল এভিয়েশন রিপোর্টার। বিমানবালাদের সাথে দেখাসাক্ষাৎ হয়। একজনকে তার খুব ভালো লাগে। তার সাথে যাচ্ছিল একদিকে, অন্য দিক দিয়ে আরেকজন বিমানবালা আসছে। তাকে দেখেও ভালো লেগে গেল। প্রথমজনকে বাদ দিয়ে নায়ক দ্বিতীয় জনের পেছন পেছন হাঁটা শুরু করল! অর্থাৎ তার জীবনে কোনো স্থিরতা ছিল না।

লক্ষ্যের বিপরীত অনেক চাকচিক্য সামনে আসবে। প্রত্যেকের সামনেই আসে। এমন কোনো মানুষ নেই যার সামনে লক্ষ্যের বিপরীত চাকচিক্য আসে না। যেমন : আপনি চাচ্ছিলেন একটা চাকরি। ভাবছেন যে, এই জব হলে আমার জন্যে ভালো হতো। জব এলো। দেখা গেল, নতুন জব পাওয়ার পর পরই এর চেয়ে বেটার অফার চলে এসেছে এন্ড ইউ বিকেম কনফিউজড; যে, এটা করব, না ওটা করব? যে মুহূর্তে আপনি কনফিউজড হলেন, সেই মুহূর্তে ইউ আর গন কেস। আপনি হেরে গেলেন। ইউ মাস্ট বি ডিটারমাইন্ড।

অনেক পুরুষ বা মহিলা বিয়ে করতে পারে না। কেন? একজনকে দেখে ভালো লাগল। বিয়ের জন্যে পাত্র বা পাত্রী দেখার মধ্যে কোনো দোষ নেই। তিনি মোটামুটি ডিসাইডেড ছিলেন। এর মধ্যে আরেকটা প্রস্তাব এলো। প্রত্যেকের ভালো তো আলাদা আলাদা। তাকেও ভালো লাগল। কনফিউজড হয়ে গেলেন। তিনি হেরে গেলেন। হি অর শি ইজ আ গন কেস। অর্থাৎ যদি লক্ষ্যের বিপরীত কোনোকিছুর সাথে জড়িয়ে যান, তাহলে হেরে যাবেন।

মির্জা গালিব গজল লিখতেন। গালিবের গজল উর্দু ভাষায় খুব বিখ্যাত। ওনার একটি গজল হচ্ছে, 'যাচ্ছিলাম মসজিদের দিকে। গিয়ে দেখি, পৌঁছেছি এক পানশালায়'। একটা সভ্যতার পতন এ কারণে হয়। গালিব মোঘলদের শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ-র সময়কার কবি। আপনি মসজিদের জন্যে রওনা দিয়ে যদি পানশালায় চলে যান, কী হবে? পতন হবে। আমাদের ২০০ বছরের গোলামির ইতিহাস এই কারণেই।

যদি মসজিদের দিকে যান, লক্ষ্যটা মসজিদেই থাকতে হবে। পানশালায় গিয়ে উঠলে ভাগ্যের দোষ দেবেন, যে—আমার কপাল খারাপ! যাচ্ছিলাম মসজিদে, গিয়ে উঠেছি পানশালায়! আপনার কপাল খারাপ না, আপনার চরিত্র খারাপ। আমার কথাটা একটু খারাপ মনে হতে পারে যে, গুরুজী এরকম চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুললেন! আসলে আমরা কপালের দোষ দেই। কপালের দোষ না, দোষ হচ্ছে কর্মের। আপনি মসজিদে যাচ্ছেন, মসজিদে যাবেন। মন্দিরে যাচ্ছেন, মন্দিরে যাবেন। পানশালায় কেন যাবেন? আপনি গিয়ে উঠলেন পানশালায়! অধিকাংশ মানুষের জীবনে ব্যর্থতার কারণ এটাই।

আমরা প্রজ্ঞা জালালি-তে হেরম্যান হেসকে নিয়ে আলোচনা করি। তারুণ্যে আমার খুব প্রিয় ঔপন্যাসিক ছিলেন তিনি, যার একটি বই হচ্ছে *সিদ্ধার্থ*। বইটির নায়ক সিদ্ধার্থের মুখ দিয়ে লেখক কিছু কথা বলিয়েছেন। তার মধ্যে কয়েকটি পয়েন্ট খুব চমৎকার। উপন্যাসের নায়িকা হচ্ছে কমলা। এ যুগে হলিউডের নায়িকাদের যেমন সম্মান, কমলার সম্মানও সেরকম। তেমনই তার ভক্ত প্রতাপ অর্থবিত্ত। সিদ্ধার্থের তাকে পছন্দ হয়ে গেল।

সিদ্ধার্থ খুব সাধারণ একজন গৃহত্যাগী শ্রমণ। কমলা খুব তাচ্ছিল্যের সাথে তাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার কী আছে? সে বলল, আমার তো কিছু নাই। তবে একটি গুণ আমার আছে। আমি যখন লক্ষ্য স্থির করি, লক্ষ্যের বিপরীত কোনোকিছুকে আমি প্রশ্রয় দেই না। যে-রকম একটা পাথর যদি পানিতে ফেলে দেয়া হয়, পাথর যে-রকম সরাসরি তলদেশে—তার লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছায়, এদিক-ওদিক তাকায় না। একজন শ্রমণও যখন লক্ষ্য স্থির করে, সে কোনোদিকে তাকায় না। ফলে সে তার লক্ষ্যে পৌঁছবেই। অতএব বুঝতেই পারছ ...

সিদ্ধার্থের সাফল্যের পেছনে রহস্য ছিল এটাই। আপনি যখন লক্ষ্য স্থির করবেন, যখন মনছবি স্থির করবেন, তখন কোনোকিছুই যেন আপনার লক্ষ্যকে বিচ্যুত করতে না পারে। যেভাবে একটি পাথর পানিতে ফেলে দেয়া

হলো। পানিকে যদি জীবন ধরেন, আয়ুষ্কাল ধরেন তো আপনার গন্তব্যটা কোথায়? তলদেশ। একেবারে তলদেশে গিয়ে পৌঁছবেন লক্ষ্য অনুসারে।

আপনি যদি ডোবায় থাকেন তো ডোবার তলদেশে, যদি নদীতে থাকেন তো নদীর তলদেশে। আর যদি সমুদ্রে থাকেন তো সমুদ্রের তলদেশে না পৌঁছানো পর্যন্ত অন্য কোনোদিকে তাকাবেন না।

আলহামদুলিল্লাহ! আমরা যখন যে লক্ষ্য স্থির করেছি, অন্য কোনোকিছু দিয়ে লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার কোনো সুযোগ দেই নি। আমরা শুরুতে বলছিলাম, আপনার দিন কিন্তু এই মুহূর্তটা! আপনি জানেন না এর পরের মুহূর্তে আপনার জন্যে কী অপেক্ষা করছে। অর্থাৎ সময়ের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগাতে হবে। লক্ষ্যের বিপরীত সবকিছু এড়িয়ে চলতে হবে।

চারপাশে যত সফল মানুষ আছেন—ধরুন, কবিগুরুর কথা। আমরা যখন তরুণ ছিলাম, তখন তরুণরা ভাবত—আমাদের আধুনিক হতে হবে। এজন্যে কবিগুরুকে পড়তে হবে। তারা কবিগুরুকে মোটামুটি ধর্মকর্ম থেকে সম্পর্কহীন বানিয়ে ফেলল। আমি কবিগুরুর লেখা পড়তে গিয়ে দেখলাম, আরে! উনি তো মহা ধার্মিক ছিলেন। তার *গীতাঞ্জলি*র পুরোটাই হচ্ছে স্রষ্টাবন্দনা—'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে ...!' আধুনিকতা করার জন্যে যদি রবীন্দ্রনাথকে পড়তে হয়, তাহলে কী করতে হবে? মাথা নত করতে হবে তাঁর চরণ ধুলার তলে। সমর্পিত হতে হবে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সময়কে কীভাবে কাজে লাগাতে হয়, বাঙালির জীবনে তিনি ছিলেন এর মডেল। প্রতিদিন প্রত্যুষে উঠতেন এবং আধাঘণ্টা ধ্যান ও প্রার্থনা করতেন। তারপর লিখতে শুরু করতেন। ৭টা পর্যন্ত লিখতেন। নাশতা সেরে বেলা ১১টা পর্যন্ত লিখতেন। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর তার গড়াগড়ি দেয়ার অভ্যাস ছিল না। সেসময়টা তিনি কাজে লাগাতেন বই ও পত্রিকা পড়ে, সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সাক্ষাৎ দিয়ে। সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে রাতের খাবার খেয়ে নিতেন এবং রাত ১২টা পর্যন্ত একটানা লিখতেন। যে কারণে তার এত লেখা! জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি কাজ করে গেছেন।

তাহলে কী করতে হবে? করণীয়টা কিন্তু খুব সহজ।

আপনি এমডি হলেন, সচিব হলেন, চিফ এক্সিকিউটিভ হলেন—এটা সাফল্যের একটা অংশ। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যদি মানুষ আপনার প্রয়োজন অনুভব করে, তাহলে বুঝতে হবে আপনি সফল হয়েছেন। আপনি কল্যাণের অধিকারী হয়েছেন। বরকতের অধিকারী হয়েছেন।

সময়টা কী? প্রতিটি মুহূর্ত। প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগাতে হবে। আজকের দিনটাকে কাজে লাগাতে হবে। এজন্যে (এক নম্বর) জীবনে লক্ষ্য স্থির করতে হবে এবং কেন বাঁচবেন—এই প্রশ্নের উত্তরটা আপনার কাছে পরিষ্কার থাকতে হবে।

কোয়ান্টাম ল্যাবে আমাদের একজন সহকর্মী ছিলেন—কানিজ ফাতেমা রুমা। রুমা অফিসে আসছিলেন। শান্তিনগর মোড়ে এক্সিডেন্ট হলো। লোকাল বাস তার কোমরের ওপর দিয়ে চলে গেল। বুঝতেই পারছেন, একটা বাস কোমরের ওপর দিয়ে চলে যাওয়া মানেটা কী! লোকজন এসে যখন তাকে ধরছে, তার প্রথম কথা হচ্ছে, আমাকে শান্তিনগর ল্যাবে নিয়ে যান। আমি ওখানে কাজ করি। ৯টা বাজার পাঁচ মিনিট বাকি আছে!

অর্থাৎ সেই মুহূর্তেও রুমা তার কর্তব্যের কথা ভোলেন নি। লক্ষ্যের কথা ভোলেন নি। তার লক্ষ্য ছিল এই সময়ে আমাকে শান্তিনগরে ল্যাবে যেতে হবে। লোকজন যখন তাকে ল্যাবে নিয়ে এলো তখন ৯টা বাজতে এক মিনিট বাকি। কারণ আমাদের এই সহকর্মীরা ৯টার মধ্যে ল্যাবে ঢোকে। রুমার এই লক্ষ্যপ্রিয়তার জন্যেই তার মৃত্যুর পরেও আমরা তাকে স্মরণ করছি। কারণ যে মানুষ তার লক্ষ্যে অবিচল থাকে, সে স্মরণীয় হয়।

(দুই নম্বর) দিনের কাজের একটি তালিকা তৈরি করতে হবে। রুটিন তৈরি করতে হবে। রুটিনটা সহজ হোক, কিন্তু রুটিন অনুসরণ করতে হবে। আমরা মিনিট সেকেন্ড ধরে খুব টাইট রুটিন করি। এটা শয়তানি ফাঁদ। শয়তান আপনাকে দিয়ে এত কঠিন রুটিন করাবে, যাতে আপনি অনুসরণ করতে না পারেন। তাই রুটিন সহজ করবেন কিন্তু মেনে চলবেন।

(তিন নম্বর) দীর্ঘসূত্রিতায় জড়াবেন না। এই সময়কে কাজে লাগাতে হবে। অর্থাৎ যে-কাজ আগামীকাল করবেন মনে করছেন, সেই কাজ আজই করুন। অপ্রয়োজনীয় কাজ এবং কথাকে 'না' বলুন। দীর্ঘসূত্রিতা দূর করার জন্যে আমাদের *আত্মনির্মাণ* বইয়ে চমৎকার কিছু পয়েন্ট আছে।

আমরা অনেকেই বলি, সময় নেই!

সময় আছে। যে-রকম বাণীবাহকেরা প্রোগ্রামে ১০ মিনিট আগে আসুক, এটা আমি পছন্দ করি। এজন্যে আমি ১০ মিনিট আগে এসেছি। নিজে আগে না এসে তো বলতে পারি না! অন্যথায় বাণীবাহকেরা বলতেন, গুরুজী তো আমাদের বললেন ১০ মিনিট আগে আসতে। কিন্তু উনি নিজেই কোনোরকম দৌড়াতে দৌড়াতে এসে মঞ্চে উঠে আলোচনা শুরু করে দিলেন।

যে কাজটা আপনি মনে করছেন যে, কালকে করব, সেটা আজই করুন। যে কাজটা ভাবছেন আজ করবেন, সেটা এখন করুন। তাহলে দীর্ঘসূত্রিতা আপনাকে আটকাতে পারবে না।

(চার নম্বর) অপ্রয়োজনীয় কাজ এবং কথাকে 'না' বলতে শিখুন। এটা আমারও ছিল। আমি আগে 'না' বলতে পারতাম না। যার ফলে খুব বিপদে পড়তাম। এখন অনায়াসে প্রথমেই বলে ফেলি যে, ভাই/ আপা, বাবা/ মা, এটা আমার দ্বারা হবে না। অর্থাৎ যেটা ১০ দিন পরে 'না' বলবেন, যেটা আপনি করবেন না, সেটা কখনো ঝুলিয়ে রাখবেন না। প্রথম সুযোগেই বিনয়ের সাথে বলবেন যে, এটা তো আমি পারব না।

(পাঁচ নম্বর) গীবতের মধ্যে জড়াবেন না। আমাদের অধিকাংশের জীবনে গীবত হচ্ছে চানাচুরের মতো। আহ! ঝাল ঝাল লাগে! তাই এটা থেকে আমরা বেরোতে পারি না। গীবত হচ্ছে সবচেয়ে বড় সময়খাদক। আর গীবতকারীর দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনাও কমে যায়।

ইমাম আবু হানিফা (রহ)। দ্য গ্রেট ইমাম। তার কথা বলতে গেলে তো পুরো দিন পার হয়ে যাবে। তাকে ইতিহাসের দুজন বিখ্যাত ব্যক্তি সম্পর্কে একজন জিজ্ঞেস করলেন যে, এদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? দুজনই পরিচিত এবং সে-সময়ের আলোচিত ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব।

ইমাম হেসে বললেন, দেখ বাপু, আমার ধারণা এ দুজনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এ নিয়ে শেষবিচারের দিনে আল্লাহ আমাকে প্রশ্ন করবেন না। আমাকে প্রশ্ন করবেন আমার কাজ নিয়ে। তোমাকেও প্রশ্ন করা হবে তোমার কাজ নিয়ে। ওই দুজনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তা বিচারের ভার তোমাকে আল্লাহ দেন নি। অতএব এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে সময় নষ্ট কোরো না; বরং নিজ ভুলত্রুটি, নিজের দোষগুলো দেখ। নিজের ভুলত্রুটি ও দোষ কমানো আর গুণগুলোকে বিকশিত করার পেছনে মনোযোগ দাও এবং সময় ব্যয় করো।

অপ্রয়োজনীয় কাজ, যেমন : গীবত, লক্ষ্যের বিপরীত দিকে মনোযোগ দেয়া ইত্যাদি থেকে বিরত থাকুন। প্রতিটি মুহূর্ত নিজ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে ব্যয় করুন। এটাই জীবনে সাফল্য ও কল্যাণ নিয়ে আসবে।

সাদাকায়ন : ২৮ আগস্ট ২০২০; কোয়ান্টামম

শিশুরা করোনায় আক্রান্ত হলে যতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তার চেয়ে বেশি ক্ষতি হবে স্কুলে না গেলে

প্রিয় সুহৃদ! আগস্ট মাস থেকে আমাদের সেন্টার/ শাখা/ সেল/ প্রি-সেল—সর্বত্র আবার সাদাকায়ন শুরু হয়েছে। এজন্যে পরম করুণাময়ের কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সবটাই তাঁর দয়া, তাঁর করুণা।

২০২০ সালকে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন বাস্তব সামাজিক যোগাযোগের বছর হিসেবে ঘোষণা করেছিল। কারণটা পরিষ্কার। ২০১৯ সালে চীনের উহানে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঘটে। পাশ্চাত্যেও যখন এর বিস্তার ঘটতে থাকল, তখনই আমরা ধারণা করেছি—করোনা আতঙ্কের গুজব তুলে পুঁজিবাদ ও ধর্মহীনতায় বিশ্বাসীরা পৃথিবীজুড়ে মানুষকে একাকী, সমাজবিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ করার চেষ্টা চালানোর কোনো ত্রুটি করবে না। চেষ্টার ত্রুটি তারা করেও নি। সুযোগটি তারা কাজে লাগিয়েছে বেনিয়া স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে।

বিষয়টি সম্পর্কে আঁচ করতে পেরে প্রথম থেকেই বাস্তব সামাজিক যোগাযোগ বাড়ানোর জন্যে আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। করোনাকালে সরাসরি যোগাযোগ অনেক ক্ষেত্রে সম্ভবপর না হলেও আমরা আমাদের সদস্য ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সংযুক্ত রাখার, একাত্ম রাখার, ইতিবাচক তথ্যে সমৃদ্ধ করার এবং অসার-অর্থহীন ভয়-আতঙ্ক দূর করার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়েছি।

পাশ্চাত্যের চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা এই বাস্তব সত্যকে উপলব্ধি করছেন। সমাজবিচ্ছিন্নতার ক্ষতিকর প্রভাব পারিবারিক সম্পর্কের ওপর, ব্যক্তি মানসের ওপর, তার স্বাস্থ্য ও ইমিউন সিস্টেমের ওপর পড়ছে। সেটা সম্পর্কে প্রচুর গবেষণা করে তারা এখন দৃঢ়ভাবে বলছেন, আন্তরিক সামাজিক যোগাযোগ মানুষকে সুস্থ ও সুখী রাখে, দীর্ঘজীবী করে।

বিজ্ঞানীদের সাপ্তাহিক সাময়িকী নিউ সায়েন্টিস্টের ১২ আগস্ট ২০২০ সংখ্যায় এ সম্পর্কে সর্বশেষ গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, A lack of social connection presents as large a risk to our health as obesity or smoking up to 15 cigarettes a day. অর্থাৎ মেদস্থূলতায় অথবা দিনে ১৫টি সিগারেট খেলে স্বাস্থ্যের ওপর যে পরিমাণ ঝুঁকি সৃষ্টি হয়, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা একজন মানুষের শরীরের ওপর সে-রকম ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে। মেদস্থূলতা ও ধূমপানের চেয়েও বেশি ভয়ংকর হলো সামাজিক মেলামেশার অভাব।

আমাদের দেশে যারা করোনায় মারা গেছে, তাদের পরিসংখ্যান যদি দেখি—স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এক প্রতিবেদনে প্রকাশ করেছে : বাংলাদেশে গত দেড় মাসে (১৫ জুলাই–৩০ আগস্ট) কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে যারা মারা গেছেন, তাদের ৬৬ শতাংশের ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপের মতো কো-মরবিডিটি ছিল। *[বণিক বার্তা, ৩ সেপ্টেম্বর ২০২০]* এসময়ে যারা মারা গেছে, তাদের আট শত ৪৫ জনের কো-মরবিডিটি স্ট্যাটাস বিশ্লেষণ করা হয়েছে প্রতিবেদনে।

প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, মৃত্যুবরণকারীর মধ্যে ডায়াবেটিসের জটিলতায় ভুগছিল ৩৮ শতাংশ, ২৮ শতাংশ রোগীর মধ্যে উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা ছিল। হার্টের রোগে ভুগছিল ১১ শতাংশ। এ-ছাড়া আট শতাংশ কিডনি রোগে, তিন শতাংশ স্ট্রোক ও অ্যাজমা রোগের জটিলতায় ভুগে মারা যায়। নয় শতাংশ মৃত্যুবরণকারীর মধ্যে অন্যান্য রোগের লক্ষণ ছিল। অর্থাৎ ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, কিডনি রোগে মৃত্যু হয় মোট করোনা মৃতের ৮৫ শতাংশের।

দোষ রক্তচাপেরও হলো না, ডায়াবেটিসেরও হলো না, হৃদরোগ বা কিডনি রোগেরও হলো না। দোষ হলো কার? করোনার। ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ মূলত অসুস্থ জীবনাচারের পরিণতি। অধিকাংশের ক্ষেত্রেই, যারা সুস্থ জীবনাচার অনুসরণ করে নি, তারা এই রোগগুলোতে আক্রান্ত হয়।

করোনার ভয়টা কী রকম?

ইবনে সিনা ছিলেন খুব বড় একজন চিকিৎসাবিজ্ঞানী। ইবনে সিনার *ক্যানন অব মেডিসিন* ইউরোপে ৫০০ বছর মেডিকেল টেক্সট বই হিসেবে পড়ানো হতো। চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক বলা যায় তাকে।

তিনি একটা গবেষণা করেছেন। তিনটা খাঁচা। একটা খাঁচায় একটা হায়েনাকে রাখা হয়েছে। আর বাকি দুটো খাঁচায় দুটো মেষশাবক অর্থাৎ ভেড়ার বাচ্চা। খাঁচা তিনটির অবস্থান দূরে দূরে। এক নম্বর খাঁচার মেষশাবকটি দুই নম্বর খাঁচায় রাখা হায়েনাকে দেখতে পায়। আর তিন নম্বর খাঁচায় যে মেষশাবককে রাখা হয়েছে, সে হায়েনাকে দেখতে পায় না। হায়েনাটিকে নিয়ে তার কোনো চিন্তাও নেই।

প্রথম খাঁচার মেষশাবকটি প্রতিনিয়তই হায়েনাকে দেখে। হায়েনা তার কাছে আসতেও পারে না, ধরতেও পারে না। কিন্তু দেখা গেল, মাসখানেকের মধ্যে এই মেষশাবকটির খাওয়াদাওয়া কমে যেতে লাগল। কমতে কমতে শুকিয়ে সে মারাই গেল।

তিন নম্বর খাঁচার মেষশাবক—হায়েনাকে যেটা দেখে নি, সে কিন্তু দিব্যি সুস্থ। অথচ প্রথম খাঁচার মেষশাবককে হায়েনা কিছুই করে নি। মেষশাবকটি শুধু হায়েনাটাকে দেখেছে। কিন্তু ভয়ে-আতঙ্কে, দুশ্চিন্তায় সে মারা গেছে।

আপনারা বলুন তো—হরিণ বাঘ শিকার করে, না বাঘ হরিণ শিকার করে? বাঘ হরিণ শিকার করে। হরিণের গতি বেশি, না বাঘের গতি বেশি? হরিণের। তাহলে বাঘ হরিণকে ধরে কীভাবে? সব হরিণ কিন্তু ধরা পড়ে না। ধরা পড়ে একটা। কেন ধরা পড়ে? প্রথমত : হরিণ মনে করে যে, বাঘ তার চেয়ে শক্তিশালী। দ্বিতীয়ত : ভয়। সে ভাবতে থাকে, এই বুঝি বাঘ আমাকে ধরে ফেলল। যার মধ্যে ভয় বেশি, সে বার বার পেছনে তাকায়। পেছনে তাকানোর ফলে কী হয়? তার গতি কমে যায়। যত বার পেছনে তাকায়, গতি তত কমে যায়। বাঘ হরিণকে ধরে ফেলে। কিন্তু যে হরিণ পেছনে তাকায় না, তাকে বাঘ কখনো ধরতে পারে না। কারণ হরিণের গতি হচ্ছে ঘণ্টায় ৯০ কিলোমিটার। আর বাঘের গতি ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার।

করোনা আর মানুষের অবস্থা হচ্ছে এরকম। এত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, কিন্তু ধরে ফেলে। কাদের ধরে ফেলে? যারা নিঃসঙ্গ। নিজেদেরকে যারা ঘরবন্দি করে রাখে। যারা ভয়ে-আতঙ্কে কাঁপে। করোনা তাদেরকে আস্তে আস্তে ধরে। কারণ করোনার গতি তো কম। এজন্যে আপনার গতিশীল হওয়া দরকার।

গত পাঁচ মাসে আমরা খুব স্পষ্ট দেখেছি, সামাজিকভাবে যারা সংযুক্ত ছিলেন, আত্মীয়স্বজন পরিজনের সাথে যারা সংযুক্ত ছিলেন, তাদের করোনা সংক্রমণ

কম হয়েছে। হলেও সংক্রমণটি ছিল মৃদু। কিন্তু যারা সমাজবিচ্ছিন্ন ছিলেন, যারা করোনার ভয়ে নিঃসঙ্গ একাকী অ্যাপার্টমেন্টের একটি রুমে নিজেকে গৃহবন্দি করে রেখেছিলেন, তারা যখন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন, সেই সংক্রমণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনেক জটিল হয়েছিল। সামাজিক বিচ্ছিন্নতা একজন মানুষের মাঝে করোনা সংক্রমণের আশঙ্কা শুধু বাড়িয়েই দেয় না, মৃত্যুর ঝুঁকিও ৫০ শতাংশ বাড়ায়। হৃদরোগীদের মৃত্যুঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় আড়াই গুণ।

জার্নাল অব হেলথ এন্ড সোশ্যাল বিহেভিয়ার-এর এক গবেষণা রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভঙ্গুর সামাজিক যোগাযোগ অথবা সামাজিক বিচ্ছিন্নতা হার্ট অ্যাটাক, উচ্চ রক্তচাপ ও ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়। সমাজবিচ্ছিন্ন মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে।

হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের গবেষণালব্ধ একটি রিপোর্টে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, সমাজসেবা করলে সেবাদাতার আয়ু বৃদ্ধি পায়।

এই সত্যটি এখন থেকে ১৪শ বছর আগে নবীজী (স) চমৎকারভাবে বলেছেন। বোখারী শরীফের ২০৬৭ নম্বর হাদীস, আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণিত : রসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, 'যে নিজের উপার্জনের প্রবৃদ্ধি ঘটাতে চায় এবং সুস্থতা ও আয়ুবৃদ্ধি কামনা করে, সে যেন স্বজন-পরিজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে।' এর সহজ মর্মার্থ : স্বজন-পরিজন-সুজনের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষাকারীর আয়ু যেমন বাড়ে, তেমনি প্রবৃদ্ধি ঘটে তার উপার্জনে।

আমাদের প্রিয় নবী (স) যে উপদেশ দিয়ে গেছেন, সেই উপদেশই যেন সমর্থন করছেন এখনকার সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা। তাদের গবেষণা বলছে যে, যোগাযোগ হতে হবে সরাসরি। অর্থাৎ বাস্তব সামাজিক যোগাযোগ। যখন বাস্তব সামাজিক যোগাযোগ বাড়ে, যখন একজন মানুষ আরেকজনের সাথে হাত মেলায়, আন্তরিক শুভেচ্ছা বিনিময় করে, তখন তার দেহে অক্সিটোসিনের মাত্রা বাড়ে, ডোপামিনের নিঃসরণ ঘটে। ডোপামিনকে বলা যেতে পারে দেহের নিজস্ব মরফিন, যা প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত মরফিনের মতো তার ব্যথাবেদনা, দুঃখকে দূর করে।

'স্বজন ও সুজনের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষাকারীর আয়ু যেমন বাড়ে, তেমনি প্রবৃদ্ধি ঘটে তার উপার্জনে।' আমরা এই হাদীসের মর্মার্থ খুব সহজভাবে বুঝতে পারি। স্বজন মানে আত্মীয়স্বজন এবং সুজন মানে ভালো মানুষ। কারণ যখনই আপনি স্বজনের সাথে যোগাযোগ করছেন, আপনার ছোট্ট

মেয়েটাকে কাছে টেনে নিচ্ছেন, একটু আদর করে কোলে নিচ্ছেন, ছেলেটাকে একটা চুমু দিচ্ছেন, স্ত্রীর সাথে বা স্বামীর সাথে হাসিমুখে কথা বলছেন—এটিই হচ্ছে সুসম্পর্ক। এতে আপনার আয়ু বাড়বে। রিজিক বাড়বে। আপনি স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবেন। সুস্থ থাকবেন।

যখনই কেউ বাস্তব সামাজিক যোগাযোগ করে, তার উপকারী হরমোন—অক্সিটোসিন ও ডোপামিন নিঃসরণ হয় এবং স্ট্রেস সৃষ্টিকারী হরমোন কর্টিসলের পরিমাণ কমে যায়। আসলে একজন মানুষের ভেতরে যখন আনন্দ আনন্দ ভাব সঞ্চারিত হয়, তখন তার ব্রেন সবচেয়ে সুন্দরভাবে কাজ করে। ব্রেন যখন সুন্দরভাবে কাজ করে, তখন দেহের রোগমুক্তির প্রক্রিয়া সক্রিয় হয়ে ওঠে। ব্রেন-এর যথাযথ ব্যবহারে তার উপার্জনের পরিমাণ বেড়ে যায়।

বাস্তব সামাজিক যোগাযোগের একটি বড় মাধ্যম হচ্ছে শুক্রবারের সাদাকায়ন। যখন আপনি সাদাকায়নে আসছেন, পারস্পরিক হাসি বিনিময় করছেন, হাত মেলাচ্ছেন এবং প্রাণখুলে ভাব বিনিময় করছেন, তখনই ডোপামিনের নিঃসরণ ঘটছে। কর্টিসলের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। ফলে স্ট্রেস বা স্নায়বিক চাপ থেকে আপনি মুক্ত হচ্ছেন। এমনকি একাকিত্বে আক্রান্ত ব্যক্তি ক্ষণিকের জন্যে হলেও ভুলে যাচ্ছে একাকিত্বের যন্ত্রণা। তাছাড়া যখনই আপনি সাদাকায়নে আসছেন, আপনি সেবা দেয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। এখানে সেবাগ্রহীতা যেভাবে উপকৃত হচ্ছে, সেবাদাতাও একইভাবে উপকৃত হচ্ছে।

এজন্যে শুক্রবার যত ব্যস্ততা থাকুক, তার মধ্য থেকেও সময় করে নেবেন সেন্টার/ শাখা/ সেলে সাদাকায়নে সমবেত হওয়ার। এতে পারস্পরিক শুভকামনার মধ্য দিয়ে আপনার সুস্থতা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, প্রশান্তি বাড়বে। একইসাথে বাড়বে ইতিবাচকতা, বিশ্বাস ও প্রত্যয়, যা আপনার সাফল্য অর্জনের পথকে সুগম করবে। বাধাবিপত্তি ও ঝামেলাগুলো কাটিয়ে ওঠার সাহস আপনার ভেতরে জাগ্রত হবে।

করোনা আতঙ্ক থেকে বাঁচার জন্যে তাই আপনি নিজে সাদাকায়নে আসার পাশাপাশি আত্মীয়-বন্ধু-পরিজনকেও নিয়ে আসুন। আতঙ্ক পালিয়ে যাবে ইতিবাচকতা আর বিশ্বাসের শক্তির উচ্ছ্বাসে। আমরা দেশের নীতি নির্ধারকদের কাছে আবেদন জানাব—আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যতের বড় ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেয়া হোক। এই আবেদন কোনো আবেগগত বিষয় নয়, পাশ্চাত্যের চিকিৎসা উপদেষ্টারাও এখন একথা বলছেন। যুক্তরাজ্যের প্রধান

মেডিকেল অ্যাডভাইজার প্রফেসর ক্রিস হুইটি জোরালোভাবে বলেছেন, শিশুরা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলে যতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তার চেয়ে শিশুদের অনেক বেশি ক্ষতি হবে স্কুলে না গেলে। বিবিসিতে ২৩ আগস্ট ২০২০-এ একথা বলা হয়।

তিনি বলেন, কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হয়ে শিশুদের মারা যাওয়ার আশঙ্কা অবিশ্বাস্য রকম কম। কিন্তু স্কুলে না যাওয়ার কারণে দীর্ঘমেয়াদে তারা শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির শিকার হবে। আমরা জানি, করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ইউরোপের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের একটি হচ্ছে যুক্তরাজ্য। ভাইরাসের বিস্তার রোধে অন্যান্য দেশের মতো সেখানেও সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়। তারা এখন স্কুল-কলেজ খোলার জন্যে অপেক্ষা করছে। ইংল্যান্ডে স্কুলগুলো সেপ্টেম্বরে খোলার অপেক্ষায় রয়েছে। স্কটল্যান্ডে ইতোমধ্যেই সমস্ত স্কুল খুলে দেয়া হয়েছে।

প্রফেসর ক্রিস হুইটিকে আমরা অভিনন্দন জানাই। আতঙ্কবাদীরা আতঙ্ক প্রচার করে শিশুদের যে ক্ষতি করেছে, সেটাকে তিনি খুব পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন। প্রফেসর হুইটি বলেন, সারাবিশ্বে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে যে কজন শিশু মারা গেছে, তাদের প্রায় সবাই আগে থেকে কোনো না কোনো জটিল রোগে ভুগছিল। পরম করুণাময়ের কাছে শুকরিয়া আদায় করে বলতে পারি যে, আমাদের শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভৌগোলিক এবং পারিপার্শ্বিক কারণেই অন্য অঞ্চলের শিশুর চেয়ে বেশি। অতএব আমাদের বিনীত আবেদন, শিক্ষা থেকে দূরে রেখে, স্কুল থেকে দূরে রেখে শিশুদের ভবিষ্যতকে নষ্ট হতে দেবেন না।

যে দেশে হাজার হাজার শিশু বস্তিতে গাদাগাদি করে ঘুমায়, সে দেশে কত পার্সেন্ট শিশুর অনলাইনে শিক্ষা নেয়ার উপকরণ আছে! অতএব স্কুল কলেজ ভার্সিটি দ্রুততম সময়ে খুলে দেয়ার জন্যে আমরা আবেদন জানাচ্ছি। মার্চ মাসে যখন করোনা সংক্রমণ আমাদের দেশে শনাক্ত হয়, তখনই আমরা বলেছিলাম যে, করোনাভাইরাস আমাদের আবহাওয়ায় কোনো সুবিধা করতে পারবে না। ইংল্যান্ডে তিন লক্ষ মানুষ সংক্রমিত হয়েছে। মারা গেছে প্রায় অর্ধলক্ষ। আর আমাদের দেশে তিন লক্ষ মানুষ সংক্রমিত হয়েছে, মৃতের সংখ্যা চার হাজারেরও কম। অর্থাৎ জাতি হিসেবে যে-কোনো ক্রাইসিস, যে-কোনো মহামারি, রোগব্যাধি মোকাবেলার শক্তি আমাদের অনেক বেশি।

অতএব স্বাস্থ্য-সুরক্ষার জন্যে করণীয়গুলোতে উৎসাহিত করে

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যত দ্রুত খুলে দেয়া হবে, এটা আমাদের জন্যে তত সুদূরপ্রসারী মঙ্গল এবং কল্যাণ নিয়ে আসবে। যেভাবে শিল্পকারখানা খুলে দেয়া হয়েছে, যেভাবে বাস চলাচল স্বাভাবিক করা হয়েছে, একইভাবে খুব দ্রুত স্কুল-কলেজে স্বাভাবিক ক্লাস শুরু করার মধ্য দিয়ে করোনার সংকট উত্তরণের পথে আমরা একধাপ এগিয়ে যেতে পারব।

যারা বয়স্ক এবং বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি আমাদের মমতা, আমাদের সমবেদনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের ভালোভাবে যত্ন নিতে হবে। তাদের সুরক্ষার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। কিন্তু শারীরিকভাবে যাদের সুস্থ থাকার সক্ষমতা রয়েছে, তাদের জীবনে এগিয়ে যাওয়ার পথকে সুগম করার জন্যে যা যা করণীয়, সেটা আমাদের করতে হবে।

প্রিয় সুহৃদ! আজকের সাদাকায়নে আপনার অংশগ্রহণ তখনই সার্থক হবে, যখন আগামী সাদাকায়নে আপনার পরিচিত বন্ধুবান্ধব আত্মীয়দের উদ্বুদ্ধ করে নিয়ে আসতে পারবেন। আমরা যত ইতিবাচকতায় উদ্বুদ্ধ হবো, নিজের প্রতি বিশ্বাসে বলীয়ান হবো, যোগ মেডিটেশন ও প্রাণায়ামের মধ্য দিয়ে দেহ-মনের উজ্জীবনী শক্তিকে বাড়িয়ে তুলব, তত আমাদের সুস্থতা ও আয়ু বাড়বে। প্রবৃদ্ধি ঘটবে আমাদের জীবনোপকরণে।

মাসিক সাদাকায়ন (অডিও) : ৪ সেপ্টেম্বর ২০২০

নিজের প্রতি ধারাবাহিক যত্নই নিজেকে ভালবাসা

আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি, যারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছেন। আপনারা গত ছয় মাস যে-কাজ করেছেন, সে কাজটি খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং ভালো কাজ। অবশ্য সঙ্ঘ করতে বলেছে বলেই আপনারা করেছেন।

ভালবাসার জন্যে অনেক কিছু করা যায়। যখন সারা পৃথিবী করোনা আতঙ্কে ডুবে ছিল—কোটি কোটি মানুষ মশা-মাছির মতো মারা যাবে, তখন আপনজনও তিন হাত দূরে থাকাকে নিরাপদ মনে করতে শুরু করেছিল। সেই সময় আপনারা আতঙ্ক থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে, মানুষের মনোবলকে শক্তিশালী ও উজ্জীবিত করতে সাদাকায়নের বাণী ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন।

আমি তো সত্যটা আমার বক্তব্যে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। সেই সত্য চারপাশে পৌঁছে দিতে কষ্ট ও পরিশ্রম হয়েছে আপনাদের। আপনারা প্রত্যেক সদস্যের ঘরে ঘরে শুধু এই বাণীগুলো পৌঁছেই দেন নি, যারা জানেন না যে কীভাবে মোবাইলে সাদাকায়নের অডিও ডাউনলোড করতে হয়, তাদেরকে এটাও শিখিয়ে দিয়ে এসেছেন। আর কতজনের সাথে যে শেয়ার করেছেন, এর কোনো সীমা নেই।

মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধারা যেমন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করে সহযোদ্ধাদের জীবন রক্ষা করেছেন, করোনাকালেও একইভাবে কাজ করেছেন আপনারা। মুক্তিযোদ্ধার পরে বাংলা ভাষায় নতুন একটি শব্দ যুক্ত হয়েছে—করোনাযোদ্ধা। করোনাযোদ্ধার প্রথম কাতারে আপনারা ছিলেন। এজন্যে আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাই।

বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাই কোয়ান্টামমে আমাদের সহকর্মী এবং তাদের পরিবার-পরিজনদের। বাড়ি থেকে অনেক ডাকাডাকি হয়েছে, কিন্তু তারা কেউই এই ধ্যানতীর্থ ছেড়ে যান নি। পুরো সময় এখানেই ছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ! তারা এই তীর্থ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখেছেন। এর যথাযথ যত্ন নিয়েছেন। তাই আমরা এখানে আসতে পারছি। ছয় মাস যদি এখানে কেউ বসবাস না করত, তাহলে ধুলোর পাহাড় জমে এই জায়গাটি মহেঞ্জোদারো-হরপ্পা অথবা লালমাই-ময়নামতি হয়ে যেত!

আজকের সাদাকায়নের বিষয় হচ্ছে, *নিজের প্রতি ধারাবাহিক যত্নই নিজেকে ভালবাসা*। যদি যত্ন নেয়া না হয় এবং সেটা ধারাবাহিক না হয়, তাহলে নিজেকে যথার্থ ভালবাসা হয় না। এমনটা হলে বুঝতে হবে, নিজের প্রতি আপনার ক্ষোভ আছে বা সচেতনতার অভাব আছে। আমরা সবাই নিজের যত্ন নেয়ার গুরুত্ব জানি, কিন্তু সচেতন হই না। এমন কেউ নেই, যে নিজেকে ভালবাসি না। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ ভালবাসাই স্বার্থপরতায় রূপান্তরিত হয়। স্বার্থপরতা আর নিজেকে ভালবাসা কিন্তু এক নয়। যথার্থ ভালবাসার স্বভাবই হচ্ছে—সে মমতা বিকিরণ করে, মমতা ছড়িয়ে দেয়।

ভালবাসাটা কী? ভালবাসা প্রকারভেদে একেকরকম। দেশের প্রতি ভালবাসা হলে এটা প্রেম হয়। বিপরীত লিঙ্গের কারো প্রতি ভালবাসা হলে সেটাকেও বলে প্রেম। ছোটদের প্রতি হলে সেটা হয় স্নেহ, মমতা। বড়দের জন্যে হলে সেটা শ্রদ্ধা হয়। অর্থাৎ ভালবাসা যদি আপনার মাঝে থাকে, এটা প্রকাশিত হবেই। যদি প্রকাশিত না হয় তাহলে বুঝতে হবে, এটা ভালবাসা না। এটা হয় একধরনের আত্মকেন্দ্রিকতা বা স্বার্থকেন্দ্রিকতা অথবা আসক্তি।

এক তরুণ ঝর্নার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার চেহারা কখনো দেখে নি। যখন সে ঝর্নার স্বচ্ছ পানির দিকে তাকাল, তার নিজের চেহারার প্রতিফলন ওখানে সে দেখল। নিজের চেহারা দেখে সে তার নিজেরই প্রেমে পড়ে গেল যে, আমি এত সুন্দর! নিজের সৌন্দর্যে নিজে মোহিত হয়ে গেল এবং ওখানেই বসে থাকল। খাওয়া নেই, পড়া নেই ... এত সুন্দর দেহ শুকিয়ে কঙ্কালসার হয়ে গেল। একসময় সে ওখানেই মারা গেল। দেহের অবশিষ্টাংশ মাটির সাথে মিশে গেল এবং সেখান থেকে একটা গাছ হলো। গাছে একটাই ফুল ফুটল। সেই ফুলের নাম হচ্ছে নার্গিস।

যত সুন্দর হোন, যদি যত্ন না নেন, আপনার সৌন্দর্যের কিছুই থাকবে না। একমাস গোসল, খাওয়াদাওয়া না করেন—আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শুধু ভাববেন, আহা! আমি এত সুন্দর! কী হবে? কিচ্ছু থাকবে না। যে সৌন্দর্য আরো ৬০/৭০ বছর আপনি দেখে তৃপ্তি পেতেন, সেটা শেষ হয়ে যাবে। সূরা ত্বীন-এর ৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, 'আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম (দৈহিক ও মানসিক গুণাবলির) অবকাঠামোয়'।

আল্লাহ সুন্দররূপে সৃষ্টি করে শুধু রেখে দেন নি, এই অবকাঠামোটির যত্ন কীভাবে নিতে হবে তা-ও শিখিয়েছেন। তিনি যেহেতু সৃষ্টি করেছেন, তিনি জানেন যে, যদি যত্নের ম্যানুয়াল দিয়ে না দেন, তাহলে এই সৌন্দর্য টিকবে না। ধরুন, আপনি বাজার থেকে কোনো ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী অথবা গাড়ি কিনলেন। সেটার সাথে ম্যানুয়াল থাকে। ম্যানুয়াল আপনি পেলেন কিন্তু পড়ে দেখলেন না। পড়লেন কিন্তু বুঝলেন না। বুঝলেন কিন্তু ম্যানুয়াল অনুসরণ করলেন না। গাড়ি চলবে? যত দামি গাড়ি হোক, চলবে না।

জীবন হচ্ছে সে-রকম। জীবনে চলার ম্যানুয়াল স্রষ্টা যুগে যুগে তাঁর বাণীবাহকদের মাধ্যমে মানুষের কাছে পাঠিয়েছেন। আপনি যদি তা অনুসরণ না করেন, তাহলে যে দৈহিক এবং মানসিক গুণাবলিতে সমৃদ্ধ করে আপনাকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে, তা বিকশিত করতে পারবেন না। আপনি অপূর্ণই থেকে যাবেন। যদি ম্যানুয়াল অনুসারে গাড়ি চালানো না হয়, যে-কোনো সময় হোঁচট খেয়ে গাড়ি রাস্তায় বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আপনার জীবনও সে-রকম যে-কোনো জায়গায় থেমে যেতে পারে।

পরম প্রভু যুগে যুগে বাণীবাহকদের মাধ্যমে যত্নায়নের যে ম্যানুয়াল পাঠিয়েছেন, মানুষের জীবনকে সুন্দর করার যে নির্দেশনাগুলো দিয়েছেন, বিজ্ঞানের আলোকে সেই ম্যানুয়ালকে আধুনিক মানুষের ব্যবহার উপযোগী করে উপস্থাপন করেছে কোয়ান্টাম মেথড। তা অনুসরণ করে আপনি দৈহিক ও মানসিক শক্তি পরিপূর্ণরূপে বিকশিত করতে ও কাজে লাগাতে পারেন।

করোনাকালে মানুষ যখন আতঙ্কিত ছিল, তখন সে আপনজনকে ছেড়ে পালিয়েছে। বিদেশ থেকে স্বামী এসেছে শুনে স্ত্রী ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। কয়েকজন সন্তান বৃদ্ধা মাকে জঙ্গলে ফেলে রেখে পালিয়ে গেছে। যখন বাবার লাশ পড়ে আছে, এ অবস্থায় ছেলে ঘর থেকে পালিয়ে গেছে। সেই সময় আমরা মানুষের পাশে ছিলাম। কেন থাকতে পেরেছি? কারণ আমরা স্রষ্টার দেয়া ম্যানুয়াল 'কোরআন' অনুসরণ করেছি।

করোনাকালে বিশেষজ্ঞরা কী করতে বলেছেন? ব্রিদিং এক্সারসাইজ অর্থাৎ প্রাণায়াম, ইয়োগা, মেডিটেশন। আমরা তো ২৮ বছর ধরে এই একই কথা বলছি যে, নিয়ম অনুসারে সুন্দরমতো নিজের দেহের যত্ন নিন। আপনি ভালো থাকবেন এবং আরেকজনকে ভালো রাখতে পারবেন।

আমরা যদি সুস্থ না থাকতাম, ভালো না থাকতাম, আমরা যদি ভীত থাকতাম, তাহলে কি মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারতাম? কেন আল্লাহ ভালো রেখেছেন আমাদেরকে? আল্লাহ যে নিয়ম দিয়েছেন—ভালো থাকার জন্যে এই এই কাজগুলো করো, আমরা সেই কাজগুলো করেছি। কারণ আল্লাহ তখনই ভালো রাখেন যখন তাঁর ম্যানুয়াল অনুসারে কেউ কাজ করে।

আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি যে, করোনাকালে আমাদের ব্যয় অনেক কম ছিল। আমরা স্যানিটাইজার-এর পরিবর্তে বাংলা সাবান ব্যবহার করেছি। বাংলা সাবান স্যানিটাইজারের চেয়ে উত্তম। হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে গিয়ে তো আগুন লেগে এক ডাক্তারের মৃত্যুই হলো। কারণ এতে দাহ্য পদার্থ আছে। এজন্যেই হাতে দেয়ার পরে উবে যায়। অর্থাৎ এটাতে আগুন লাগবে খুব সহজে। বাংলা সাবান হাতে ঘষে কেউ মারা গেছে, আজ পর্যন্ত এরকম কোনো খবর আমরা পাই নি।

কিছু মানুষ থাকে যারা প্রত্যেকটা সংকটের সময় ব্যবসা করতে চায়। করোনাকালেও এর কোনো ব্যতিক্রম হয় নি। তারা আতঙ্ক প্রচার করে স্বার্থসিদ্ধি করছে। কোয়ান্টাম মেথডের শুরু থেকে এই ২৮ বছর পর্যন্ত আমরা বলছি, নিয়মিত নিজ দেহ-মনের যত্ন নিতে হবে।

যত্নায়নের ফর্মুলা তো আপনারা জানেন—

(এক) দম। বুক ভরে দম নেবেন। শ্বাসকষ্ট কেন হবে? সিলিন্ডার থেকে অক্সিজেন নেয়ার প্রয়োজন হবে না, যদি আপনি আগে থেকে দমচর্চা করেন।

এসময়ে হাসপাতালের আইসিইউ-তে আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদের যেতে হয়েছে মৃতদেহ বের করে আনার জন্যে। কয়েকদিন যাতায়াতের পরে তারা বলে দিতে পারত যে, অমুক আইসিইউতে একজন মারা গেছে। কীভাবে?

তারা জানত যে, সেই হাসপাতালে পাশাপাশি তিনটা বেডের অক্সিজেন লাইন ডিফেক্টিভ। ফোঁস ফোঁস শব্দ করত। রোগীর আত্মীয়স্বজনেরা মনে করত যে, খুব অক্সিজেন আসছে। অক্সিজেন এলে কিন্তু ফোঁস ফোঁস শব্দ করে না, লিক থাকলে করে। ফলে তারা মোটামুটি নিশ্চিত থাকত যে, এই বেড-এর মৃতদেহও কাল সকালে বেরোবে!

দম আমরা অটোম্যাটিকেলি নিচ্ছি। দিনে ২৫ হাজার বার, কোনোরকম চেষ্টা ছাড়া। আরে, চেষ্টা করে দিনে ২৫ বার দম নিন না! তবুও তো আল্লাহ খুশি হবেন—অটোম্যাটিক দিয়ে দিলে কী হবে, এর তো চেষ্টা আছে! শুধু বুক ফোলাবেন আর ছাড়বেন। বুক ফুলিয়ে দম নিন এবং নিয়মিত দমচর্চা করুন। ইনশাআল্লাহ আপনার আর সিলিন্ডারের সহায়তায় দম নিতে হবে না।

(দুই) আহার। কীভাবে খেতে হবে? খাবার খেতে হবে আপনার দেহকাঠামো হিসেবে। হিসেবের বাইরে খেলে হবে না। আপনার দেহকাঠামোর একটা পরিমিতি আছে। আপনার স্টমাক বা পাকস্থলী বলে দেবে, কী পরিমাণ খাবার আপনার খাওয়া উচিত। ধরুন, একজনের দেহকাঠামো হচ্ছে স্লিম। সে যদি বেশি খায় তাহলে প্রস্থে বাড়বে কিন্তু দৈর্ঘ্যে তো বাড়বে না।

এটা নিয়ে গল্প আছে। মহিষ আর ব্যাঙের গল্প।

জলাশয় বা ডোবা হচ্ছে মহিষের খুব প্রিয় জায়গা। মহিষ শরীর ঠান্ডা করার জন্যে ডোবার পানিতে ডুবে থাকে। মহিষের শরীরে গরম বেশি। তাই মহিষের দুধ ঘন। মহিষের দুধের দইও ঘন। মানে বেশি ক্রিমযুক্ত দই। যে কারণে দেখবেন যে, যারা মহিষের দুধের দই দু-চার বার খেয়েছেন, তারা গাভীর দুধের দই আর পছন্দ করেন না।

গল্পটা এরকম—বিশালদেহী এক মহিষ ডোবায় ডুবে আছে। সেই ডোবাতে অনেক ব্যাঙও ছিল। একটা ব্যাঙের সাথে মহিষের প্রথমে খাতির হলো। তারপর সেই ব্যাঙটির সাথে তার ঝগড়া হলো। তখন ব্যাঙ প্রথমবার অনুভব করল যে, মহিষের শরীর অনেক বড় আর মহিষ তার চেয়ে শক্তিশালী। ব্যাঙ শুধু ফোঁস ফোঁস করে। আর কিছু করার শক্তি তার নেই। আরেক ব্যাঙ তাকে পরামর্শ দিলো যে, তুই ভালো করে খা। তাহলে তুইও মহিষের মতো হতে পারবি আর মহিষকে মার দিতে পারবি।

ব্যাঙ প্রচুর খাওয়াদাওয়া শুরু করল। যে-রকম আমরাও অনেক সময় যা দেখি, তা-ই খাই। চিপস খাই, চকলেট খাই, জুস খাই, বার্গার খাই। ব্যাঙও খুব খাচ্ছে আর বুঝতে পারছে যে, আগের চেয়ে সে একটু মোটাসোটা হয়েছে। সে বার বার মহিষের সামনে যায় আর দেখে যে, তার চেয়ে মহিষ অনেক বড়। এখনো ঝাঁপ দেয়ার মতো অবস্থা হয় নি। ব্যাঙ আরো খাওয়া শুরু করল। খেতে খেতে খেতে খেতে সে আর নড়াচড়াই করতে পারে না। কারণ তার শরীরের মেদ বেড়ে সে এত ফুলেফেঁপে উঠল যে, আগে তো

ফোঁস ফোঁস করতে পারত, এখন তা-ও করতে পারে না। শুধু হাঁসফাঁস করে। কোনোরকম দম নেয়, দম ছাড়ে। অবশেষে সে মরেই গেল!

প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার খাওয়ানোর কী বুদ্ধি ব্যবসায়ীদের! বুফে সিস্টেমে ৯০/১০০ পদের খাবার। যত পারো খাও! অতিরিক্ত পয়সা লাগবে না। বুফেওয়ালাদের এটা এক চমৎকার চালাকি! খাও খাও খাও ...। রেস্টুরেন্টগুলোর আবার শেয়ার আছে ক্লিনিকের সাথে। কারণ খাওয়া যখন অতিরিক্ত হয়ে যাবে, তখন অসুখ হবে। অসুখ হলে ক্লিনিকে যেতে হবে।

ওষুধ কোম্পানির খোঁজ নিন। দেখবেন, খাবারের ব্যবসায় তাদেরও শেয়ার আছে। একটা কথা আছে—সব রসুনের গোড়া এক। সব মালিকের গোড়া এক। অতএব বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হবেন না। তারা খাবারের বিজ্ঞাপন প্রথমে দেয়। তারপরে ডায়েটিং-এর বিজ্ঞাপন দেয়। এই করো, এই করো, এই করো। মনে রাখবেন, রাতারাতি হয়তো ওজন বাড়ানো যায় কিন্তু রাতারাতি স্লিম হওয়া যায় না। ওজন বাড়ানোরও প্রসেস আছে। স্লিম হওয়ারও প্রসেস আছে। আপনাকে যত্ন নিতে হবে ধারাবাহিকভাবে।

বোখারী শরীফের হাদীস—নবীজী (স) বলেন, 'সেই আমলই সর্বোত্তম, যা অল্প হোক কিন্তু নিয়মিত করা হয়'।

এই যে নিয়মিত করা, এটার শক্তি আমরা অধিকাংশ মানুষই বুঝি না। আমরা বিপ্লব করে ফেলতে চাই। কিন্তু রাতারাতি কিছু হয় না। যদি কিছু হয়ও সেটা টেকে না। ধসে যায়। উঠতে যত সময় লাগে, পড়তে বা নামতে সময় লাগে অনেক কম। এজন্যে দেহের যত্ন নিয়মিত নেবেন। খাবারের যে ফর্মুলা কোয়ান্টাম মেথডে আমরা বলেছি, সেটা মেনে চলবেন। এর চেয়ে ভালো ফর্মুলা যদি থাকত, আমিও সেটা অনুসরণ করতাম।

(তিন) ইয়োগা। যোগব্যায়ামের লেটেস্ট সংস্করণ হচ্ছে কোয়ান্টাম ইয়োগা। অন্য ব্যায়ামের ক্ষেত্রে উঠতে দম নেয়া, নামতে দম ছাড়া—সাধারণ মানুষের পক্ষে এই জটিলতাগুলো মনে রাখা কঠিন। আমরা ইয়োগার সাথে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের টেকনিক—মনছবি বা ভিজুয়ালাইজেশন যোগ করলাম। তাই নিয়মিত কোয়ান্টাম ইয়োগা চর্চা অন্য যে-কোনো ব্যায়ামের চেয়ে কার্যকরী।

(চার) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। ধর্ম কী বলে? পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা হচ্ছে বিশ্বাসের অর্ধেক। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দুই ধরনের। একটা হচ্ছে ইন্টার্নাল

ক্লিনজিং। আরেকটা এক্সটার্নাল ক্লিনজিং। এক্সটার্নাল ক্লিনজিং হচ্ছে হাত-মুখ ধোয়া, গোসল করা ...। করোনার পরে সবাই বলছে—হাত ধোও, হাতে যেন ময়লা না থাকে। তাছাড়া হাতে করোনাভাইরাসও থাকতে পারে।

রসুলুল্লাহ (স) ১৪শ বছর আগে ওজু করার নিয়ম শিখিয়ে গেছেন। দিনে পাঁচ বার প্রত্যেক নামাজের আগে ওজু করাকে উৎসাহিত করেছেন। কেউ কেউ ভাবেন যে, পেশাব ধরে রেখে এক ওজুতে নামাজ পড়ে নিই। স্যরি, আমি খুব বাস্তব কথা বললাম। নামাজ পড়েই তিনি দৌড়াচ্ছেন ওয়াশরুমের দিকে। নামাজ হবে তার? নামাজের মধ্যেও তার তো ওই চিন্তাই ছিল। পাঁচ বার যদি কেউ হাত-পা ধোয়, মুখ ধোয়, তার শরীরে কোনো ক্ষতিকর জীবাণু থাকতে পারে? তাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

আলহামদুলিল্লাহ! আমরা বাঙালিরা বলতে পারি যে, আমরা গোসলের ব্যাপারে পৃথিবীর সেরা জাতি। কেন? ভ্যাপসা গরমের দেশ। আর আল্লাহ তায়ালা আমাদের নদ-নদী খাল-বিলে প্রচুর পানি দিয়েছেন। আমাদের দেশে পানির কোনো অভাব নেই। আমরা পারলে দিনে দুই বারও গোসল করি।

আর ইন্টার্নাল ক্লিনজিং কী? শরীরের ভেতরের বর্জ্য, মলমূত্র নিষ্কাশন পুরোপুরি হওয়া উচিত। এই পদ্ধতিও আল্লাহর রসুল (স) শিখিয়ে গেছেন।

মলমূত্র পরিষ্কারকের জন্যে যোগে একটি সহজ আসন আছে। সেটার নাম বঙ্গাসন। আমরা প্রাচ্যের মানুষেরা এ আসনে বসতে অভ্যস্ত ছিলাম। অনেকে বলে, এটা গরিবের আসন। কারণ মজুর, শ্রমিকরা এভাবে বসে।

এখন থেকে ৫০/৬০ বছর আগে গ্রামে জেয়াফত হতো। জেয়াফত মানে দাওয়াত। তখন চেয়ার ছিল না। শত শত মেহমানের জন্যে এত মাদুর, এত চেয়ার কোথায় পাবে? কলাপাতায় খাবার দেয়া হতো। বঙ্গাসনে বসে মেহমানেরা খেতেন। কারণ পায়ের পাতায় ভর করে বসতে হলে মাটিতে নিতম্ব লাগিয়ে বসা যায় না। মাটি থেকে আলগা হয়ে বসতে হয়।

মহিলারা, বিশেষত যারা গর্ভবতী—এই আসনটা নিয়মিত প্র্যাকটিস করবেন। নরমাল ডেলিভারির জন্যে এই আসনটির কোনো বিকল্প নেই। এই আসনটি করার সময় পায়ে ঊরুতে নিতম্বে তলপেটে পর্যাপ্ত চাপ পড়ে। তাই চর্বি জমতে পারে না। গ্রামে এভাবে বসে মাটি দিয়ে ঘর লেপা হতো, কাপড় ধোয়া হতো। তাই আমরা কখনো আমাদের মা-খালাদের ভুঁড়ি হতে দেখি নি। আর এখন ভুঁড়ি কমানোর জন্যে কত ব্যায়াম, ডায়েটিং, এটা সেটা ... আরে! বঙ্গাসন করেন। বহু আসনের উপকার পাবেন এই এক আসনে।

আর এটা নবীজীর (স) সুন্নত। রসুলুল্লাহ (স) মসজিদে নববীতেও এভাবে বসেছেন, খাওয়াদাওয়ার সময়ও বজ্রাসনে বসেছেন। আবার এক হাঁটু গেড়ে অর্ধবজ্রাসনে বসেছেন, মানে নামাজে যেভাবে বসা হয়। যখন তিনি মজলিসে বসে কথা বলতেন তখন অর্ধবজ্রাসনে বসতেন।

আপনি যখন বঙ্গাসনে বসছেন, আল্লাহর রসুলের (স) একটা সুন্নত আপনার জীবনে কায়েম করছেন। এটি করা সহজ। স্বাস্থ্যের জন্যে উপকারী। একটা সুন্নত প্রতিষ্ঠা করা অনেক সওয়াবের, অনেক পুণ্যের। অন্তত আমরা নবীজীকে (স) বলতে পারব যে, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমি নিয়মিত বঙ্গাসন করেছি। আরবি নামটাও মুখস্থ করে নিন। আরবি নাম হচ্ছে ‘কারফাসা’।

ইমাম বোখারীর (রহ) বিখ্যাত বই *আল আদাবুল মুফরাদ*। আদাব মানে হচ্ছে শিষ্টাচার। বইটিতে এই আসনের উল্লেখ আছে। সুতরাং শরীরের ইন্টার্নাল ক্লিনজিং-এর জন্যে বঙ্গাসন করবেন। এভাবে বসলে মলাশয় পরিষ্কার হতে যে সময় লাগে, কমোডে বসলে সময় লাগে তার তিন গুণ।

যখন মানুষের টাকা বাড়ে তখন ব্যবসায়ীরা নতুন নতুন পণ্য তৈরি করে। আমাদের দেশে কিন্তু কমোড ছিল না। ৮০-র দশক থেকে একটু একটু করে কমোডের প্রচলন শুরু হলো। কমোড খুবই আনহাইজেনিক আর স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর। কিন্তু আমাদের কাছে এখন কমোড হয়ে গেছে ফুটানির পার্ট। আমরা প্রত্যাশা করব, আমাদের পাবলিক টয়লেটগুলোতে কমোডের পরিবর্তে সব প্যান হয়ে যাবে, যাতে আমরা ওখানে নির্ভাবনায় কিছু সময়ের জন্যে বঙ্গাসন করতে পারি!

যারা বাসাবাড়িতে কমোড বসিয়েছেন, যাদের পক্ষে সম্ভব, কমোড তুলে প্যান বসাবেন। ভবিষ্যতে যারা নতুন বাড়ি বানাবেন, কমোড বসাবেন না। আপনার কনস্টিপেশন বা কোষ্ঠকাঠিন্য হবে না, পাইলস হবে না। অনেক রোগ থেকে মুক্ত থাকবেন, যদি শুধু কমোডের পরিবর্তে প্যান ব্যবহার করেন।

আমরা অধিকাংশই কোয়ান্টাম মেথডের বিষয়গুলো জানি কিন্তু যদি প্র্যাকটিস না থাকে, তাহলে কী হবে? এক মেয়েকে প্রশ্ন করা হলো যে, তুমি খিচুড়ি রাঁধতে পারো? সে হেসে বলল, আমি খিচুড়ি লিখতে পারি। অর্থাৎ সে রেসিপি লিখতে পারে। এখন খিচুড়ি শুধু লিখতে পারলে তো হবে না। খিচুড়ি খেতে হলে রাঁধতে জানতে হবে। অতএব যে-কোনো সিস্টেম থেকে যদি উপকৃত হতে চান, তাহলে আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে।

(পাঁচ) ছন্দায়ন। রুটিন ফলো করবেন। প্রত্যেকটা কাজ করবেন নিয়মমতো। একদিনে অনেক করার দরকার নেই। একদিন ভাবলেন, সারাদিন মেডিটেশন করবেন। না। আধা ঘণ্টা মেডিটেশন করুন কিন্তু প্রতিদিন করুন। আপনি কয়েকদিন পাঁচ/ সাত বার মেডিটেশন করে যে উপকার পাবেন, তার চেয়ে বেশি উপকৃত হবেন যদি প্রতিদিন আধা ঘণ্টা করে মেডিটেশন করেন।

যেমন : পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কীসের জন্যে? আল্লাহর উপকারের জন্যে? আল্লাহ তো বলে দিতে পারতেন যে, পাঁচ ওয়াক্তের ২০ রাকাত ফরজ নামাজ একসাথে পড়ে ফেলো। তুমি ফ্রি হয়ে গেলে। তা তো বলেন নি। বলেছেন, ভেঙে ভেঙে পাঁচ বারে পড়ো। অল্প অল্প করে পড়ো। উপকার বেশি হবে।

তেমনি জীবনে সবকিছু নিয়মমতো করবেন। খাওয়ার সময় ঠিক করে নেবেন। ঘুমানোর সময় ঠিক করে নেবেন। গোসলের সময় ঠিক করে নেবেন। যার যে ধর্ম, সেই ধর্মপালনের সময় ঠিক করে নেবেন। আপনি ভালো থাকবেন।

আমরা নিজের যত্ন যথাযথভাবে নেব। দম আহার ব্যায়াম পরিচ্ছন্নতা ছন্দায়ন—এই পাঁচটি ফর্মুলা নিয়মিত অনুসরণ করব। তাহলেই প্রমাণিত হবে যে, আমরা আসলে নিজেকে ভালবাসি। যদি আপনি নিয়মানুসারে চলেন, তাহলে যতদিন বেঁচে থাকবেন—আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সুস্থ রাখবেন।

সাদাকায়ন : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০; কোয়ান্টামম

সামাজিক শুদ্ধাচার এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

করোনা আতঙ্কের অসারতা এখন এক প্রমাণিত সত্য। গত ছয় মাসের অভিজ্ঞতা এটাই বলে দেয়। আতঙ্কবাদীরা প্রচার করেছিল যে, সারাবিশ্বে করোনায় কোটি কোটি লোক মারা যাবে।

বাস্তব হিসাব হচ্ছে, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সারাবিশ্বে আক্রান্তের সংখ্যা তিন কোটি ২৭ লক্ষ ৬২ হাজার। এর মধ্যে সুস্থ হয়েছেন দুই কোটি ৪১ লক্ষ ৭৪ হাজার। অর্থাৎ প্রায় ৭৫ শতাংশ মানুষ সুস্থ হয়ে গেছেন। মারা গেছেন নয় লক্ষ ৯৩ হাজার জন। অর্থাৎ মৃতের সংখ্যা কোটি কোটি নয়; বরং ১০ লক্ষেরও কম।

আর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যদি আমরা দেখি—আতঙ্কবাদীরা প্রচার করছিল যে, লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাবে, সেখানে বাংলাদেশে আক্রান্তের সংখ্যা তিন লক্ষ ৫৬ হাজার। আর এ পর্যন্ত মারা গেছেন পাঁচ হাজার। লক্ষ মানুষ মারা যাওয়া তো দূরের কথা, আক্রান্তের সংখ্যাই হচ্ছে সাড়ে তিন লক্ষ। এ থেকে বোঝা যায় আতঙ্কবাদীদের আতঙ্ক প্রচারের অসারতা।

করোনায় কোন দেশে প্রতি ১০ লাখে কত মানুষ মারা গেছে তার হিসাব দিয়েছে জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতি ১০ লাখে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে পেরুতে—নয় শত ৬৮ জন। তারপর দ্বিতীয় অবস্থান বেলজিয়ামের, আট শত ৫৯ জন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছয় শত ২৯ জন, ব্রিটেনে ছয় শত ১৭ জন। সে তুলনায় প্রতি ১০ লাখে সবচেয়ে কম মারা গেছে পাকিস্তানে—২৯ জন। দ্বিতীয় অবস্থান হচ্ছে বাংলাদেশের—৩১ জন। এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের দেশে করোনা আতঙ্ক প্রচার কতটা অবাস্তব!

কিন্তু মুনাফা শিকারি বেনিয়াগোষ্ঠীর আতঙ্ক তত্ত্ব প্রচার থেমে নেই। কারণ অহেতুক আতঙ্ক যত বিস্তার লাভ করবে, তত তাদের ব্যবসা রমরমা হবে। তাদের পকেট ফুলেফেঁপে উঠবে। আমাদের দেশে প্রথম প্রচার করা হলো যে, তৃতীয় মাসে সংক্রমণ মারাত্মক হবে। তৃতীয় মাস যায় যায় অবস্থা। তখন তারা বলল, চতুর্থ মাসে সংক্রমণ ঠেকানো যাবে না। পঞ্চম মাস, ষষ্ঠ মাস পার হলো। কিন্তু সংক্রমণের হার যে লাউ সেই কদুর মতো। অর্থাৎ সংক্রমণ হারে তেমন কোনো পরিবর্তন আসে নি। এখন তারা আবার নতুন আওয়াজ তুলছে—শীতকালে করোনার দ্বিতীয় প্লাবন আঘাত হানবে। এই প্লাবন হবে মারাত্মক। সব তছনছ করে দেবে!

কিছু মানুষ আতঙ্ক বিশ্বাস করতে পছন্দ করে। তাদের বুদ্ধি নিয়ে মায়া হয়। কারণ বৈজ্ঞানিক সত্য হচ্ছে, আমাদের দেশে এসে নতুন মিউটেশনের ফলে করোনাভাইরাসের সংহারক শক্তি দুর্বল হয়ে গেছে। সহজ বাংলায় বলা যায়—এটি এখন মৌসুমি ফ্লু-র রূপ নিয়েছে। ভাইরাস জ্বর হলে যেমন শরীর ব্যথা, মাথাব্যথা, সর্দি-কাশি, বমি বা ডায়রিয়ায় ভোগায়, এটিও সে-রকমই।

আমরা পরম করুণাময়ের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে, কোয়ান্টাম এই কথাগুলোই বলেছে ২০২০-এর মার্চ মাস থেকে যে, করোনা আমাদের দেশে সিজনাল ফ্লু-র মতো হয়ে যাবে। করোনা থাকবে, যেমন ফ্লু আছে। নিজ দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে করোনার সাথেই আমাদের বসবাস করতে হবে। আমরা খুব পরিষ্কারভাবে বলেছিলাম যে, জীবনের গতি থামিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই। শিক্ষার পথ বন্ধ করার প্রয়োজন নেই।

আমরা অভিনন্দন জানাই সুইডিশ সরকারকে। তারা করোনায় লকডাউন করে নি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে নি। জীবন ও শিক্ষার গতি স্বাভাবিক নিয়মেই সেখানে চলেছে। সুইডেনে করোনার সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার ইউরোপের কোনো দেশের চেয়েই বেশি নয়, বরং সুইডেনের অর্থনীতি রয়েছে আগের মতোই চাঙ্গা। আর সেপ্টেম্বর থেকে ইউরোপের সব দেশে স্কুল খুলে দেয়া হয়েছে। অনেক দেশে শিক্ষার্থীদের স্কুলে না পাঠালে অভিভাবকদের জরিমানার বিধান করা হয়েছে।

যুক্তরাজ্য সরকারের চিফ মেডিকেল অ্যাডভাইজার প্রফেসর ডক্টর ক্রিস হুইটি বলেছেন, শিশুরা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলে যতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি হবে স্কুলে না গেলে। কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে শিশুদের মারা যাওয়ার আশঙ্কা অবিশ্বাস্য রকম কম। কিন্তু স্কুলে না

গেলে তারা দীর্ঘমেয়াদের শারীরিক-মানসিক ক্ষতির শিকার হবে। ডক্টর ক্রিস হুইটিকে অভিনন্দন জানাই তার এই শিশুদরদী সাহসী বক্তব্যের জন্যে। কর্তৃপক্ষ আমাদের দেশেও স্কুল খোলার প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা আশা করছি, অক্টোবরের শুরুতেই সকল স্কুল খুলে দেয়া হবে। স্বাভাবিক শিক্ষা ও সহশিক্ষা কার্যক্রম শুরু হবে। কিশোর-তরুণ প্রজন্ম হতাশা, বিষণ্নতা ও ভার্চুয়াল ভাইরাস থেকে রক্ষা পাবে। আসলে এই সাহসী পদক্ষেপের ওপরেই নির্ভর করছে আমাদের শিশু-কিশোরদের ভবিষ্যৎ।

আমরা যদি মহাকালের দিকে তাকাই—মানুষ যখনই সীমালঙ্ঘন করেছে, ভ্রান্ত জীবনাচারে ডুবে গেছে, মানুষ যখন মানুষের প্রতি সুবিচার করতে ব্যর্থ হয়েছে, অন্যায়-অত্যাচারে নিমগ্ন হয়েছে, তখনই স্রষ্টার তরফ থেকে গজব নেমে এসেছে। এই গজব কখনো এসেছে ভূমিকম্পরূপে, কখনো এসেছে মহাপ্লাবনরূপে, কখনো প্রাকৃতিক দুর্যোগরূপে, কখনো মহামারিরূপে—প্লেগ, স্প্যানিশ ফ্লু, কলেরা বা বিভিন্ন ভাইরাসরূপে। আর এবার করোনা সবার সামনে সমাজের অমানবিকতার মর্মান্তিক ছবি উন্মোচিত করেছে। আমাদের স্বরূপকে উলঙ্গ করে প্রকাশ করে দিয়েছে।

অবশ্য এর আগে বুয়েটে পেটাতে পেটাতে একজন সহপাঠীকে হত্যার মতো মর্মান্তিক ঘটনা নৈতিকতা বর্জিত আধুনিক শিক্ষার পাশবিক রূপকে সমাজের সামনে তুলে ধরেছিল। গোল্ডেন জিপিএ ফাইভ পাওয়া ছাত্রদের আমরা যে ভালো মানুষ হিসেবে গড়তে ব্যর্থ হয়েছি, বুয়েটের সাম্প্রতিক ঘটনা আমাদেরকে সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে। অবশ্য সমাজের নৈতিক অন্তঃসারশূন্যতা হচ্ছে হিমশৈলের শুধু মাথাটুকু। আমরা জানি, আইসবার্গ বা হিমশৈলের আট ভাগের সাত ভাগ পানির নিচে ডুবে থাকে। একভাগ শুধু দৃশ্যমান হয়। এই বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলো আমাদের সমাজের মানুষের স্বার্থপরতা এবং নৈতিক শিক্ষার অভাবকেই তুলে ধরে।

এর মধ্যে এক ঘটনা শুনলাম। বড় ভাই তার আপন ছোট বোনকে হত্যা করেছে। কারণ তার মনে হয়েছে যে, মা-বাবা তার ছোট বোনকে বেশি আদর করে। ছোটরা আদর পাবে, এটাই স্বাভাবিক। বড় ভাই ছোট বোনকে আদর করবে, এটাও স্বাভাবিক। সেখানে সমাজ-পরিবার কতটা দেউলিয়া হয়ে গেলে বড় ভাই ছোট বোনকে হত্যা করতে পারে! তা-ও এই কারণে যে, তার মনে হয়েছে—মা-বাবা ছোট বোনকে বেশি আদর করে!

অবশ্য সমাজের এই নৈতিক অন্তঃসারশূন্যতা দূর করার জন্যে কোয়ান্টাম কাজ করছে তিন দশক ধরে। কোয়ান্টাম সবসময় বলে এসেছে, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পাশাপাশি আমাদের ভালো মানুষ হতে হবে। কারণ নৈতিকতা বিকশিত না হলে আর্থিক সমৃদ্ধির সুফল সাধারণ মানুষ কোনোদিন ভোগ করতে পারবে না। কিছু মানুষ কোটি কোটিপতি হবে। অঢেল সম্পত্তির অধিকারী হবে। তারা হাজার কোটি টাকা উড়াবে মদ জুয়া বেলেল্লাপনায়। আর কোটি কোটি সাধারণ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যাবে।

নৈতিক শক্তি জাগ্রত করার উপায়ই হচ্ছে নিজের জীবনে, পরিবারে, সমাজ জীবনে শুদ্ধাচারের চর্চা করা। আমরা যত শুদ্ধাচার অনুশীলন করব, তত নৈতিক গুণে গুণান্বিত মানুষ হবো। ভালো মানুষ হবো। আমরা ভালো থাকব এবং চারপাশের মানুষও ভালো থাকবে।

আমাদের শুদ্ধাচারী হওয়ার, নৈতিক শক্তিকে জাগ্রত করার একটা সমন্বিত লিখিত রূপ হচ্ছে *শুদ্ধাচার* বই। সাদামাটা লাল প্রচ্ছদের এই বইটি প্রকাশিত হয় ২০২০ সালের অমর একুশে গ্রন্থমেলায়। সচেতন সমাজ এটি শিক্ষাঙ্গনে এবং ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই বইটি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরাধীন সকল অফিস ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের গ্রন্থাগারে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমরা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরকে অভিনন্দন জানাই। জাতিকে, তরুণ সমাজকে শুদ্ধাচারী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষকের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। হাজার বছর ধরে আমাদের দেশে নৈতিক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষাঙ্গনগুলো এ ভূমিকা পালন করে এসেছে।

শিক্ষাঙ্গনের পাশাপাশি দেশের সর্বস্তরে শুদ্ধাচার চর্চা ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে *শুদ্ধাচার* বইটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার উদ্যোগে আপনিও শামিল হোন। ফাউন্ডেশনের সকল সেন্টার/ শাখা/ সেল শুদ্ধাচার করসেবার উদ্যোগ নিয়েছে এই অক্টোবর মাসে। এসময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে নিজেকে এবং চারপাশের সবাইকে শুদ্ধাচারী হিসেবে গড়ে তোলায় আন্তরিক চেষ্টা। আমরা আশা করি, সচেতন মানুষ হিসেবে শুদ্ধাচার করসেবায় আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণ করে আপনি এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করবেন।

প্রিয় সুহৃদ! আলোচনার উপসংহারে আমরা পরম করুণাময়ের শুকরিয়া আদায় করি যে, আতঙ্কবাদীরা দেশের সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত করতে ব্যর্থ

হয়েছে। আতঙ্কের অন্ধকার ছিন্ন করে দিনের আলোয় তারা বেরিয়ে পড়েছে। এক তরুণ বলছিলেন নিজের উপলব্ধির কথা। যারা করোনা আক্রান্ত হয়েছে, এরা অধিকাংশই ঘরে ছিলেন। বাইরে বেরোন নি। এজন্যে আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি। তিনি আরো বলেন, যে থাকে ঘরে, করোনা তাকে ধরে।

তার কথা থেকে একটি সত্যকে নতুন করে আবার উপলব্ধি করলাম যে, ভয় এবং আতঙ্ক একজন মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে কমাতে থাকে। ভয়-আতঙ্ক যদি তার মনে স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধে, তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বলে আর কিছুই থাকে না। সে আসলে আতঙ্কেই মারা যায়। আর সাহস সবসময়ই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয়।

অতএব সাহসী হোন। কোয়ান্টামের সাদাকায়ন, আত্ম উন্নয়নমূলক এবং সেবামূলক কাজগুলোতে অংশ নিন। আর এ মাসের বিশেষ কার্যক্রম—শুদ্ধাচার করসেবায় অংশ নিয়ে মানুষের নৈতিক শক্তির পুনর্জাগরণ ঘটানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করুন। আপনি ভালো থাকুন। সবসময় স্বাস্থ্য-সুরক্ষার নিয়মকানুন অনুসরণ করুন। সবাইকে ভালো থাকার জন্যে করণীয় কাজগুলো করতে উদ্বুদ্ধ করুন।

মাসিক সাদাকায়ন (অডিও) : ২ অক্টোবর ২০২০

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ॥ আমাদেরকে টিকিয়ে রাখে জীবাণুর সাথে যুদ্ধে

কোয়ান্টামমে এলেই আমার খুব ভালো লাগে। এখানে এলে আমি সাদাকায়নে আলোচনার সুযোগটি গ্রহণ করি। আজ তিন দিনের কোয়ান্টায়ন বা মৌন সাধনায় অংশ নিতে কোয়ান্টাম মাস্টাররা এসেছেন সারাদেশ থেকে। সেইসাথে আমাদের যে কর্মীরা ঘামে ভিজে, রোদে পুড়ে ধ্যানের এই তীর্থভূমি গড়ে তুলছেন, তারাও আছেন।

এই যে সবার সাথে মিলে সাদাকায়ন করা, এটা আমার জন্যে খুব আনন্দের। আমি খুব তৃপ্তি পাই। বলা যেতে পারে যে, গত বছর থেকেই আমি বিশেষভাবে এই সুযোগটা পাচ্ছি লামায়। এজন্যে পরম করুণাময়ের কাছে গভীর গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আজকে সাদাকায়নের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, *রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ॥ আমাদেরকে টিকিয়ে রাখে জীবাণুর সাথে যুদ্ধে*। কিছুটা জটিল বিষয়। দেহ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, টিকে থাকা, জীবাণু, যুদ্ধ—অনেক কিছু রয়েছে এর মধ্যে।

আমাদের প্রত্যেককেই জীবনযাপন করতে হয়। জীবনের যে অভিজ্ঞতা, জীবনের যে সত্য, এটা বিশেষজ্ঞদের জন্যে যে-রকম সত্য, একজন সাধারণ মানুষ, একজন কর্মজীবী, শ্রমজীবী, গৃহিণী—সবার জন্যেই জীবনটা সত্য। জীবনের এই সত্যের আলোকেই আমি আমার আলোচনা করব।

করোনাকালে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমরা আমাদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে কত অসচেতন এবং আমাদের ভাবনাটা কত ভুল! ভাবনাটা কেন ভুল? কারণ এই অসুস্থতার আতঙ্ক যারা প্রচার করেছেন, তারা হচ্ছেন আতঙ্কের ব্যাপারী। আতঙ্ক যত প্রচার করা যাবে, তাদের ব্যবসা তত ভালো

হবে। করোনাকালে ব্যবসায়ীরা কি কম ব্যবসা করেছেন? শত শত কোটি কোটি ডলারের ব্যবসা করেছেন।

আমাদের দেশে যা হয়েছে, এটা কিছুই না। এটা দু-চারটা চীনাবাদাম। আসল ব্যবসা যারা করার, করে ফেলেছে। গেটস সাহেবরা, বেজোস সাহেবরা ... কেন তারা করতে পেরেছে? আমাদের অজ্ঞতার কারণে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ সঠিক তথ্য না জানার কারণে। সঠিক তথ্য থেকে তারা বঞ্চিত ছিলেন। ভুল তথ্যে তারা প্রভাবিত হয়ে গেছেন। এটা কী রকম?

একটা গল্প।

এক রাজা। খুব শক্তিশালী। স্বয়ংসম্পূর্ণ রাজা। কারো সাতেও নাই, পাঁচেও নাই। নিজের রাজত্ব নিয়ে, প্রজাদের নিয়ে খুব সুখে-শান্তিতে ছিলেন। তার সেনাপতিও খুব দক্ষ। প্রতিবেশী এক জালেম রাজা দেখল যে, এই রাজ্যটাকে যদি দখল করা যায় তো এখানে কিছু শোষণ করা যাবে।

সবারই তো গোয়েন্দা থাকে। গোয়েন্দারা এসে প্রতিপক্ষ রাজাকে খবর দিলো—রাজ্য দখল করা খুব সহজ হবে না। কারণ সেনাপতি খুব শক্তিশালী, দক্ষ, অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং দেশপ্রেমিক। তিনি রাজার প্রতি পরিপূর্ণ অনুগত। তাই আমরা যে ফাঁদ পেতেছি, এই ফাঁদে সেনাপতি পা দেবে না। অর্থাৎ সেনাপতিকে বিভ্রান্ত করা যাবে না। কিন্তু রাজাকে বিভ্রান্ত করা যাবে। কারণ রাজা খুব ভালো মানুষ। অনেক সময় বেশি ভালো মানুষেরা একটু সরল হয়।

তারা চর পাঠিয়ে দিলো। যারা চর, তারা তো খুব তেলুয়া হয়। তেলুয়া বোঝেন তো? তেল দিতে ওস্তাদ। আপনারা মুনির চৌধুরীর *রক্তাক্ত প্রান্তর* পড়েছেন। ওখানে গুপ্তচর ছিল আতা খাঁ। শেষ পর্যন্ত নবাব জিজ্ঞেস করছেন যে, আচ্ছা, তুমি আমাদের শিবির থেকে মারাঠা শিবিরে যাও, না মারাঠা শিবির থেকে আমাদের শিবিরে আসো? অর্থাৎ কতটা তেলুয়া ছিল আতা খাঁ!

চর রাজাকে বোঝাতে সক্ষম হলো যে, প্রধান সেনাপতি আপনার প্রতি অনুগত না। শত্রু দেশের সাথে তার আঁতাত হয়ে গেছে। যে কারণে দেখেন না, যুদ্ধ করতে চাচ্ছে না! অন্যদিকে সেনাপতি বুঝতে পারছিলেন যে, এটা আসলে একটা ফাঁদ। তাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সেনাপতি। এই ফাঁদে পা দিলেই তারা সেনাপতিকে হত্যা করবে। সৈন্যবাহিনী তছনছ হয়ে যাবে। আমাদের বরং অপেক্ষা করা ভালো।

রাজা শত্রুর চর দ্বারা প্রভাবিত হলেন, সেনাপতিকে বন্দি করে জেলে পাঠিয়ে দিলেন। তার ওপর অত্যাচারও হলো প্রচুর। রাজ্যে এখন সেনাপতি

নেই। রাজা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, যাও, ঝাঁপিয়ে পড়ো। সেনাবাহিনীসহ সবাই মারা পড়ল, রাজ্য দখল হয়ে গেল। কী বুঝলেন? ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। কারণ যুদ্ধের একটা গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হচ্ছে রং ইনফরমেশন।

আমরা জানি, আমাদের দেশের মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অতুলনীয়। করোনা আসবে আমাদের দেশে কিন্তু তেমন কিছু হবে না। জ্বর-সর্দির মতোই করোনা এসেছে। সাত মাসে মারা গেছে সাড়ে পাঁচ হাজার! *সোনাভানের পুঁথি*র মতো অবস্থা—লাখে লাখে ফৌজ মরে কাতারে কাতার, শুমার করিয়া দেখি সাড়ে সাত হাজার।

পুঁথির কী কাহিনী! হযরত আলী আর বীর হনুমান, অযোধ্যাতে দেখা হইল দুই পালোয়ান। চিন্তা করেন! কোথাকার বীর হনুমান আর কোথাকার আলী! অযোধ্যায় নিয়ে এসে দুই জনের মধ্যে যুদ্ধ লাগিয়ে দিলো—নেজাগুহ্য কেহ ধরে, কেহ লয় বাঁশ। হনুমান বাঁশ নিয়ে আর আলী নেজাগুহ্য নিয়ে। যুদ্ধের এক পর্যায়ে—এরপরেতে আইল যোদ্ধা নামে আইন্দা-ছাইন্দা, ৮০ মণ তামাক নেয় নেংটির মধ্যে বাইন্ধা।

আমরা সাত মাস আগে বলেছিলাম যে, করোনা সাধারণ ভাইরাস জ্বরের মতো, ফ্লু-র মতো থাকবে। আসবে, যাবে, থাকবে। আমরাও থাকব! মূল শক্তিটা কী? আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা।

করোনায় আক্রান্ত বেশি হয়েছে তারা, যারা ঘরবাড়ির মধ্যে নিজেদের বন্দি করে রেখেছিল। ওই যে গল্পের সেনাপতিকে বন্দি করে রেখেছে ...। সে যুদ্ধ করবে কীভাবে? জীবাণু-ভাইরাস আক্রমণ করলেই একজন অসুস্থ হয় না। এর মধ্যে আইসিডিডিআরবি এবং আমাদের রোগতত্ত্ব গবেষণা প্রতিষ্ঠান যৌথ গবেষণা চালিয়ে বলেছে—জুলাই মাসেই ঢাকায় ৪৫ শতাংশ মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়ে গেছে। বস্তির মানুষের মধ্যে আক্রান্তের হার ছিল ৭৪ শতাংশ। কিন্তু বস্তির কত জন মানুষ মারা গেছে? অর্থাৎ সংক্রমণ হলেই মৃত্যু নয়। জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে ৬৫ শতাংশ মানুষ আক্রান্ত হয়ে গেছে। আড়াই কোটি মানুষের শহর ঢাকা। তার মধ্যে ঢাকায় কত জন মারা গেছে? মৃত্যুর সংখ্যা সাড়ে তিন হাজার।

আপনি বলতে পারেন, মৃতের সংখ্যা কম দেখানো হচ্ছে। আসলে মৃতের সংখ্যা প্লাস-মাইনাস ৫/১০ জন কমবেশি হতে পারে। কারণ আমরা তো দাফন কার্যক্রমের সাথে জড়িত। আমাদের হিসাবের বাইরে লাশ যাবে কোথায়! মৃত্যুর খবর অন্য যে-কেউ পাওয়ার আগে আমরা পেয়ে যাই। কারণ

পেশেন্টকে অফিসিয়ালি মৃত ঘোষণার আগে আত্মীয়স্বজনরা আমাদেরকে ফোন দেয়। আমাদের দাফন কার্যক্রমের ওপর তাদের আস্থা আছে।

কোনো ভাইরাসের সংক্রমণ মানেই কিন্তু মৃত্যু নয়। আপনার দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যদি ঠিক থাকে, সিস্টেম যদি ঠিক থাকে, আপনি সুস্থ থাকবেন, আপনি ভালো থাকবেন। এরা আসবে, একটু ঘুষাঘুষি করবে। বক্সিংয়ে বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন মোহাম্মদ আলী ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশে এসেছিলেন। তার সাথে আমাদের দেশের ১২ বছরের এক কিশোর বক্সিং করতে গেছে। কিশোর একটা ঘুষি দিয়েছে। মোহাম্মদ আলী পড়ে যাওয়ার ভান করেছেন। কিশোরের ঘুষিতে কি মোহাম্মদ আলী সত্যি সত্যি পড়ে গেছেন? মোহাম্মদ আলীর কিছু হয়েছে?

একটা মশা যদি হাতির ওপর আক্রমণ করে, হাতি টের পাবে? একটা জীবাণু বা ভাইরাস, তার অবস্থা আপনার শরীরের তুলনায় একটা মশার মতো। হাঁ! মশা যদি ঢুকে যায় আপনার নাকের ভেতরে, দিলো কামড়! খবর আছে! কিন্তু নাকের ভেতরে ঢুকতে দেবেন কেন আপনি? রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা যখনই চাঙ্গা থাকবে, তখন রোগব্যাধি আপনার থেকে দূরে থাকবে।

মানবদেহের সুরক্ষা প্রক্রিয়াটা কী? আপনার দেহের নিরাপত্তা বাহিনী হচ্ছে এই রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা। ধরুন, যে-কোনো দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সেনাবাহিনী থাকে, নৌ-বাহিনী থাকে, বিমান বাহিনী থাকে, পুলিশ থাকে। পাশাপাশি আমাদের দেশে আরো আছে বিডিআর, আনসার, গ্রাম-প্রতিরক্ষা বাহিনী। আছে গোয়েন্দা, সিআইডি, পিবিআই ... আরো কত কী! তার মধ্যে আবার বিভিন্ন স্তরের কমান্ডাররা আছে। তারপরে সরবরাহ ব্যবস্থা আছে, ট্রান্সপোর্ট আছে, গোলাবারুদ আছে, অস্ত্রশস্ত্র আছে। খাবার আছে, পানি আছে, আসবাব আছে, সরঞ্জাম আছে।

এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হচ্ছে পানি এবং খাবার। যদি পানি না থাকে, একজন সৈনিক যদি তৃষিত থাকে, তার হাজার টন গোলা থাকলেও সে তা ব্যবহার করতে পারবে না। তাই বলা হয় যে, যুদ্ধক্ষেত্রে খাবারের একটা টুকরা বুলেটের চেয়ে ইম্পর্টেন্ট। যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন তারা জানেন যে, বুলেট পাওয়া যায়। শত্রুর বুলেট, মৃত সহযোদ্ধার বুলেট আপনি নিতে পারবেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে পানি, খাবার সরবরাহটা সবচেয়ে বেশি জরুরি।

আমাদের দেহের সুরক্ষা-প্রক্রিয়ায় ৩০০ ধরনের রক্ষাণু কোষ আছে, যে কোষগুলো ফাইট করে। ফাইটের বিভিন্ন ধরন আছে। যে পানি নিয়ে যাচ্ছে

যুদ্ধক্ষেত্রে, সে কি কম ফাইটার? সে প্রত্যক্ষ ফাইট করছে না, কিন্তু ১০/২০ জন ফাইটারকে সে লালন করছে। পানি না পেলে তারা ফাইট করতে পারবে না। অতএব এই ৩০০ ধরনের কোষ আমাদের সুরক্ষা-প্রক্রিয়ায় সমন্বিতভাবে কাজ করে। একেকজনের একেক ভূমিকা, একেক কাজ।

যখনই কোথাও কোনো জীবাণু আক্রমণ করছে বা ইনফেকশন হচ্ছে, তখন সাথে সাথে দেহের প্রতিরক্ষা সৈনিক সেলগুলো দ্রুত ওখানে চলে যাচ্ছে এবং হাই কমান্ডে মেসেজ পাঠিয়ে দিচ্ছে—আমি আক্রান্ত হয়েছি, সাহায্য দরকার। হাই কমান্ড সাথে সাথে ওখান থেকে রি-ইনফোর্সমেন্ট সরবরাহ করছে, যাতে ওই স্থানে কোনো রোগজীবাণু জয়ী না হতে পারে। রোগজীবাণু যেন ধ্বংস হয়ে যায়।

সুরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হয় কখন? যখন আপনার মধ্যে ভয় থাকে, আতঙ্ক থাকে। অবৈজ্ঞানিক ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের কারণে অপুষ্টি থাকে। তখন ভিটামিন এবং বিভিন্ন নিউট্রিয়েন্টস-এর উপকারী শক্তির অভাবে আপনি অপুষ্টিতে আক্রান্ত হন। এজন্যে অবৈজ্ঞানিক খাদ্যাভ্যাস বর্জন করতে হবে, ফাস্ট ফুড ও এনার্জি ড্রিংকস বর্জন করতে হবে।

এনার্জি ড্রিংকস শুধু যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে জরাজীর্ণ করে তা না। আমরা কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে বলি যে, মা হতে চাইলে, বাবা হতে চাইলে এনার্জি ড্রিংকস পান করবেন না। চিনি, চিনিজাত মিষ্টি থেকে শুরু করে চকলেট—একদম বর্জন করবেন। চায়েও চিনি নেবেন না। যত চিনি বর্জন করবেন, অপুষ্টিকর ও ক্ষতিকর খাদ্য বর্জন করবেন, সুস্থতা তত বাড়বে।

সবসময় ধর্মসম্মত রুচিসম্মত পুষ্টিবিজ্ঞানসম্মত প্রাকৃতিক খাবার খাবেন। পরিমিত ফলমূল, শাকসবজি, মাছ-মাংস খাবেন। মাংসের মধ্যে গরু-খাসি-পাঁঠা যত কম খাওয়া যায় তত ভালো। মুরগির মাংস খেতে পারেন। সবজি আধা সেদ্ধ খাবেন। আঁশজাতীয় সবজি বেশি খাবেন। শীতকাল সবজির মৌসুম। শীতে সবজি বেশি করে খাবেন।

শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জোরদার করার জন্যে প্রত্যেকদিন এককোষ রসুন, ২০/৩০ দানা কালোজিরা, এক চা-চামচ মধু খাওয়ার অভ্যাস করবেন। যেখানেই যাবেন, কালোজিরা-রসুন সাথে করে নিয়ে যাবেন। কারণ বেড়াতে গিয়ে যদি কাউকে বলেন যে, একটু রসুন দেন, কালোজিরা দেন ... তারাও যদি কোয়ান্টাম পরিবার হয় তাহলে বিষয়টা বুঝবে। অন্যেরা বুঝবে কী করে! স্বাবলম্বী হবেন। নিজের দায়িত্ব নিজে নেবেন।

পর্যাপ্ত ঘুমাবেন। ঘুম শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। যে কারণে অসুস্থ হলে ডাক্তাররা কী বলেন? বেড রেস্ট ...। তাই ঘুমের সময় ঘুমান। কারণ ঘুমের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সক্রিয় হয়। দিনের বেলায় ব্রেন তো অন্যান্য কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সবচেয়ে সক্রিয় হয় রাতের বেলা। রাতের ঘুমটা হচ্ছে ন্যাচারাল। অকারণে কেউ রাত জাগবেন না। বিশেষভাবে সোশ্যাল মিডিয়া ও ইউটিউবের ক্ষতিকর কন্টেন্টগুলো দেখার অভ্যাস রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে জরাজীর্ণ করে। তাই রাত ১১টায় মোবাইল বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়বেন। আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়তে থাকবে।

আর নিয়মিত মেডিটেশন করবেন। কারণ শরীরের প্রতিরক্ষা বা সুরক্ষা ব্যবস্থার সেনাপতি হচ্ছে বিশ্বাস ও সাহস। বিশ্বাস ও সাহস যখন থাকে, তখন তথ্য এবং কৌশল সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আয়ত্ত করে ফেলে। এই সেনাপতির মূল খাবার হচ্ছে মেডিটেশন এবং ইবাদত/ উপাসনা। পানি যেমন একজন সৈনিকের প্রয়োজন, বিশ্বাস নামক সেনাপতিকে তাজা রাখার জন্যে দরকার মেডিটেশন এবং ইবাদত। যারা ইবাদত করেন, যারা উপাসনা করেন, কিছুদিন ইবাদত বা উপাসনা বাদ দিয়ে দেখুন—বিশ্বাস নড়বড়ে হয়ে গেছে।

তাহলে শক্তির মূল উৎসটা কী? বিশ্বাস। রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্যে নিয়মিত মেডিটেশন করা, নিজ নিজ ধর্মমতে ইবাদত করা, উপাসনা করা। যখন ইবাদত/ উপাসনা করবেন, তখন আপনার মধ্যে শুদ্ধাচার সৃষ্টি হবে। আর শুদ্ধাচারী যাতে সহজে হতে পারেন এজন্যে আমাদের *শুদ্ধাচার* বইটি সংগ্রহ করবেন। আত্মীয় বন্ধু প্রতিবেশীদের শুদ্ধাচার বই দেবেন। তারা শুদ্ধাচারী হলে, তাদের বিশ্বাসও শক্তিশালী হবে। বিশ্বাস শক্তিশালী হলে তারা সুস্থ থাকবেন। সুস্থ মানুষের সংখ্যা বাড়বে। সুস্থ মানুষের সংখ্যা যত বাড়বে, সমাজও তত সুস্থ হবে।

সাদাকায়ন : ১৬ অক্টোবর ২০২০; কোয়ান্টামম

বিশ্বাসে প্রবল হলেই ব্রেন ভালোভাবে কাজ করে

অন্যান্য বছর শীত এবং কুয়াশা পড়ে এই সময়ে। গত দুদিন ধরে বর্ষার মতো অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরছে। এই বর্ষণমুখর শীতের সকালে আপনাদের বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

২২ বছর আগে লামাতে এসেছিলাম। তখন বর্ষাকালে জঙ্গল টিলা রাস্তা—সব পিচ্ছিল হয়ে থাকত আর আমরা পিছলাতাম। কিন্তু আমরা সৌভাগ্যবান ছিলাম। একবার টিলার ওপর থেকে নামার সময় পিছলে গেলাম। ইশ্‌শ্‌শ্‌ ... খুব খুশি লাগল। পা টিপে টিপে কষ্ট করে নামতে হলো না আর। এমনিই নেমে গেলাম! অথচ এখন তো কেউ প্রাইভেট কার নিয়ে এলে একেবারে মেইন গেটের সামনে চলে আসতে পারে। আর মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ... আমরা হেঁটে এসেছি ১০ কিলোমিটার!

আজ কোয়ান্টামমে কিছু কিশোর-কিশোরীকে দেখে আমার খুব ভালো লাগল। খুব মুগ্ধ হলাম। কারণ ওদের চেহারার মধ্যে দেখতে পাই আমাদের ভবিষ্যতকে। দেখতে পাই আমাদের স্বপ্নকে। আজকের আলোচনা এই কিশোর-কিশোরীদের উপলক্ষ করেই। আমি অভিনন্দন জানাই ওদের, যারা শয়তানের বাক্স দূরে রেখে, ডিজিটাল ভাইরাসের আকর্ষণ ছেড়ে, এই ধ্যানতীর্থে, প্রশান্তির ভুবনে চলে এসেছে সাধনা করার জন্যে। চিন্তার জন্যে, ভাবনার জন্যে। জীবনকে বোঝার জন্যে, জীবনকে উপলব্ধি করার জন্যে।

আমারো কিছু করার আছে। গা ভাসিয়ে দেয়ার নাম জীবন নয়। জীবন

হচ্ছে পথ চলার নাম, কাজ করার নাম। এই ভাবনা, এই চিন্তা আছে বলেই তারা আজ এখানে আসতে পেরেছে। তাদের মা-বাবা, অভিভাবকদেরও অভিনন্দন জানাই। এই কিশোর-কিশোরীদের তারা আসতে দিয়েছেন। ফাউন্ডেশনের প্রতি তাদের আস্থা কতটুকু, এর মধ্য দিয়েই সেটা বোঝা যায়।

এক শিক্ষকের গল্প দিয়ে শুরু করি।

শিক্ষক গুরু টিচার ওস্তাদ সমার্থক শব্দ। গুরু নানকের গল্প। আমরা জানি যে, তিনি শিখ ধর্মের প্রবর্তক এবং একেশ্বরবাদী ছিলেন। গুরু নানক যখন তার ধর্মপ্রচার করেছেন, তখনকার দিনে দূরপথে যাত্রা এখনকার মতো এত সহজ ছিল না যে, রাতে এসি বাসে উঠলেন, সকালবেলা পৌঁছে গেলেন। অথবা বিমানে উঠলেন, পৌঁছে গেলেন। তখনকার দিনে যাত্রা কঠিন ছিল, পথ দুর্গম ছিল, খাবারও দুর্লভ ছিল।

গুরু নানক তার শিষ্যদের নিয়ে ধর্মপ্রচারে যাচ্ছেন। আশেপাশে গ্রামে যান। তাঁবু গাড়েন, শিষ্যদের উপদেশ দেন। তাদের পরিশুদ্ধির জন্যে সাধনার পথ বাতলে দেন। নতুন মানুষজনের কাছে ধর্মের বাণী পৌঁছে দেন। একবার এক জায়গায় তাঁবু গেড়েছেন। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। রাতে পথ চলাটা তখন খুব কঠিন ছিল। অন্ধকার। শীতের রাত। সন্ধ্যায়ই কুয়াশা নেমে গেছে। প্রচণ্ড শীত। যারা শীতের সময়ে পাঞ্জাব, হরিয়ানা—এই সমস্ত জায়গায় গেছেন তারা বোঝেন যে, ওখানে শীত কত প্রবল।

গুরু নানক তার কয়েকজন শিষ্যকে উপদেশ দিচ্ছেন। হঠাৎ তার মনে হলো যে, তিনি যে চাদরটা জড়িয়ে আছেন সেটা ময়লা হয়ে গেছে। গায়ের চাদরটা খুলে একজন শিষ্যকে দিয়ে বললেন, যাও, এটা ধুয়ে শুকিয়ে নিয়ে আসো, যাতে আমি চাদরটা গায়ে দিয়ে শীত নিবারণ করতে পারি।

সেই শিষ্য চাদরটা নিয়ে তাঁবু থেকে বের হলো। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। চারদিকে কুয়াশা। তেমন কিছু একটা দেখা যাচ্ছে না। সে ঠান্ডায় কাঁপছে। এদিক-ওদিক যাচ্ছে। কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে সে ফিরে এলো।

গুরু নানক তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি চাদরটা ধুয়ে আনো নি? শিষ্য বলল, বাইরে কিছু দেখা যায় না। এদিক-ওদিক তাকালাম। এই ঠান্ডায় পানি কোথায় পাব? শুকাব কীভাবে?

গুরু চাদরটা আরেকজনকে দিলেন। সে-ও ঘণ্টাখানেক ঘোরাঘুরি করে এসে একই কথা বলল। কুয়াশায় বাইরে কিছু দেখা যায় না। ফিরে এসেছি।

এরপর গুরু তৃতীয়জনকে চাদরটা দিয়ে বললেন যে, তুমি যাও। দেখো, তুমি পারো কিনা। এটা ধুয়ে, পরিষ্কার করে শুকিয়ে আনলেই আমি ব্যবহার করব। সে গেল। অনেকটা সময় পার হয়ে গেল। স্বাভাবিকভাবেই অন্ধকার হয়ে এসেছে। রাত যত বাড়ে, কুয়াশা তত তীব্র হয়। সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত পার হয়ে গেছে। আমরা যে-রকম নৈশায়ন অর্থাৎ নৈশ ইবাদত করি, তারাও সে-রকম করছেন।

মধ্যরাতে সে ফিরে এসেছে। শীতের চাদরের আরেকটা পোশাকি নাম হলো শাল। শিষ্যের হাতে গুরুর শাল, ফকফকা। কড়কড়ে। শুকনো।

শালের এই অবস্থা দেখে অন্য শিষ্যরা তো বিস্মিত! তারা বলল, এ তো জাদু! গুরু নানক শালটা নিলেন। গায়ে জড়ালেন। জিজ্ঞেস করলেন, তুমি শালটাকে এইরকম ধুয়ে, পরিষ্কার করে আবার কড়কড়া করে শুকিয়ে নিয়ে এলে কীভাবে? শিষ্য বলল, গুরুদেব! আপনি যখন বললেন শালটাকে ধুয়ে শুকিয়ে আনলেই আপনি ব্যবহার করতে পারবেন, তখন আমার মনে হলো যে, আমাকে কাজটা করতেই হবে। আমি এটাকে ধুয়ে শুকিয়ে না আনা পর্যন্ত আপনি তো শীত নিবারণ করতে পারবেন না।

আমি হাঁটতে শুরু করলাম। হাঁটতে হাঁটতে মনে হলো, পানি ছাড়া তো ধোয়া যাবে না। প্রথমে আমার প্রয়োজন হচ্ছে পানি। হঠাৎ খেয়াল হলো, আমরা যে পথ দিয়ে এসেছি, সেই পথে একটা কুয়া ছিল। অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। প্রভুকে স্মরণ করছি যে, প্রভু! কুয়ার পথটা দেখিয়ে দাও। হাঁটতে হাঁটতে আমি ঠিক কুয়ার কাছে উপস্থিত হলাম। কুয়ার পানিতে খুব ভালো করে চাদরটা ধুলাম। ভিজে আরো ঠান্ডা হয়ে গেল। কারণ শাল থেকে পানি সহজে ঝরতে চায় না।

এরপর ভাবছিলাম যে, ধুলাম তো ঠিক আছে। শুকাব কীভাবে? মনে হলো, ধুতে যখন পেরেছি, শুকানোরও একটা উপায় বেরিয়ে আসবে। আমি হাঁটতে লাগলাম। একসময় হাঁটার শক্তি পাচ্ছি না আর। ক্লান্ত, তারপরও হাঁটছি। হঠাৎ দেখি দূরে আলো দেখা যাচ্ছে। ভালো করে খেয়াল করলাম, মনে হলো, ওটা আগুন। ঐদিকে এগোতে লাগলাম। যত কাছে যাচ্ছি, আগুন উজ্জ্বল হচ্ছে, বড় হচ্ছে। প্রথমে মনে হয়েছিল, ওটা চেরাগের আগুন। কাছে এসে দেখি যে, না! দু-তিনজন মানুষ আগুন পোহাচ্ছে।

চলে গেলাম ওখানে। ঘরের চালার কাঠের সাথে শালের দুই কোণা বাঁধলাম। বাকি দুই কোণা আমি ধরে দাঁড়িয়ে থাকলাম। এতটা উঁচু করে

ধরলাম যাতে আগুনে পুড়ে না যায়। আস্তে আস্তে শালটা শুকিয়ে একেবারে কড়কড়া হয়ে গেল। তারপরে সেটা ভাঁজ করে নিয়ে এলাম।

তিন জনকেই কিন্তু শিক্ষক লক্ষ্য দিয়েছিলেন। দুজন পারে নি। একজন পেরেছে। দুজন কেন পারে নি? কিছুক্ষণ পরেই তাদের মধ্যে নেতিবাচকতা চলে এসেছে যে, কুয়াশা, অন্ধকার ... কিছু দেখা যাচ্ছে না। কোথায় পানি পাব? এই শীতের রাতে ঠান্ডার মধ্যে শালটা শুকাতে পারব তো? প্রথমজন কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক উদ্দেশ্যহীন ঘোরাঘুরি করে চলে এসেছে। দ্বিতীয় জনও পারল না একই কারণে। তার মধ্যেও নেতিবাচকতা ছিল। সে বিশ্বাস করতে পারছিল না যে, এই কাজটা করা যাবে। ফলে সে-ও ব্যর্থ হলো।

কিন্তু তৃতীয়জনের কাছে তার শিক্ষকের প্রয়োজন বড় হয়ে দেখা দিলো যে, এই চাদরটা ধুয়ে শুকাতে পারলেই আমার শিক্ষক এটা গায়ে দিয়ে শীত নিবারণ করতে পারবেন। অতএব কাজটা আমাকে করতেই হবে। শিক্ষক যখন বলেছেন, আমি চেষ্টা করব। নিশ্চয়ই প্রভু আমাকে পথ করে দেবেন।

সে যখন ডিটারমাইন্ড হলো, যখন দৃঢ় আস্থা আনল যে, এই কাজটা আমাকে করতে হবে, লক্ষ্যে আমাকে পৌঁছতে হবে, তখন তার ব্রেন কাজ করতে শুরু করল। কাজটা না করলেও তার কোনো ক্ষতি হতো না। কিন্তু সে কেন করতে চাইল? কারণ এই কাজটা করতে পারলে তার চেয়ে যিনি বড়, তার যিনি পথপ্রদর্শক, তিনি একটু আরাম পাবেন। শীত নিবারণ করতে পারবেন। তার কষ্ট দূর হবে। অতএব কাজটা করতে হবে।

সে কাজটাকে ভাগ করে ফেলল। আগে চাদরটাকে ধুতে হবে। তারপরে শুকানোর চিন্তা করব। তখনই তার ব্রেন কাজ করতে শুরু করল। যখন কেউ ইতিবাচক হয়, বিশ্বাসে প্রবল হয়, তখন ব্রেন কাজ করতে শুরু করে। আর যখন কেউ গতানুগতিকতায় গা ভাসিয়ে দেয়, নেতিবাচকতায় গা ভাসিয়ে দেয়, তখন ব্রেনও অটোমেশনে চলে যায়। কারণ নেতিবাচক চিন্তা করা খুব সহজ। ওটার জন্যে কোনো বিশ্বাসের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ইতিবাচক চিন্তা করার জন্যে বিশ্বাসের প্রয়োজন হয়।

আমরা দেখলাম, প্রথম ধাপে সে শালটি পরিষ্কার করল। এখন দ্বিতীয় ধাপ—শালটা শুকাতে হবে। সুতরাং কীভাবে শুকানো যায় সেটা খুঁজে বের করতে হবে। শাল শুকানোর জন্যে সে আগুন পেয়ে গেল এবং সেটি শুকিয়ে নিয়ে ফিরে এলো।

জীবনে সাফল্যের জন্যে কী প্রয়োজন? ইউ নিড আ টিচার। একজন

শিক্ষক, গাইড বা মেন্টর। যে-কেউ হতে পারেন তিনি। সেই মেন্টরের প্রতি, সেই গাইড বা শিক্ষকের প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখা, নেতিবাচকতাকে কোনোভাবে প্রশ্রয় না দেয়া, ইতিবাচক বিশ্বাসে নিজেকে প্লাবিত করা। তখন আপনি যে লক্ষ্যে পৌঁছতে চান, সেই লক্ষ্যে ব্রেন কাজ করতে শুরু করবে। একের পর এক বাধাগুলো দূর হয়ে যাবে, অর্জনের শীর্ষে আপনি পৌঁছে যাবেন।

এই কোয়ান্টামম—ধ্যানতীর্থকে যদি আমরা দেখি, ২২ বছর আগে প্রতিকূলতার কোনো অভাব ছিল না। এখানে যে কিছু করা সম্ভব, তা কেউ বিশ্বাস করে নি। কিন্তু আমরা বিশ্বাসে প্রবল ছিলাম। আমাদের বিশ্বাসে কখনো কোনো ঘাটতি ছিল না। আমরা মেহনতে প্রবল ছিলাম। কোনো কষ্টস্বীকার করতে আমরা দ্বিধা করি নি। আজ আমাদের এই এলাকা শুধু আলোকিত জনপদ হয় নি, আশেপাশে যত এলাকা রয়েছে, সব এলাকার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটেছে। আজ আমরা এখানে গাড়ি নিয়ে গেট পর্যন্ত চলে আসতে পারি। পা পিছলে এগিয়ে যেতে হয় না!

ইয়ং লেডিস এবং ইয়ং ম্যান ... যাদের জন্যে আমার আজকের এই আলোচনা, ইউ হ্যাভ দ্য ফিউচার। আমরা তো বর্তমান। কিন্তু তোমরা হচ্ছো ভবিষ্যৎ। ইউ ক্যান বিল্ড আ ফিউচার, যদি তোমরা তোমাদের মেন্টর ঠিক করতে পারো যে, কাকে তুমি অনুসরণ করবে, কোন পথে তুমি চলবে। নেতিবাচকতার পথ, নাকি ইতিবাচকতার পথ? যে কারেক্ট ডিসিশন নিতে পারবে, তার সাফল্য, তার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ কেউ আটকাতে পারবে না।

সাদাকায়ন : ২৩ অক্টোবর ২০২০; কোয়ান্টামম

প্রবৃদ্ধি বাড়ছে, স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দিন ॥ বজ্রাসনের অভ্যাস গড়ুন

প্রিয় সুহৃদ! প্রতিটি সাদাকায়ন আমাদের জীবনে নতুন নতুন উপলব্ধি, নতুন নতুন অনুভূতির মাত্রা যোগ করুক, আমরা এই কামনাই করছি। সাদাকায়ন শুরুর আগে হৃদয়ের গভীর থেকে দরুদ ও সালাম প্রেরণ করছি আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি।

বালাগাল উলা বি-কামালিহি
কাশাফাদ্দুজা বি-জামালিহি
হাসুনাৎ জামিয়্যু খিসালিহি
সাল্লু আলায়হি ওয়া আলিহি। (২ বার)

আল্লাহ তায়ালা নবীজীকে (স) সমস্ত সৃষ্টিজগতের জন্যে করুণাস্বরূপ প্রেরণ করেছেন। আমাদের জীবন তাঁর জ্ঞান, করুণা ও মমতায় সিক্ত হোক।

প্রিয় সুহৃদ! চারপাশে অমানবিকতার ছড়াছড়ির মাঝে আমাদের দেশের জন্যে সুখবর হচ্ছে—করোনার প্রভাবে যেখানে ধনী-গরিব সব দেশেই কোটি কোটি মানুষ কর্মচ্যুত হয়েছে, ব্যবসাচ্যুত, চাকরিচ্যুত হয়েছে, অধিকাংশ দেশের জিডিপি কমে গেছে, সেখানে বাংলাদেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধি নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেছে আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক, এডিবি।

আইএমএফের মতে, জিডিপিতে বিশ্বে তৃতীয় শীর্ষ প্রবৃদ্ধির দেশ হবে

বাংলাদেশ। এডিবির মতে, চতুর্থ শীর্ষ দেশ হবে বাংলাদেশ। লকডাউন এবং করোনা আতঙ্কবাদীদের প্রচারণা যে বাংলাদেশের মানুষের ওপর তেমন কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি, আইএমএফ এবং এডিবির আশাবাদই সে-কথা প্রমাণ করছে।

আসলে আমাদের জাতিসত্তার দুর্যোগ মোকাবেলা করার ক্ষমতা হাজার বছরের। আমাদের ডিএনএ-র মধ্যেই দুর্যোগ মোকাবেলার এক অসাধারণ ক্ষমতা সুপ্ত রয়েছে। কারণ ঝড় বন্যা মহামারি—শতাব্দীর পর শতাব্দী এগুলোর মোকাবেলা আমরা করেছি সফলভাবে। আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও ঈর্ষা করার মতো। দুর্যোগ দুর্বিপাকে আমাদের ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতা পৃথিবীর যে-কোনো জাতির জন্যে উদাহরণ হিসেবে থাকবে।

মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বিধ্বস্ত বাংলাদেশ ও লক্ষ লক্ষ স্বজন হারানোর বেদনায় শোকার্ত বাংলাদেশ নিয়ে তদানীন্তন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার মন্তব্য করেছিলেন, বাংলাদেশ হচ্ছে একটা তলাবিহীন ঝুড়ি! ১৯৭৪/৭৫-এ পৃথিবীর শীর্ষ দুজন উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ লিখলেন যে, বাংলাদেশ যদি অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি করতে পারে, তাহলে দুনিয়ার যে-কোনো দেশই উন্নতি করতে পারবে!

বিশ্বব্যাংকের তৎকালীন প্রধান অর্থনীতিবিদ বলেছিলেন, বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় প্রতিবছর যদি দুই শতাংশ হারে বাড়ে, তবুও মানসম্পন্ন মাথাপিছু আয়ের তালিকায় যেতে লাগবে ১২৫ বছর। তিন শতাংশ হারে বাড়লে লাগবে ৯০ বছর। ৯০ বছর লাগে নি, ৪৫ বছরের মাথায় বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট মন্তব্য করলেন, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হবে। বর্তমান বিশ্বের ৪১ তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ বাংলাদেশ। বিশেষজ্ঞদের আশাবাদ হচ্ছে, ২০৩২ সালে বাংলাদেশ উঠে আসবে ২৪ তম স্থানে!

৭০-এর দশকে বিশেষজ্ঞরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, বিপুল জনসংখ্যার ভারে খাদ্যসংকটে পড়বে বাংলাদেশ। আর এখন বাস্তবতা হচ্ছে, আয়তনে পৃথিবীর ৯৪ তম দেশ হওয়া সত্ত্বেও খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ১০ম। ধান উৎপাদনে ৪র্থ। সবজি উৎপাদনে ৩য়। আলু এবং আম উৎপাদনে ৭ম এবং পেয়ারায় ৮ম। গত একযুগে দ্বিগুণ হয়েছে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু ফল খাওয়ার পরিমাণ। স্বাদু পানির মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে ৩য় আর ইলিশে ১ম। বিশ্বের ৮৬ শতাংশ ইলিশ এখন বাংলাদেশে উৎপাদিত হচ্ছে। ডিম উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ।

আমরা সবসময়ই বলেছি, আমাদের দেশের ওপর স্রষ্টার বিশেষ করুণা রয়েছে। আমাদের মাটি পৃথিবীর উর্বরতম মাটির একটি। আমাদের মহীসোপান পৃথিবীর উর্বরতম পলিসমৃদ্ধ মহীসোপান, যা মাছের লালনক্ষেত্র। ৭০-এর দশকে, ৮০-র দশকে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে জনসংখ্যার ভার খাদ্যসংকট সৃষ্টি করবে। আমরা তখনো বলেছি, আমাদের উর্বরা মাটি এবং পলিসমৃদ্ধ মহীসোপানের জন্যে বাংলাদেশে জনসংখ্যা দ্বিগুণ বা তিন গুণ হলেও খাদ্যের কোনো অভাব হবে না। যখন জনসংখ্যা ১৬ কোটি হয়েছে, তখনো আমাদের দেশে খাবারের অভাব হয় নি। দেশে জনসংখ্যা ৫০ কোটি হলেও আমাদের খাবারের কোনো অভাব হবে না ইনশাআল্লাহ।

আমাদের বিশ্বাসের পেছনে কারণটা ছিল খুব স্পষ্ট। মানুষ শুধু মুখ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না, সে মস্তিষ্ক নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এই মস্তিষ্ক হচ্ছে সভ্যতার সকল সম্ভাবনার সূতিকাগার। জনসংখ্যা যা-ই হোক—এই মস্তিষ্ককে যারা ব্যবহার করবে, দু-হাত, দু-পা যারা ব্যবহার করবে, তাদের প্রাচুর্য কেউ থামিয়ে রাখতে পারবে না। কোনো জাতি যদি তার মস্তিষ্ককে ব্যবহার করে, যদি তার হাত-পায়ের কর্মক্ষমতাকে ব্যবহার করে, তাহলে সেই জাতির উত্থান কেউ আটকে রাখতে পারে না।

যখন ৮০-র দশকে অধিকাংশ মানুষই হতাশায় নিমজ্জিত ছিল, আমরা আশাবাদের কথা বলতে শুরু করলাম। সম্ভাবনার কথা বলতে শুরু করলাম। ৯০-এর দশকে আমরা মনছবি দেখলাম। সবাইকে বললাম, আসুন! মনছবি দেখুন, বাংলাদেশ পৃথিবীর সেরা ১০ জাতির এক জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি, অর্থনীতি এবং উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা ১০-এর মধ্যে প্রবেশ করেছি।

আত্মপ্রত্যয়, মস্তিষ্কের ব্যবহার এবং দিগন্তের সীমানা ছাড়িয়ে যাওয়ার স্বপ্ন শুধু একজন মানুষকে নয়, একটা জনগোষ্ঠীকে, একটা জাতিকে, একটা দেশকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। আমরা করুণাময়ের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি যে, আমাদের আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটছে। ৮০-র দশক, ৯০-এর দশকেও আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোতে মাসে একদিন, সাধারণত শুক্রবার দুপুরে গোশত রান্না হতো। সেদিন বাড়িতে উৎসবের আমেজ থাকত। আর এখন সপ্তাহে তিন-চার দিন, এমনকি অনেক পরিবারে প্রতিদিনই গোশতের আয়োজন হচ্ছে।

তবে যখন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটে, তখন মানুষের জীবনযাপনে নানা

ধরনের অনাচার বিলাসিতা বাহুল্য ছড়িয়ে পড়ে। ফুটানির জন্যে দুরাচার ভোগবিলাস মদ ও জুয়ার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। সাত্ত্বিক খাবার ছেড়ে রাজসিক-তামসিক খাবারের দিকে মানুষ ঝুঁকে পড়ে। গত ১০ বছরে শুধু রাজধানী নয়, শহর-গ্রামে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর খাবারের দোকান! কফি এবং ফাস্ট ফুডের দোকানে ছেয়ে গেছে চারপাশ। অথচ গভীর নিদ্রার জন্যে সবচেয়ে ক্ষতিকর পানীয় কফি।

মিষ্টি এবং ক্ষতিকর ড্রিংকস পানের অভ্যাস শুধু শহুরে জীবনে নয়, গ্রামীণ জীবনেও ব্যাপকভাবে অনুপ্রবেশ করেছে। নিষ্ক্রিয়, বিলাসী এবং অতিভোজনে আগ্রহী হওয়ার কারণে ডায়াবেটিস, কোলন ও স্তন ক্যান্সার, হৃদরোগ, আর্থ্রাইটিস, হাড়ক্ষয়, বিষণ্নতাসহ বহু রোগের বিস্তার ঘটেছে। অর্থের সাথে সাথে বেড়েছে শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা। আগে একজন মানুষ যেখানে অনায়াসে হেঁটে যেত, এখন সে রিকশা, মোটর সাইকেল বা সিএনজি ছাড়া যায় না। সামর্থ্য থাকলে ব্যক্তিগত গাড়ি বা উবারে চলাফেরা করে। তিন-চার তলায় যেতেও সিঁড়ির বদলে সে লিফট ব্যবহার করে। সোফা এবং চেয়ারের ক্ষতিকর প্রভাবও সর্বত্র।

আসলে ধূমপান ও এইডসে যত মানুষ মারা যায়, তার চেয়ে বেশি মারা যায় দীর্ঘসময় চেয়ার বা সোফায় বসে থাকার কারণে সৃষ্ট রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে। দীর্ঘসময় একটানা চেয়ার বা সোফায় বসা কেন ক্ষতিকর? ক্যালরি সাথে সাথে ব্যবহার করা যায় না, শরীর সেটাকে চর্বি বানিয়ে ফেলে। এক ধরনের এনজাইম এই চর্বিকে ভেঙে ফ্যাটি এসিড তৈরি করে। মাংসপেশি সেই ফ্যাটি এসিডকে হজম করে ফেলে। ফলে রক্তে চর্বি জমতে পারে না। কিন্তু আপনি যখন একটানা দীর্ঘসময় চেয়ারে বসে থাকেন, তখন মাংসপেশির তেমন কোনো কাজ থাকে না। সে ভাবে—খামোখা ফ্যাটি এসিড হজম করতে বাড়তি পরিশ্রম করার দরকারটা কী? তখন এনজাইম উৎপাদন কমে যায়। রক্তে চর্বি জমতে শুরু করে। এক পর্যায়ে রক্তের এই চর্বি থেকে সৃষ্টি হয় হৃদরোগ।

প্রতিকারটা কী? কীভাবে মাংসপেশিকে এনজাইম তৈরি ও ফ্যাটি এসিড হজমের প্রক্রিয়ায় রাখা যায়? আসলে বিষয়টি খুব সহজ। শুধু একটি আসন করবেন। সেটি হলো বঙ্গাসন। সৃষ্টির শুরুতে মানুষ যখন দাঁড়ানো থেকে বসতে শিখেছে, তখন সে এই আসনেই বসেছে। এটি হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে আদি আসন। আমরা এ আসনের নাম দিয়েছি বঙ্গাসন।

বঙ্গাসন করা খুব সহজ। দুই পায়ের ওপর সমান ভর দিয়ে দাঁড়ান। দু-পায়ের মাঝখানে এক ফুট বা আরামদায়ক পরিমাণ ফাঁক রাখুন। তারপর বসুন। পায়ের পাতা মাটিতে লেগে থাকবে, নিতম্বের ভর গোড়ালির ওপর পড়বে। হাঁটুর ওপরে অথবা দু-পাশে দু-হাত রাখুন।

বাংলার মানুষ ৫০ বছর আগেও যখন জেয়াফতে বা দাওয়াতে যেত, মাটিতে এভাবেই বসত। নিতম্ব মাটি স্পর্শ করত না। এখনো আপনি যদি রাস্তায় বের হন, শ্রমিকেরা সকালবেলা রাস্তার ধারে যেখানে কাজের জন্যে অপেক্ষা করে, সেখানে গিয়ে দেখবেন যে, তারা এভাবে বসে আছে। আদিকাল থেকে মানুষ এই আসনটিকেই ব্যবহার করত মলত্যাগের ক্ষেত্রে।

আপনি যখন চেয়ারে না বসে বঙ্গাসনে বসছেন, তখন পায়ের পেশিগুলো পাঁচ গুণ বেশি তৎপর হয়ে ওঠে। দাঁড়িয়ে থাকলে যে পরিমাণ ক্যালরি বার্ন-আউট হয়, বঙ্গাসনে বসলে সে পরিমাণ ক্যালরি বার্ন-আউট হয়। পায়ের পেশি মজবুত হয়। পা, ঊরু, পেটের পেশি ও মেদভুঁড়ির ওপর চাপ পড়ে। ফলে এই আসনে বসার অভ্যাস করলে পেটের বাড়তি মেদ কমে যায়।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ফলে আমাদের জীবনে আরেক বড় বিড়ম্বনা হচ্ছে হাই কমোড। ৮০-র দশক থেকে এর সূচনা। আর একবিংশ শতাব্দীতে এসে এটা তো এখন স্ট্যাটাস সিম্বল হয়ে গেছে! যেন হাই কমোড না বসানো হলে মান-সম্মান-জাত থাকবে না! অথচ পাশ্চাত্যে এখন হাই কমোড বর্জন করা হচ্ছে। কারণ চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা গত ৫০ বছর ধরে গবেষণা করে দেখেছেন যে, মলত্যাগের স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যসম্মত ভঙ্গি হলো—দুই ঊরু পেটের সাথে লেগে থাকলে মলদ্বার পুরোপুরি প্রশস্ত হয়। মলত্যাগ খুব সহজে হয়। হাই কমোডে বসলে মলদ্বার পুরোপুরি প্রশস্ত হতে পারে না। পেটে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি চাপ পড়ে। পায়ুপথের শিরা টান খায় ও ফুলে যায়। যে কারণে দীর্ঘদিন ধরে হাই কমোডে যারা অভ্যস্ত তারা হেমোরয়েড ও কোষ্ঠকাঠিন্যে আক্রান্ত হতে পারেন।

আমেরিকান কলেজ অব গ্যাস্ট্রো-এন্টারোলজির পরিসংখ্যান হচ্ছে, বয়স ৫০ হওয়ার আগেই আমেরিকার অর্ধেক মানুষ হেমোরয়েডে ভুগতে শুরু করেন। তাদের পায়ুপথের শিরা ফুলে যায় এবং মলত্যাগের সময় রক্ত পড়ে। এমনকি আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার ১৯৭৮ সালে ক্রিসমাসের আগে পায়ুপথে হেমোরয়েডের কারণে কাজ থেকে বিরতি নিতে বাধ্য হন। তার ব্যথা এত প্রবল ছিল যে, এক সপ্তাহ তিনি ছুটি কাটান। একজন প্রক্টোলজিস্ট

(পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ) তাকে বলেন যে, কমোড নিয়মিত ব্যবহারের ফলেই প্রেসিডেন্ট অসুস্থ হয়েছেন। আমাদের শারীরিক কাঠামো হাই কমোডে নয়, প্যানে বসার উপযুক্ত। অর্থাৎ কমোডের পরিবর্তে আমরা যে প্যান ব্যবহার করি, এটা হচ্ছে মলত্যাগের জন্যে সবচেয়ে আদর্শ।

বঙ্গাসন আপনার শরীরকে, বিশেষত হাঁটু ঊরু পেট হাড় পেশি ফিট রাখবে। তাই ধীরে ধীরে বঙ্গাসনে বসার অভ্যাস করুন। রিভলভিং চেয়ার বর্জন করুন। সোফা বর্জন করুন। একদিনে হবে না, কিন্তু আস্তে আস্তে আমরা এ অভ্যাস গড়ে তুলতে পারি।

যে-সব গর্ভবতী মহিলা নরমাল ডেলিভারি চান, সুস্থ স্বাভাবিক সন্তান প্রসব করতে চান, তারা সোফা এবং আরামদায়ক চেয়ার বর্জন করুন। বঙ্গাসনে বসে কাজ করার অভ্যাস করুন। নিয়মিত অভ্যাসে এমন সময় আসবে যখন আধাঘণ্টা-একঘণ্টা আপনি বঙ্গাসনেই বসে থাকতে পারবেন। যেভাবে বঙ্গাসনে বসে আমাদের মা-খালারা কাজ করতেন, ঠিক একই প্রক্রিয়ায় যখন কাজ করবেন, আপনার দৈহিক সুস্থতা বাড়বে, স্বাভাবিকভাবে সন্তান প্রসব সহজ হবে। সিজারের প্রয়োজন হবে না।

যাদেরই নিজের বাড়ি আছে, তারা হাই কমোড যদি লাগিয়েও থাকেন, এর পরিবর্তে সেই প্যান ব্যবহার করবেন, যেটা আমরা ব্যবহার করতাম শত শত বছর ধরে। তাতে রেচন প্রক্রিয়া স্বাভাবিক হবে। স্বল্প সময়ে মলত্যাগ করতে পারবেন। কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে আপনি বেঁচে যাবেন। পায়ুপথের শিরা শক্ত হওয়া এবং রক্তপাত থেকে বেঁচে যাবেন।

প্রিয় সুহৃদ! আমাদের আর্থিক সমৃদ্ধিকে দীর্ঘস্থায়ী ও কল্যাণকর করার জন্যে প্রয়োজন সুস্থ জীবনাচার এবং নৈতিক পুনর্জাগরণ। আর নৈতিক পুনর্জাগরণের জন্যে প্রয়োজন দুরাচার বর্জন। নিজেকে ধীরে ধীরে শুদ্ধাচারী করার লক্ষ্যে *শুদ্ধাচার* বইটি শুধু নিজে পড়বেন না, এটি চারপাশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেবেন। কারণ চারপাশের মানুষ যদি ধীরে ধীরে শুদ্ধাচারী হয়ে ওঠে তাহলেই সমাজ শুদ্ধাচারী হবে। সমাজ শুদ্ধাচারী হলে আমাদের আর্থিক সমৃদ্ধির সুফল আমরা দীর্ঘকাল ধরে উপভোগ করতে পারব।

আপনাদের জীবন কর্মময় হোক। সবসময় নিজেকে কাজের মধ্যে রাখুন, ব্যস্ত থাকুন। শরীরটাকে গতির মধ্যে রাখুন। যখনই সম্ভব হাঁটুন। ইয়োগা করুন। সেইসাথে মনকে স্থির করার জন্যে নিয়মিত মেডিটেশন করুন।

অপচয় করে নিঃস্ব

আমি পরম করুণাময়ের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত, কোয়ান্টামমে পর পর দুই শুক্রবার সাদাকায়ন করার সৌভাগ্য হলো। যতদূর মনে পড়ে—কোয়ান্টামমে এর আগে পর পর দুটি সাদাকায়ন করার সুযোগ আমি পাই নি।

শুধু লামার সদস্যরা না, সাদাকায়নে দেশের দূরদূরান্ত থেকে আমাদের পরিবারের সদস্যরা এসেছেন। যারা জিমনেসিয়ামে রাত্রিযাপন করেছেন এবং ভোরের ঠান্ডা বাতাস উপভোগ করেছেন, তাদেরকে অভিনন্দন। তাদের জন্যে বিশেষভাবে দোয়া করি। জিমনেসিয়ামের বাতাস খুব ঠান্ডা। কারণ ওখানে উত্তর দিকটা ফাঁকা। উত্তরের বাতাস ... আহা-হা! কী চমৎকার!

লামায় শীত উপভোগ করেছিলাম এখন থেকে ১৮-২০ বছর আগে। যখন আমরা প্রথম 'ধ্যান উৎসব'-এর আয়োজন করি, তখন এখানে একটা টিনের চালা ছিল। ভেতরে খড় বিছানো ছিল। কাজী মাহ্‌তাব সাহেব ছিলেন। সর্দার নুরুজ্জামান ছিলেন। রাত্রিবেলা এত শীত! আর বাতাস ... প্রত্যেকের জন্যে বরাদ্দ পাতলা কম্বল, যা দিয়ে শীত মানে না। তারা সবাই কম্বল শরীরে পেঁচিয়ে রেখে মধ্যরাতে কম্বল খুঁজছেন; যে, কম্বল গেল কোথায়! অবশ্য গতকাল যারা জিমনেসিয়ামে ছিলেন, তারা শীত অতটা অনুভব করতে পারেন নি। কারণ তারা সবাই পর্যাপ্ত কম্বল পেয়েছেন।

এখানে আপনাদের যে আসার আগ্রহ—রাতে ঘুমানোর জায়গা না থাকুক তবুও আসবেনই। এই আগ্রহটাই মানুষের ভেতরের চেতনাকে উন্মোচিত করে। এই আগ্রহটাই নতুন সভ্যতা গড়ে তোলে।

আজকের সাদাকায়নের আলোচ্য বিষয় : *অপচয় করে নিঃস্ব*। মূলত দুটি শব্দ—অপচয় ও নিঃস্ব। দুটি শব্দের উপর ভিত্তি করেই আজকের আলোচনা।

অপচয় কীভাবে নিঃস্ব করে? মোঘল শব্দটা ইংরেজি ভাষায় ঢুকেছে অপচয় এবং বিলাসিতার প্রতীক হিসেবে। যেমন : মোঘলাই খাবার। মোঘলরা খ্যাতি লাভ করল অপচয় ও বিলাসিতা করে।

সম্রাট শাহজাহান একটা বাড়ি বানালেন। যে বাড়িতে কোনো জীবিত ব্যক্তি কখনো বাস করে নি; দুটো মৃতদেহ অবস্থান করছে। ২০ হাজার শ্রমিক ২২ বছর পরিশ্রম করল। হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ হলো। অথচ কোনো জীবিত মানুষ এ বাড়িতে থাকল না!

১৯৫৮ সালে সিপাহী বিপ্লবের ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রোগ্রাম হয়। তখন খোঁজা হলো, মোঘল সম্রাটদের বংশধরদের পাওয়া যায় কিনা। খুঁজতে খুঁজতে দুজনকে পাওয়া গেল। সম্রাট শাহজাহানের উত্তরপুরুষ সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের নাতি—একজন কলকাতায় টাঙ্গা চালায়। হাতে টানা রিকশার নাম হচ্ছে টাঙ্গা। আরেকজন দিল্লীতে ধোপার কাজ করে। তাদের জিজ্ঞেস করা হলো—তোমরা পরিচয় দাও না কেন? তারা বলল, যে-ই পরিচয় শোনে, বলে, কেয়া থা, কেয়া হো গায়া! মোঘলরা কী ছিল, আর কী অবস্থা হলো!

যুগে যুগে কখনো এরকম মোঘলদের কিন্তু অভাব হয় নি। যে-রকম নব্বইয়ের দশকের ফুটবল মোঘল ম্যারাডোনা। মারা গেলেন কয়েকদিন আগে। আর্জেন্টিনা তার মৃত্যুতে তিন দিনের শোক ঘোষণা করেছে। যখন ফুটবল খেলতেন, কত টাকা তিনি আয় করেছিলেন—এটা আল্লাহ আলেমুল গায়েব ছাড়া কেউ বলতে পারবে না। সেই সময়কার সবচেয়ে নামিদামি ফুটবল খেলোয়াড় ম্যারাডোনার নামে কর ফাঁকির মামলা হয়েছে। অভিযোগ হচ্ছে—শুধু কর ফাঁকি দিয়েছেন তিনি আমাদের টাকায় ৩৭১ কোটি টাকা।

সব চালাকি, সব ফাঁকিই কি ধরা পড়ে? চোরাচালানে স্বর্ণ যত আসে, মাঝে মাঝে কিছু কিছু ধরা পড়ে। ম্যারাডোনা নিজেও বলতে পারতেন না তার সম্পদের হিসাব। উনি কোনো হিসাব রাখতেন না। কারণ হিসাব রাখলেই তো ট্যাক্স দিতে হবে!

মৃত্যুর সময় কী পাওয়া গেল? ঋণ জর্জরিত ম্যারাডোনার কাছে আছে মাত্র এক লক্ষ ডলার। আমাদের টাকায় ৮৫ লক্ষ টাকা। তাহলে এত উপার্জন করার পরেও কেন তিনি নিঃস্ব হলেন? যার কর ফাঁকির পরিমাণই হচ্ছে ৩৭১ কোটি টাকা, তিনি এক কোটি টাকাও ব্যাংকে নিজের সঞ্চয় হিসেবে রেখে যেতে পারলেন না। কারণটা হচ্ছে—অপচয় এবং বিলাসিতা। অপচয় মোঘলকেও নিঃস্ব করে দেয়।

অপচয় কেন নিঃস্ব করে? ধর্মে বলা হয়েছে, অপচয়কারী হচ্ছে শয়তানের ভাই। শয়তান আল্লাহ তায়ালার চাকরি করল এত বছর! লক্ষ বছর ইবাদত করতে করতে সে ফেরেশতাদের সর্দার হয়ে গেল। ফেরেশতাদের সর্দার মানে সিইও। চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার। কারণ আল্লাহর এক্সিকিউটিভ তো ফেরেশতা। নাকি আমি ভুল বললাম? সর্দার মানেটা কী? লিডার। সিইও।

সেই শয়তানের কী হলো? লক্ষ বছর ইবাদত করার পরও সে নিঃস্ব হয়ে গেল। অর্থাৎ বিতাড়িত বা বহিষ্কৃত হলো। শুধু চাকরি থেকে না, পুরো জায়গা থেকে। কেন? সে তার ক্ষমতার অপচয় করেছিল। শয়তান আল্লাহর সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করেছিল; যে, (নাউজুবিল্লাহ!) আপনি যেটা করছেন, তা ভুল। আপনি যে অর্ডার দিয়েছেন, এটা আমি মানি না। এটা হচ্ছে অপচয়। আপনাকে যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, ক্ষমতা অনুসারে যা করা উচিত সেটা যদি না করেন—এটা অপচয়।

শয়তানের ভাই হলে কী হবে? শয়তানের বিষ্ঠার শিকার হবেন। খ্রিষ্টান ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস। অত্যন্ত মানবপ্রেমিক। বঞ্চিত ও সাধারণ মানুষের দুর্গতির কারণকে তিনি চিহ্নিত করেছেন। তিনি শয়তানের সবচেয়ে মোক্ষম অস্ত্রের নাম দিয়েছেন শয়তানের বিষ্ঠা (ডেভিল'স ডাঙ)। সেটা হচ্ছে হাইপার কনজ্যুমারিজম। ম্যারাডোনা কেন নিঃস্ব হলেন? অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটা করতে করতে আর মাদকাসক্তিতে তিনি নিঃস্ব হয়েছেন।

অপচয় কী? অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ই অপচয়। হাইপার কনজ্যুমারিজম—শয়তানের বিষ্ঠা যখন আপনি গলাধঃকরণ করবেন, ঋণগ্রস্ত হয়ে মারা যাওয়া ছাড়া আপনার দ্বিতীয় কোনো উপায় নেই। হাইপার কনজ্যুমারিজমে আক্রান্ত যত দেশ আছে, সবগুলো দেশ ঋণগ্রস্ত। এসব দেশের মধ্যে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আমেরিকা, যাকে আমরা স্বর্গ মনে করি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর আমেরিকা হাইপার পাওয়ারে রূপান্তরিত হয়েছিল। আর এখন আমেরিকা হাইপার লোনার। চীনের কাছে, জাপানের কাছে তাদের ঋণ। যা-তা ঋণ নয়, এক ট্রিলিয়ন ডলার। কেন? কারণ আমেরিকানরা যত খাবার কেনে, তার ৩০% ফেলে দেয়। অপচয় করে। ৩০% আসলেই খায়। বাকি ৪০% জোর করে খায়। যার ফলে দে বিকাম ফ্যাটি। ফ্যাট থেকে যত অসুখ হয়, সব তাদের হয়েছে।

আমেরিকানদের অর্থনীতি হলো ক্ষয়িষ্ণু এক অর্থনীতি। আমেরিকা এখন আর ইকোনমিক সুপার পাওয়ার নেই। প্রত্যেকের একাধিক ক্রেডিট কার্ডের

বিপরীতে তাদের ঋণের পরিমাণ এখন ৩৩/৩৪ হাজার ডলার। মানুষ যখন পণ্যদাস হয়, ঋণজর্জরিত হওয়া ছাড়া তার আর কোনো বিকল্প পথ থাকে না।

আবার মিতব্যয়িতা কী? বরকত কী?

একজন অনেক বড় দাতাও মিতব্যয়ী হতে পারেন।

উসমান (রা) মুসলমানদের তৃতীয় খলিফা। তিনি ধনী ছিলেন, দাতা ছিলেন, কিন্তু মিতব্যয়ী ছিলেন। তাকে নিয়ে খুব বিখ্যাত একটা ঘটনা আছে। একবার এক অভাবী মানুষ নবীজীর (স) কাছে এসে সাহায্য চাইলেন। নবীজীর (স) কাছে যখন কিছু থাকত, তিনি দিয়ে দিতেন। সেদিন দেয়ার মতো কিছু ছিল না। তিনি বললেন, ঠিক আছে, তুমি উসমানের কাছে যাও।

লোকটা উসমানের (রা) কাছে গেলেন। গিয়ে দেখেন, গমের স্তূপ। ওখান থেকে একদল পিঁপড়া কয়েকটা গম গর্তের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এটা দেখে উসমান (রা) গর্তের মুখে কিছু গম ছড়িয়ে দিলেন। আর বাকি গম খুব সুন্দরভাবে সংরক্ষণ করলেন যেন পিঁপড়া এগুলো টেনে নিয়ে যেতে না পারে।

এই দৃশ্য দেখে লোকটা ভাবলেন, হায় আল্লাহ! রসুলুল্লাহ (স) এইরকম কৃপণ লোকের কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন! পিঁপড়া গম নিলে কয়টা গম আর নিতে পারবে! সে পিঁপড়ার মুখ থেকে গম বাঁচিয়ে রাখছে!

খেয়াল করবেন, উসমান (রা) কিন্তু কিছু গম পিঁপড়ার গর্তের মুখে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সাহায্যপ্রার্থী লোকটির দৃষ্টিতে পড়ল, উসমান (রা) পিঁপড়ার মুখ থেকে গম কেড়ে নিচ্ছে! তিনি ভাবছেন—এরকম কৃপণ লোকের কাছ থেকে আর কী পাওয়া যাবে! পরদিন তিনি রসুলুল্লাহর (স) কাছে আবার গেলেন। পুরো ঘটনা খুলে বললেন। বললেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! এই কৃপণ লোকের কাছ থেকে কিছুই আশা করা যায় না।

পরদিনও রসুলুল্লাহ (স) বললেন, তুমি উসমানের কাছে যাও।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি গেলেন। যেতে যেতে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। গিয়ে দেখেন, প্রদীপ জ্বালানো হয়েছে। প্রদীপকে গ্রামে কুপি বলে। কুপির সলতেটা একটু বড় করা। উনি তার খাদেমকে ডেকে বলছেন, তুমি এই সলতেটা বড় করে দিয়েছ কেন? জানো না সলতে বড় করে দিলে তেল বেশি খরচ হয়?

একথা সাহায্যপ্রার্থী লোকটি যখন শুনলেন, স্বাভাবিকভাবে আবারো ভাবলেন যে, এরকম কৃপণ লোক! আরে আমার ঘরে যখন বাতি জ্বলে, আমিও তো সলতে নিয়ে চিন্তা করি না! এই লোক আমাকে কী সাহায্য করবে! সাহায্যপ্রত্যাশী লোকটি ফিরে গেলেন।

পরদিন লোকটি আবার নবীজীর (স) কাছে গেলেন। নবীজী আবারো বললেন, তুমি উসমানের কাছেই যাও। লোকটি বললেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! এই লোকের কাছ থেকে কোনোকিছুই পাওয়ার আশা করা যায় না।

নবীজী (স) মৃদু হেসে আবার বললেন, তুমি উসমানের কাছে যাও।

পরদিন তিনি সকালেই গেলেন। উসমান (রা) তুলা শুকাতে দিয়েছেন ঘরের উঠানে। তুলা যাতে উড়ে না যায় সেজন্যে জালি দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। যখন কিছু তুলা উড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, উসমান (রা) উড়ে যাওয়া তুলা ধরে জালির মধ্যে ঢুকাচ্ছিলেন। তিনি আবারো নিশ্চিত হলেন, এই লোকের কাছ থেকে কোনোকিছুই প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু রসুলুল্লাহ (স) যেহেতু তাকে তৃতীয় বারের মতো পাঠিয়েছেন, তিনি ভাবলেন, এবার আমি যদি সাহায্য না চাই, তাহলে তো নবীজীর (স) সাথে বেয়াদবি হয়ে যাবে।

তিনি নিশ্চিত ছিলেন—কিচ্ছু পাওয়া যাবে না। তারপরও তিনি গেলেন। এরপর উসমান (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে কে পাঠিয়েছে? লোকটি বললেন, আল্লাহর রসুল। উসমান (রা) চিন্তা করলেন, স্বয়ং নবীজী যাকে পাঠিয়েছেন, তিনি নিশ্চয়ই প্রকৃত অভাবী। সাহায্য পাওয়ার যোগ্য। তা না হলে নবীজী (স) তাকে পাঠাতেন না। তিনি ভাবছিলেন যে, কী সাহায্য করা যায়!

এর মধ্যে দূর থেকে দেখা যাচ্ছে এক বাণিজ্য কাফেলা। কাফেলা যখন কাছে এসেছে, উসমান (রা) নিশ্চিত হলেন—এটা তারই কাফেলা। বললেন, দেখো, এই যে উটের কাফেলা, এখান থেকে উটের পিঠের মালামালসহ যে উটটা তোমার পছন্দ, সেটা তোমার। তুমি পছন্দ করে নিয়ে যেতে পারো।

সাহায্যপ্রত্যাশী লোকটির পছন্দ হলো প্রথম উটটা। ওটা একটু তাগড়া এবং মালের স্তূপটাও বড়। তিনি খাদেমকে গিয়ে বললেন, উসমান আমাকে পাঠিয়েছেন। এই উটটা আমার পছন্দ। এটা আমাকে দিয়ে দাও। খাদেম সেই উটটি দিয়ে দিলো।

উট মরুভূমিতে সারিবদ্ধভাবে চলে। প্রথম উট যেদিকে যায়, পরের উটগুলোও সেদিকেই যায়। প্রথম উটটা নিয়ে লোকটি যখন রওনা দিয়েছেন, বাকি উটগুলোও উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমটার পেছনে রওনা দিয়েছে।

একটা উট নিতে বলেছে, সবগুলো উট এর পেছন পেছন যাচ্ছে। খাদেম বলল, আগে আমরা গন্তব্যে পৌঁছাই, সব থামুক। তারপরে তুমি উটটা নিও। এই কথা শুনে উসমান (রা) বললেন, তাকে যেটা দেয়া হয়েছে সেটা সে নিয়ে

যাক। এর পেছনে যতগুলো যায় যাক। ১০০ উটের কাফেলা ছিল। সব উট মালামালসহ তিনি নিয়ে গেলেন।

লোকটি বিস্ময়ে হতবাক! যখন উসমানকে (রা) লোকটি জিজ্ঞেস করলেন, এত বড় কৃপণের দ্বারা এত বড় দান কীভাবে সম্ভব হলো! (গত তিন দিনের ঘটনা তাকে খুলে বললেন) তখন উসমান (রা) তাকে বললেন, দেখ! সমস্ত সম্পদের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। মানুষ হলো এর তত্ত্বাবধায়ক। সে শুধু আল্লাহর ইচ্ছানুসারেই এ সম্পদ নিজের জন্যে এবং সমাজের জন্যে ব্যয় করার অধিকার রাখে। যে নিজের জন্যে এবং সমাজের কল্যাণে ব্যয় করবে, তার কোনো অভাব কখনো থাকতে পারে না।

উসমানের (রা) জীবন যদি আমরা দেখি, তিনি যেদিকে তাকাতেন, অর্থ এসে তার চারপাশে ঘোরাঘুরি করত যে, আমাকে নাও! শুধু ব্যক্তিজীবনে নয়, উসমান (রা) যখন খলিফা হলেন, কিছুদিনের মধ্যেই আরবে অভাব বলে কিছু থাকল না। যাকাত নেয়ার মতো কেউ ছিল না। কারণ তিনি ব্যবসা বুঝতেন, হিসাব বুঝতেন, মিতব্যয়িতা বুঝতেন। আবার বুঝতেন যে, কোনটা অপচয়, কোনটা দান। যার ফলে পুরো খেলাফতে কোনো অভাব ছিল না।

প্রাচুর্য এলো। বরকত এলো। বরকত আসে তখন, যখন মানুষ মিতব্যয়ী হয়। নিজের কল্যাণে এবং অন্যের কল্যাণে ব্যয় করে। ভাবে না—হায় হায়! আমার কী হবে! সব তো ব্যয় করে ফেললাম! অন্যের কল্যাণে ব্যয় করতে গিয়ে যখন সে কৃপণ হয় না, শঙ্কিত হয় না, তখন কল্যাণ আসতে থাকে।

আমাদের সমাজে কী হচ্ছে? মাল্টিন্যাশনালের কর্মী থেকে শুরু করে গার্মেন্টস-এর শ্রমিক, সবাই কমবেশি অপচয় করছে। যিনি পাঁচ লক্ষ টাকা বেতন পাচ্ছেন, তারও ১০ লক্ষ টাকা ঋণ। অনেকের ৩০ লক্ষ, ৪০ লক্ষ, ৫০ লক্ষ বা কোটি টাকার ওপর ঋণ। কেন? এক গার্মেন্টস মালিক বলছিলেন, নিচতলায় একটা ফটো তোলার স্টুডিও আছে। গার্মেন্টস-এর মহিলা-শ্রমিকরা বেতন পেয়েই সেজেগুজে ওখানে ছবি তোলে। ছবি তুলে কী করবে? কয়দিন রাখবে? এটা তার জীবনে কখনো কোনো কাজে লাগবে? কয়জন তার ছবি দেখবে? সে নিজে জোর করে কয়জনকে দেখাবে?

আর কী করছে সে? স্মার্টফোনে ডাটা ভরছে। ফেসবুকিং করে, চ্যাটিং করে, খেজুরে-আলাপ করে টাকা শেষ। অর্থাৎ সে যা উপার্জন করছে তা সে নিজের কল্যাণে, অন্যের কল্যাণে ব্যয় করতে পারছে না। অপচয় করে ফেলছে। লাভবান কে হচ্ছে? যারা 'শয়তানের বিষ্ঠা'র পরিচালক তারা।

আমরা মৃত্যুর আগেও অপচয় করি, মৃত্যুর পরেও করি। সামাজিক অনুষ্ঠান—জন্মদিন, বিয়ে থেকে শুরু করে মৃত্যুর পরে জেয়াফত। সেখানে আমরা প্রচুর অপচয় করি। অনেক খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করি। নেট রেজাল্ট কী হয়? খাওয়াদাওয়া করে অধিকাংশ মেহমানই খাবার অথবা আয়োজনের বদনাম করতে করতে চলে যায়।

চট্টগ্রামে এক কোয়ান্টাম সদস্যের মা মারা গেলেন। মেজবানি করবেন। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-বন্ধুদেরকে বললেন, দেখ! মেজবানিতে যে টাকা ব্যয় করব, সেই টাকা দিয়ে যদি গ্রামে একটা ডিপ টিউবওয়েল বসানো হয়, তাহলে কি তোমরা খুশি হবে? সবাই বলল, উত্তম প্রস্তাব। একটা ডিপ টিউবওয়েল বসানো হলো এবং তার গ্রামের মানুষের সুপেয় পানির অভাব দূর হয়ে গেল।

মেজবানি করে খাওয়ালে দোয়ার চেয়ে বদনাম বেশি হতো। আর এই ডিপ টিউবওয়েলের পানি যতদিন গ্রামবাসীরা পেতে থাকবে, এটা তার মায়ের নামে সদকায়ে জারিয়া হয়ে গেল। অর্থাৎ একই ব্যয় আপনি করলেন। একটা হলো অপচয়, আরেকটা হলো সঞ্চয়। পরকালীন সঞ্চয়। সঞ্চয় তো দুই ধরনের। একটা ইহকালের, আরেকটা পরকালের।

কেনাকাটার ক্ষেত্রে যত ধুম-ধারাক্কা কম করেন, তত ভালো। অপচয় করবেন না। বিয়ের অনুষ্ঠানে আত্মীয়স্বজনকে দাওয়াত দিয়েছেন। একটু ভালোভাবে আপ্যায়ন করতে চাইবেন—সেটাই স্বাভাবিক। ঠিক আছে, আয়োজন করেন। কিন্তু অপচয় করবেন না।

আলহামদুলিল্লাহ! আমরা খাবার অপচয় করি না। আপনাদের মা-জী এই ব্যাপারে এত হিসেবী! আমরা তো খুব আতঙ্কে থাকি। ধরুন, গ্লাস ভর্তি করে পানি যদি নিই, যদি কিছু পানি গ্লাসে থেকে যায় তো উনি ডাকেন। বলেন, এই পানির পেছনে কত কষ্ট করা হয়েছে, কত খরচ হয়েছে জানো? এটা প্রথমে ওয়াসার পাইপলাইন থেকে কেনা হয়েছে। তারপর গ্যাসের চুলায় ফুটানো হয়েছে। তারপরে ফিল্টারে দেয়া হয়েছে। এটা অপচয় হলো না? আমি বলি, অবশ্যই অপচয় হয়েছে। আমি তো খেয়াল করি নি। অতএব আমার গ্লাসে থেকে যাওয়া অবশিষ্ট পানি আমি খেয়ে ফেলি।

এক মায়ের কথা জানি। তিনি ছিলেন তার বাবার আদরের কন্যা। আদরের কন্যা হলে যা হয়। খাবার পছন্দ হয় নি, প্লেটসহ ছুড়ে মারতেন। খাবেন না। খাবারও গেল, প্লেটও গেল। মহিলার ছেলে তার মাকে খুব ভালবাসত। শেষ জীবনে তিনি ছেলের কাছে যদি কিছু খেতে চাইতেন, ছেলে

বাজারে গিয়ে সেসময় পাওয়ার কথা এমন জিনিস বহু দোকান ঘুরেও পেত না—এমনকি কাবাব পর্যন্ত। দোকানদার বলত যে, শেষ! বিক্রি হয়ে গেছে!

যখন একজন মানুষ খাবার অপচয় করে, তার জীবন থেকে রিজিক কিন্তু উঠে যায়। 'আপনি যত পারেন খান' মানে এই নয় যে, সব খান। পরিমিত খেতে হবে। আপনি ভালো থাকবেন।

আপনার পোশাক কেনার খুব শখ। একটা শাড়ি কিনলেন। দুই বার বা তিন বার পরেছেন। অনেকের কাছে একবার পরলেই পুরনো হয়ে যায়। এই শাড়ি আর আপনার পরা হবে না। এখন এই অপচয়ের হাত থেকে বাঁচার উপায় কী? শাড়িটা এমন কাউকে দিয়ে দিন, যার প্রয়োজন। যিনি এত দাম দিয়ে শাড়ি কিনতে পারবেন না কিন্তু পেলে খুব খুশি হবেন, যত্ন করবেন—সে-রকম কাউকে দিয়ে দিন।

পুরুষরা আবার এভাবে চিন্তা করবেন না। আমার এই যে আলখেল্লা, আলহামদুলিল্লাহ! ২০০২ সাল থেকে—১৮ বছর ধরে চলছে। কিন্তু একজন মহিলার পক্ষে ১৮ বছর ধরে এক পোশাক পরা ইম্পসিবল। তাদের কাছ থেকে এটা আমরা প্রত্যাশাও করব না। কারণ মহিলারা সবসময় খুব ফ্রেশ, খুব টিপটপ থাকতে চান। কিন্তু যে শাড়ি অথবা থ্রি-পিস আর পরবেন না, সেটা জমিয়ে না রেখে ভালো থাকতে থাকতে আরেকজনকে দিয়ে দিন। নতুন তিনটা কিনবেন, ঠিক আছে। পুরনো তিনটা শাড়ি অথবা থ্রি-পিস ধুয়ে ইস্ত্রি করে এরকম আরেকজনকে দিয়ে দিন যার কম আছে, যা পেয়ে তিনি খুশি হবেন। এটা কিন্তু অনেক উত্তম দান।

জীবনের রূঢ় বাস্তবতা হচ্ছে—যত উপার্জন করেন, বরকত না থাকলে আপনি স্বস্তি পাবেন না। ধরুন, এমএনসি-র একজন অফিসার তিন থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা মাসে বেতন পাচ্ছেন। তার কেন কোটি টাকা ঋণ হবে? তাকে জিজ্ঞেস করুন—তিনি বলবেন, ঋণ হয়ে যায়। তার বেতন তিন, চার, পাঁচ লক্ষ টাকা। যা-ই হোক, তা থেকে খুব একটা বাঁচাতে পারছেন না। এই খরচ, সেই খরচ, এই স্ট্যাটাস, সেই স্ট্যাটাস—মানে স্ট্যাটাসের পেছনে খরচ হয়ে যাচ্ছে। তারপর ঘাড়ে ব্যথা, পিঠে ব্যথা, কোমরে ব্যথা, এই রোগ, সেই রোগ, শালীর রোগ, সম্বন্ধীর রোগ, মায়ের রোগ, অমুকের রোগ ...। যা তিনি উপার্জন করলেন, এই অর্থটা ব্যয় হয়ে গেল। তিনি কিন্তু ধরে রাখতে পারলেন না। কেন? আমি বলব না তার উপার্জন শুদ্ধ নয়, কিন্তু তার জীবনে বরকত নেই। তার জীবনে অনাকাঙ্ক্ষিত খরচ বেশি হয়ে যায়। যখনই

আপনার জীবনে শোকরগোজারি থাকবে না, অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যয় বাড়বে।

অসুখ হয়েছে। এখন ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। ডাক্তার তো টেস্ট ছাড়া ওষুধ দেবেন না। টেস্ট করতে ১৫ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেল। এটা অনাকাঙ্ক্ষিত। এটাকে কী বলা যেতে পারে? পেনাল্টিও বলা যায়। আপনার অপ্রত্যাশিত, ইচ্ছাবিরুদ্ধ খরচ। অথচ এটা ছাড়া আপনার উপায় নেই। জীবনে বরকত না থাকলে এই বাধ্যতামূলক খরচের পরিমাণ বেড়ে যাবে।

আবার একজন ৩০/৪০ হাজার টাকা বেতন পেয়েও দেখা যাচ্ছে যে, সে দুই-তিন হাজার টাকা সঞ্চয় করে ফেলছে তার খাওয়াদাওয়া, থাকাসহ সমস্ত খরচের পরেও। হয়তো তার নিজের অসুখ নেই, মা-বাবা কিংবা পরিবারের কারো অসুখ নেই। তাহলে বলুন, কার জীবনে বরকত হলো!

বরকত মানে কী? অভাবমুক্ত থাকা, স্রষ্টার করুণার মধ্যে থাকা, উদ্বৃত্তে থাকা। উপার্জন যতই হোক—আপনার যদি ঋণ থাকে তাহলে আপনি অভাবী। আবার যত কম উপার্জন করুন, আপনার যদি সঞ্চয় থাকে, সেখান থেকে আপনি ইচ্ছামতো ব্যয় করতে পারেন। হয়তো শখ করে স্ত্রীকে একটা জিনিস কিনে দিলেন। অর্থাৎ আপনি খুশি মনে তাকে দিলেন। আবার অনেক সময় তো অনিচ্ছা সত্ত্বেও দিতে হয়। অনিচ্ছা সত্ত্বে না, ইচ্ছা করে আপনি যা দিলেন, এটা হচ্ছে সঞ্চয়। এটা হচ্ছে বরকত। বরকতের মানে হচ্ছে স্রষ্টার করুণাধারার মধ্যে থাকা, অভাবমুক্ত থাকা, উদ্বৃত্তে থাকা। যেখান থেকে আপনি ইচ্ছে করলে দান করতে পারবেন।

তাহলে কী করবেন? বাজারে কেনাকাটা করতে যখনই যাবেন, প্রার্থনা করে যাবেন। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে আমরা যে কথাটা বলি—যে-কোনো কিছু কেনার আগে, নিজেকে প্রশ্ন করবেন যে, 'এটা কি আমার প্রয়োজন'? উত্তর যদি 'হ্যাঁ' হয়, তাহলে দ্বিতীয় প্রশ্ন করবেন—'এটা কি এখনই অথবা আসলেই আমার প্রয়োজন'? এর উত্তরও 'হ্যাঁ' হলে, তৃতীয় প্রশ্নটি করবেন যে, 'এটা ছাড়া কি আমার চলবেই না'? এই প্রশ্নের উত্তর যদি হয়, 'না, চলবে না', তাহলে ওটা আসলেই আপনার প্রয়োজন। তখন কিনুন।

জিনিসের যত্ন না নেয়াও কিন্তু অপচয়। জিনিসের যত্ন নেবেন। অপচয় করবেন না। অপচয়কারী শয়তানের ভাই। আর শয়তান অভিশপ্ত। অতএব ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে, প্রাতিষ্ঠানিক বা কর্মজীবনে, কোথাও অপচয় করবেন না। আপনার জীবনে বরকত থাকবে। যারা অনেক উপার্জন করেন, যাদের জীবনে অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক ব্যয় বেশি অর্থাৎ দুর্ঘটনা বা

বিপদজনিত কারণে ব্যয় বেশি—বুঝবেন যে, তাদের জীবনে বরকত নেই। তাদের অনুশোচনা করা দরকার। কোথাও একটা সমস্যা আছে, যার কারণে তারা স্রষ্টার রহমতের ছায়া থেকে বঞ্চিত। বরকত থেকে বঞ্চিত।

অতএব, (এক) সব ধরনের অপচয় থেকে দূরে থাকবেন। (দুই) আয় করবেন, তারপর আয় বুঝে ব্যয় করবেন। আয় না করে ব্যয় করবেন না। যদি এ অভ্যাসটি গড়ে তুলতে পারেন, আপনার জীবনে অপচয় অনেক কমে যাবে। বরকত থাকবে। ম্যারাডোনার মতো ঋণগ্রস্ত হয়ে নয়, দেখা যাবে যে, উসমানের (রা) মতো দাতা হয়ে আপনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারছেন।

আমরা কোয়ান্টিটির কথা বলছি না, কোয়ালিটির কথা বলছি। ধরুন, একজনের ১০০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত আছে। তিনি ৯০ কোটি টাকা দান করলে যে সওয়াব পাবেন, আল্লাহ যাকে ১০০ টাকা উদ্বৃত্ত দিয়েছেন, তা থেকে যদি তিনি ৯০ টাকা দান করেন, একই সওয়াব পাবেন। কারণ আল্লাহ আপনাকে কত দিয়েছেন আর সেখান থেকে আপনি কতটা দান করলেন, সেই হিসেবে বিচার করা হবে। কত দিলেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়; কী আছে, সেখান থেকে কত পার্সেন্টেজ দিয়েছেন সেটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। আপনি দাতা হিসেবে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবেন।

আমরা পরম করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা করব—প্রভু! যখন তোমার কাছে যাওয়ার সময় হবে, আমাদেরকে দাতা হিসেবে উঠিয়ে নিও। আমরা সবাই যেন দাতা হিসেবে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারি, ঋণজর্জরিত হয়ে নয়।

সাদাকায়ন : ২৭ নভেম্বর ২০২০; কোয়ান্টামম

বিজয় আমাদের মনছবিরই ফসল

বিজয়ের মাসে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি, যাদের রক্ত, ঘাম, শ্রম, যাদের মেধা, সাহস পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন জাতি হিসেবে আমাদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। আমাদের নিজস্ব পরিচয় সৃষ্টি করেছে। তারা যদি জাতির মুক্তির স্বপ্ন পূরণের জন্যে অকুতোভয় সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে না পড়তেন, তাহলে হয়তো আজ আমরা মায়ের ভাষায় কথাও বলতে পারতাম না।

আসলে মনছবি মিসাইলের মতো লক্ষ্যভেদ করে কি করে না, মনছবি হয় কি হয় না, আমাদের স্বাধীনতাই তার এক জ্বলন্ত উদাহরণ। **১৯৭১-এ** পুরো জাতি যখন মুক্তির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তখন তাদের একটিই স্বপ্ন ছিল—স্বাধীন দেশ। আর আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা অকুতোভয় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সেই স্বপ্ন, সেই মনছবিকেই বাস্তবায়িত করেছেন।

তাদের অস্ত্র ছিল না, রসদ ছিল না, অনেকটা খালি হাতেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন লক্ষ্য বাস্তবায়নে সবকিছু ত্যাগ করে। অস্ত্র এসেছে, রসদ এসেছে, হানাদার বাহিনী নাস্তানাবুদ হয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। আমরা স্বাধীন হয়েছি। বিজয়ের এই মাসে আমরা আবারো মুক্তির সংগ্রামে যিনি যতটুকু আত্মদান করেছেন, কোরবানি করেছেন, কষ্টস্বীকার করেছেন, প্রত্যেকের ত্যাগ এবং শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আজকের আলোচনা শুরু করছি।

আমরা সবসময় বলি, মানুষ যা ভাবতে পারে, যা বিশ্বাস করতে পারে তা সে অর্জন করতে পারে। ভাবনা যখন বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয় এবং বিশ্বাস কর্মে রূপান্তরিত হয়, প্রচেষ্টায় রূপান্তরিত হয়, তখন সেটা মিসাইলের মতো লক্ষ্যভেদী মনছবিতে রূপান্তরিত হয়।

অবচেতন মনে লক্ষ্যের ছবি যদি আপনি বসিয়ে দিতে পারেন, সেটা

স্বয়ংক্রিয়ভাবে দিবানিশি কাজ করবে আপনাকে সেই গন্তব্যে পৌঁছে দেয়ার জন্যে। প্রয়োজনে পথ সংশোধন করবে। দুর্দমনীয় আগ্রহ-উদ্যম সৃষ্টি করবে আপনার ভেতরে। যত সময়ই লাগুক, লক্ষ্যপানে আপনি পৌঁছে যাবেন। শুধু লেগে থাকতে হবে অবিচলভাবে।

সাম্প্রতিক সময়ের একটি উদাহরণ দিতে পারি। উদাহরণটা একজন চীনা গণিতবিদের। নাম ইতাং ঝাং (Yitang Zhang)। ছোটবেলা থেকেই গণিতের প্রতি তার ছিল প্রচণ্ড ঝোঁক। বালক ঝাং স্বপ্ন দেখতেন, বড় হয়ে একদিন জটিল একটি গাণিতিক সমস্যার সমাধান করবেন।

তার বয়স যখন ১২, চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু হলো। স্কুল-কলেজ সব বন্ধ হয়ে গেল। মায়ের সাথে ঝাংকে পাঠিয়ে দেয়া হলো গ্রামে কৃষিশ্রমিক হিসেবে কাজ করার জন্যে। ১০ বছর তিনি ক্ষেতে-খামারে কাজ করলেন। স্কুল-কলেজে যেতে না পারলেও বইপত্র জোগাড় করে গণিতচর্চা করেছেন নিজে নিজেই। সাংস্কৃতিক বিপ্লব শেষ হওয়ার পর ঝাং প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া শুরু করলেন।

তিনি কৃতি শিক্ষার্থী ছিলেন। ২৯ বছর বয়সে বেইজিং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে মাস্টার্স করলেন। ৩৫ বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রের পারডু বিশ্ববিদ্যালয় (Purdue University) থেকে পিএইচডি ডিগ্রি পেলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করতে পারলেন না। গবেষণার সুযোগও তার জুটল না। তার পিএইচডি সুপারভাইজার তাকে কোনো রেকমেন্ডেশন লেটার দেন নি। কিন্তু ঝাং হতাশ হন নি। নতুনভাবে সংগ্রাম শুরু করলেন। এক বন্ধুর রেস্টুরেন্টে ক্যাশিয়ারের চাকরি নিলেন। রাত কাটাতেন প্রাইভেট কারে। কারণ ঘরভাড়া দেয়ার সামর্থ্য তার ছিল না। অবসর যখনই পেতেন, গণিতচর্চায় মেতে থাকতেন।

নানা ধরনের কাজ করে উপার্জন করতে হতো তাকে। আরো সাত বছর পার হয়ে গেল। ৪৪ বছর বয়সে তার এক গণিতবিদ বন্ধু ঝাংকে নিউ হ্যাম্পশায়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্টটাইম লেকচারারের চাকরি পেতে সহায়তা করলেন। কিন্তু সেখানে পরবর্তী ১৪ বছরেও কোনো প্রমোশন তাকে দেয়া হলো না।

ঝাং হাল ছাড়লেন না। নিরবচ্ছিন্নভাবে গণিতচর্চা করতে লাগলেন। ঝাংয়ের সেই ছোটবেলার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলো ৫৮ বছর বয়সে। তিনি জটিল একটি গাণিতিক সমস্যার সমাধান করলেন, যেটা বিশ্বের সেরা গণিতবিদেরা

দীর্ঘদিন ধরে সমাধানের চেষ্টা করছিলেন। ঝাং-এর সমাধান ছাপা হলো যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বনেদি জার্নাল অ্যানালস অব ম্যাথমেটিক্স-এ। অখ্যাত ঝাং রাতারাতি পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত গণিতবিদদের একজনে পরিণত হলেন। বড় বড় পুরস্কার, ফেলোশিপ পেলেন। নিউইয়র্ক টাইমস-সহ প্রভাবশালী সব ম্যাগাজিন তার সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্যে লাইন ধরল।

প্রিন্সটন, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাকে লেকচার দেয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানাল। নিউ হ্যাম্পশায়ার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তড়িঘড়ি করে তাকে প্রফেসর হিসেবে পদোন্নতি দিলো। কিছুদিন পরে ঝাং ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ায় অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করলেন। তাকে বলা হয়, এই শতাব্দীর অন্যতম সেরা গণিতবিদ।

মনছবি পূরণ হতে ঝাং-এর কত বছর লেগেছিল? ৪৬ বছর! তিনি কেন পারলেন? কোনো প্রতিকূলতা তাকে ভাঙতে পারে নি। তার যা সম্বল ছিল সেটা নিয়েই তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘আই ওয়াজ বর্ন ফর ম্যাথ। ফর মেনি ইয়ার্স, দ্য সিচুয়েশন ওয়াজ নট ইজি। বাট আই ডিড নট গিভ আপ। আই জাস্ট কেপ্ট গোয়িং, কেপ্ট পুশিং’।

প্রিয় সুহৃদ, প্রতিকূলতা যত আসুক, মহৎ লক্ষ্য নির্ধারণ করলে কখনো হতাশায় ভেঙে পড়বেন না। পথ চলা থামাবেন না। অন্ধকার যত আসুক, পথ চলতে থাকুন। অন্ধকার পার হয়ে আলোর দিগন্তে আপনি পৌঁছবেনই। আমরা অধিকাংশ মানুষ ভুল করি এখানে। আমরা থেমে যাই। হতাশ হয়ে যাই। অথচ আমাদের ধর্মের শিক্ষাই হচ্ছে—‘কখনো হতাশ হয়ো না, দুঃখ কোরো না, সত্যিকার বিশ্বাসী হলে তোমাদের উত্থান সুনিশ্চিত (তোমরাই বিজয়ী হবে)’। *[সূরা আলে ইমরান : ১৩৯]*

আসলে ২৫ মার্চের কালো রাতে যখন হানাদার বাহিনী আমাদের ওপর পৈশাচিক ধ্বংসলীলা শুরু করেছিল, আমরা কিন্তু হতাশ হই নি। সাহস সঞ্চয় করেছি। বিশ্বাস করেছি—আমাদের স্বপ্ন একদিন বাস্তবায়িত হবেই। সেই স্বপ্নের জন্যে পুরো জাতি ত্যাগ স্বীকার করেছে। বাংলাদেশ আজ বিশ্বের সামনে সেই স্বপ্নেরই বাস্তবরূপ।

জাতির জীবনে মনছবির বাস্তবায়ন যে-রকম সত্য, ব্যক্তিজীবনেও তা অমোঘ সত্য হতে পারে যদি আপনি লেগে থাকেন। যারাই বিশ্বাস করেছেন, স্বপ্ন দেখেছেন এবং লেগে থেকেছেন, তাদের স্বপ্ন কখনো এক প্রজন্মে, দুই প্রজন্মে, কখনো তিন প্রজন্মে—অর্থাৎ কখনো না কখনো সফল হয়েছে।

বিজয়ের এই মাসে আরেকটি স্মরণীয় নাম হচ্ছে বেগম রোকেয়া। তার জন্ম রংপুরে, ৯ ডিসেম্বর। আজ থেকে ১৪০ বছর আগে। যে সময়ে ধর্মীয় অনুশাসনের নামে গৃহে অনেকটা বন্দি জীবনযাপন করা ছিল নারীর ললাট লিখন। সেই সময়ে তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন জ্ঞানী হওয়ার। বিশ্বাস করতেন—তিনি জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন। বাবার বাড়িতে খুব একটা সুযোগ পান নি। বিয়ের পর উদারমনা স্বামী তাকে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ করে দেন। স্বামীর উৎসাহে জ্ঞানচর্চায় তিনি এগিয়ে গেলেন।

১৯০৮ সাল। আজ থেকে ১১২ বছর আগে তিনি নিজ ভাবনাকে, স্বপ্ন বা মনছবিকে উপস্থাপন করলেন *সুলতানার স্বপ্ন* উপন্যাসে। চাওয়াটা সময়ের এত আগে ছিল যে, উপন্যাসের নামকরণ করতে হয়েছে *সুলতানার স্বপ্ন*। একজন দূরদর্শী মানুষ চিন্তা-চেতনায় কতটা এগিয়ে থাকলে সেসময় পরাধীন দেশে পরাধীন নারী—যাদের ভোটাধিকার, স্বাধীন পেশা নির্বাচনের অধিকার, এমনকি উচ্চশিক্ষা অর্জনের পথও ছিল রুদ্ধ, সেসময় বেগম রোকেয়া এমন একটি দেশের কল্পনা করলেন, যেখানে রাজা নেই, আছে শুধু রানি। আর তার নেতৃত্বে দক্ষ হাতে রাজ্যের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে নারীরা। শুধু তা-ই নয়, রাজ্যের নারী-বিজ্ঞানীদের পরামর্শে সেখানে রান্নাবান্না থেকে যুদ্ধবিমান—সব চলছে সৌরশক্তিতে। কৃষিকাজে ব্যবহৃত হচ্ছে বিদ্যুৎ। বেগম রোকেয়ার চিন্তা সময়ের যে কত আগে ছিল—এটাই তার প্রমাণ!

কত প্রতিকূলতা! ২৯ বছর বয়সে তিনি বিধবা হলেন। নারী শিক্ষার প্রসারকে তিনি তার জীবনের মিশন হিসেবে স্থির করলেন। লক্ষ্যস্থির হলো। স্বামীর নামে বিহারের ভাগলপুরে গার্লস স্কুল খুললেন। সম্বল একটি বেঞ্চ ও পাঁচ জন ছাত্রী। টিকতে পারলেন না সেখানে। চলে এলেন কলকাতায়। আবার খুললেন একটি স্কুল। এবার দুটি বেঞ্চ, আট জন ছাত্রী। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্রী সংগ্রহ করতেন। এর মধ্যে স্কুল চালানোর টাকা যে ব্যাংকে জমা রাখা ছিল, সে ব্যাংকটি দেউলিয়া হয়ে গেল। পুঁজিহীন চরম প্রতিকূল অবস্থা।

কিন্তু বেগম রোকেয়া থেমে থাকেন নি, দমে যান নি, হতাশ হন নি। আস্তে আস্তে তার স্কুল প্রাইমারি, তারপর হাই স্কুলে পরিণত হলো। একসময় তিনি উপলব্ধি করলেন, একা বড় কাজ করা যায় না। সঙ্ঘ গড়তে হবে। নারীদের সংগঠিত না করলে তার স্কুল টিকিয়ে রাখা যাবে না। কলকাতায় গড়ে তুললেন 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' নামে মুসলিম নারীদের সংগঠন। পরবর্তী পর্যায়ে এই সংগঠনই মহিলা সমিতির রূপ নেয়।

বেগম রোকেয়া আক্ষরিক অর্থেই জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত নারী মুক্তির কাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। যেদিন তিনি মারা গেলেন, সেদিনও রুটিন মাফিক কর্মব্যস্ত দিনের শেষে যথারীতি লিখছিলেন। রাতে কলম হাতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। টেবিলের ওপরে পেপার ওয়েটের নিচে ছিল একটি অসমাপ্ত লেখা—*নারীর অধিকার*।

নারীর অধিকারের যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, যে লক্ষ্য, যে মনছবি বাস্তবায়নের জন্যে প্রাণান্ত প্রয়াস চালিয়েছিলেন, সঙ্ঘ গড়েছিলেন, শতাব্দী পরিক্রমায় তারই ধারাবাহিকতা আমাদের আজকের এই সমাজ। আসলে শুধু বেগম রোকেয়া নন, যারাই ভাবতে পারে, বিশ্বাস করতে পারে, সেই বিশ্বাস বাস্তবায়নে সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাতে পারে, তাদের স্বপ্ন সবসময়ই সফল হয়। সময় লাগে কিন্তু সফল হয়।

ডিসেম্বর—বিজয়ের এই মাস কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের জন্যে দান সংগ্রহের সালতামামির মাস। মানুষের কল্যাণে, স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্যে প্রতিটি মানুষ সাধ্যমতো যে দান মাটির ব্যাংকে জমা করে, এই মাসে তা সংগৃহীত হয়। কোয়ান্টামের সেবামূলক কাজ পরিচালিত হয় সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের সঞ্চিত এই দানেই। এই সময়টা আমাদের পরিবারের সদস্যদের জন্যে উৎসবের মতো। সবাই মিলে দান সংগ্রহ করে ফাউন্ডেশনে জমা দেয়া, মাটির ব্যাংক ভেঙে দানের টাকা গণনা করা—সব মিলিয়ে একটা উৎসবমুখর সময়। আপনাদের এই উদ্যোগ আগের মতোই অব্যাহত থাকুক। অব্যাহত থাকুক আমাদের সমস্ত সেবামূলক কার্যক্রম।

আমরা বলেছিলাম, ২০২০ সাল কোয়ান্টামের জন্যে বিশে বিশ। অর্থাৎ সেবামূলক কাজে অগ্রগতি হতে হবে শতভাগ। অর্জন হতে হবে শতভাগ। এবছর আমাদের অর্জন অনেক! এটা পরম করুণাময়ের দয়া এবং অনুগ্রহ। করোনাকালে যখন করোনায় মৃতদের পাশে আপনজনরাও দাঁড়ায় নি, আমরা তখন তাদের পাশে দাঁড়িয়েছি। মমতার পরশে তাদেরকে শেষ বিদায় জানিয়েছি। শেষ বিদায় জানাতে গিয়ে আমরা উপলব্ধি করেছি, যিনি মারা গেলেন, কোটি কোটি টাকা রেখে গেলেও তিনি আসলে নিঃস্ব।

তার আর করার কিছু নেই। ব্যাংক থেকে টাকা তোলার জন্যে চেক কাটার সুযোগ তার আর নেই। এই অনুভূতি থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, শুধু করোনা নয়, যিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নেবেন, প্রতিটি মানুষকে মমতার সাথে সুন্দরভাবে গোসল করিয়ে কাফনের কাপড় পরিয়ে সমাহিত করার

ব্যবস্থা আমরা করব। এই কাজটি প্রত্যেক মৃতের জন্যে এবং বিনামূল্যে করা হবে। নতুন এই কার্যক্রম আমরা হাতে নিয়েছি দাফনসেবা কার্যক্রম নামে।

মৃতের শেষকৃত্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করা ফরজে কিফায়া। অর্থাৎ সমাজের জন্যে এটা ফরজ। সমাজের ১০ জন মানুষ যদি এই ফরজ আদায় করে, তাহলে সেই সমাজের সকল মানুষের ফরজ আদায় হয়ে গেল। আর যদি কেউ এই ফরজ আদায় না করে, তাহলে সমাজের সকল মানুষ এই ফরজ আদায় না করার গুনাহের ভাগীদার হবে। সমাজের সবাইকে গুনাহ থেকে মুক্ত রাখার জন্যে আমরা এই দায়িত্ব নিতে চাই।

বিজয়ের মাসে আমরা মমতার পরশে শেষ বিদায় জানাতে আমাদের সমাজে অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করতে চাই। আপনিও এই দাফনসেবায় অংশ নিতে পারেন স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে, সময় দিয়ে এবং বিশেষ দান করে। আমরা যদি সবাই দাফনসেবায় বিশেষ দান করি, তাহলে তা আমাদের জন্যে নিঃসন্দেহে অত্যন্ত সৌভাগ্যের হবে। পরম করুণাময় আমাদের এই নিঃস্বার্থ ও মহতী উদ্যোগকে কবুল করুন।

প্রিয় সুহৃদ, আপনাদের প্রতি আবারো অনুরোধ থাকবে যে, সুস্থ থাকার জন্যে, করোনা থেকে মুক্ত থাকার জন্যে আপনারা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন। যে যে ভেষজ খাবার গ্রহণের পরামর্শ আমরা দিয়েছি, সেইসব খাবার খান এবং নিয়মিত কোয়ান্টাম ইয়োগা করুন, প্রাণায়াম করুন। নিজের ইমিউন সিস্টেমকে আরো শক্তিশালী করার প্রচেষ্টায় নিয়মিত মেডিটেশন করুন—আপনি সুস্থ থাকবেন। নিজের ও জাতির লক্ষ্য বাস্তবায়নে যথাযথভাবে অবদান রাখতে পারবেন। আপনার জীবন সুন্দর হোক, সফল হোক, শান্তিময় হোক। সৃষ্টির সেবা করার মধ্য দিয়ে আমরা যেন সবসময় পরম করুণাময়ের রহমতের ছায়ায় থাকতে পারি। পরম করুণাময় আমাদের সহায় হোন।

মাসিক সাদাকায়ন (অডিও) : ৪ ডিসেম্বর ২০২০

বড় ত্যাগ দেয় বড় আনন্দ

আজকের সাদাকায়ন উৎসর্গ করছি আমাদের বীর শহীদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং বীর নারীদের প্রতি। যাদের ত্যাগ, যাদের রক্ত আমাদের দেশকে স্বাধীন করেছে। যারা আমাদের স্বাধীন দেশের মানুষ হিসেবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন এবং জাতির স্বাধীন আত্মবিকাশের পথকে উন্মুক্ত করেছেন, তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাদের স্মরণেই আজকের সবটুকু সৎকর্ম আমরা উৎসর্গ করছি।

কৃতজ্ঞতাই হচ্ছে শান্তির শুরু। কৃতজ্ঞ না হতে পারলে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে না পারলে মানুষ কখনো ঋণমুক্ত হয় না। ঋণমুক্ত না হলে সে শিথিল হতে পারে না। আর শিথিল হতে না পারলে সে কখনো প্রশান্তি বা সুখের সন্ধান পায় না।

সুখের শুরু, শান্তির শুরু, প্রজ্ঞা, শিথিলায়ন—সবকিছুর শুরুই হচ্ছে শুকরিয়া, কৃতজ্ঞতা।

জীবনে যার কাছ থেকে যতটুকু উপকার পেয়েছেন—একটা হাসি, একটা মিষ্টি কথা ... তার প্রতি কৃতজ্ঞ হোন। হয়তো কোনো কথাও না—একটু পিঠ চাপড়ে দিয়েছিল কিন্তু বোঝা যায় এটা ঘৃণার, রাগের, না মমতার। না বোঝা যায় না? দৃষ্টিতেও বোঝা যায় সেটি ঘৃণার, রাগের, না মমতার।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে হৃদয় থেকে। একটা হাসি যেমন সুখের শুরু, একটা গালি তেমনি বিরক্তির শুরু, রাগের শুরু। ঘৃণা হচ্ছে দুঃখের শুরু। তো আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আজকের সাদাকায়ন হচ্ছে সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার দিন। কাদের প্রতি? ৫০ বছর আগে আমাদের যে ভাইয়েরা, যে বোনেরা, যে মায়েরা, বাবারা দেশের জন্যে আত্মত্যাগ

করেছিলেন—আমরা যেন স্বাধীনভাবে স্বপ্ন দেখতে পারি, স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারি, সেজন্যে যারা নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছিলেন, কৃতজ্ঞতা তাদের প্রতি। ৫০ বছর আগে যারা তরুণ ছিলেন, তাদের অনেকেই এখনো বেঁচে আছেন। যারা প্রবীণ ছিলেন, তারা অনেক আগে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তাদের প্রতিও আমরা গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

১৯৭১ সালে বীর মুক্তিযোদ্ধারা যে-রকম অবদান রেখেছিলেন, তাদেরকে যারা সহায়তা করেছেন, তাদেরকে যারা আশ্রয় দিয়েছেন, যারা রান্না করে একটু নুন-ভাত দিয়েছেন—এর চেয়ে বেশি সামর্থ্য হয়তো তার ছিল না, সেই নুন-ভাতটুকুর জন্যেও আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

যারা মুক্তিযোদ্ধাদের বাঁচানোর জন্যে নিজেরা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন কিন্তু কোনো তথ্য প্রকাশ করেন নি, যারা আহত যোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্যে আশ্রয় দিয়েছেন, মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছেন গান লিখে, কবিতা লিখে, সেই শব্দসৈনিকদের প্রতিও আমরা গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সেসময় এম আর আখতার মুকুল, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ‘চরমপত্র’ অনুষ্ঠানটির পরিচালক, লেখক ও বক্তা। তার যে ভাষা—মাশাআল্লাহ! বুঝতে কারো অসুবিধা হতো না। আরো যারা শব্দসৈনিক ছিলেন, তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। জাতিগতভাবে আমরা যেমন ঋণী, ব্যক্তিগতভাবেও আমি তাদের কাছে ঋণী। তাদের সহযোগিতা, তাদের সহানুভূতি আমাকে সবসময় অনুপ্রাণিত করেছে।

প্রথিতযশা সাংবাদিক কামাল লোহানী, তিনি এই কোয়ান্টামমেও এসেছিলেন। এখানকার শিশুদের দোয়া করে গেছেন।

আমাদের অগ্রজ ছিলেন সুরকার আলতাফ মাহমুদ। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছেন, এজন্যে তাকেও শহিদ হতে হয়েছিল হানাদার বাহিনীর হাতে। শহিদ বুদ্ধিজীবী ড. আব্দুল আলিম—সাংবাদিকতায় আমার গুরুসম। সেসময় সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতা ছিলেন তিনি। তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছে দেশের সাধারণ মানুষ—মুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন যারা। জাতিগত স্বপ্ন যে কত প্রবল হতে পারে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস হচ্ছে তার প্রমাণ।

২৬ মার্চ আমরা যুদ্ধ শুরু করলাম। **১৬** ডিসেম্বর যুদ্ধ শেষ।

এত অল্প সময়ে পৃথিবীর কোনো জাতি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে কখনো স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে নি, যেটা আমাদের জাতি, আমাদের দেশ

করেছে। সেই সময়ে যারা সহযোগিতা করেছেন, তাদের অধিকাংশের নামই মানুষের রচিত ইতিহাসে থাকবে না। কিন্তু আল্লাহর যে ইতিহাস, সেই আমলনামায় তাদের এই সৎকর্মগুলো অবশ্যই যুক্ত হবে।

আমাদের এক কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট, বীর মুক্তিযোদ্ধা। তিনি বলছিলেন যুদ্ধের সময় ক্ষুধা কত তীব্র হতে পারে সেই উপলব্ধির কথা; একবার টানা কয়েক সপ্তাহ তাদের শুধু চিড়া-গুড় খেয়ে কাটাতে হলো। তা-ও প্রতিবেলায় জুটত না। এরপর এক অপারেশন সফলভাবে সম্পন্ন করলেন। মিশন শেষ হওয়ার পরে নিকটবর্তী এক গ্রামে তারা আশ্রয় নিয়েছেন। ছোট্ট দল। এক কৃষক, তার ৮-১০ বছরের মেয়েকে সাথে নিয়ে দেখা করতে এলেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের একবেলা ভাত খাওয়াতে চাইলেন।

তার সেই ছোট মেয়ে বায়না ধরল যে, তার পোষা ছাগলটা সে মুক্তিযোদ্ধাদের দেবে খাওয়ার জন্যে। স্বাভাবিকভাবেই দরিদ্র কৃষক পরিবার। তাদের কাছ থেকে একজন মুক্তিযোদ্ধা কীভাবে টাকা ছাড়া ছাগল নেয়! আবার সাথে তেমন টাকাপয়সাও নেই। তো তাদের সবার যা ছিল, একত্রে জড়ো করে ১০ টাকার মতো হলো। ৪৮ বছর পর সেই বীর মুক্তিযোদ্ধা সেই ঘটনা বলছিলেন, সেদিনের সেই গরম ভাত আর দু-টুকরা মাংস—এর চেয়ে তৃপ্তি নিয়ে কোনো খাবার আজ পর্যন্ত খাই নি।

কেন? কারণ সেই গরম ভাত আর মাংসের টুকরার মধ্যে মমতা ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি ভালবাসা ছিল। এই কৃষক এবং কৃষককন্যার দেশপ্রেম ছিল; তারা ভেবেছিলেন, দেশের জন্যে যারা জীবনবাজি রেখেছে, যারা যুদ্ধ করছে, তাদের জন্যে এই ত্যাগ খুবই সামান্য। তাই তাদের কাছে যা ছিল তা দিয়েই মুক্তিযোদ্ধাদের আপ্যায়ন করার সুযোগ তারা নিয়েছে। আসলে সবাই যে একই কাজ করবে, সবাই যে মাঠে যুদ্ধ করবে তা নয়। যার যে কাজ, যতটুকু কাজ, সেটুকু করতে পারাই হচ্ছে সর্বোচ্চ দেশপ্রেম।

ধরুন, সেই কৃষককন্যা, ৮-১০ বছরের মেয়েশিশু। এখনকার শহুরে ছেলেমেয়েদের অধিকাংশই বোঝে না যে, গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি যিনি লালনপালন করেন, তাদের প্রতি তার মমতা কতটুকু! এই ছাগলটিই হচ্ছে তার সম্বল, যার প্রতি শিশুটির মমতা অনেক গভীর। সে সেটুকুও দিয়ে দিয়েছিল। কীসের জন্যে? দেশের জন্যে। মুক্তিযোদ্ধারা যেমন দেশপ্রেমিক, এই শিশুটিও দেশপ্রেমে তাদের থেকে পিছিয়ে ছিল না। অর্থাৎ শিশুটি দেশপ্রেমের চূড়ান্ত উদাহরণ স্থাপন করেছে তার পালিত ছাগলটি জবাই করে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে খেতে দিয়ে।

যারা যুদ্ধ করেছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছেন তারা জানেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে গুলি পাওয়া যায় কিন্তু খাবার পাওয়া খুব কঠিন ব্যাপার। সেখানে বুলেটের চেয়ে খাবার অনেক বেশি মূল্যবান। কারণ বুলেট তো শত্রু মারা গেলেও পাওয়া যাবে। কিন্তু শত্রু মারা গেলে তো খাবার আসবে না। তাই খাবারটা হচ্ছে এত অমূল্য! অতএব সেই সময় যিনি যতটুকু ত্যাগ করেছেন, সেটার জন্যে সবার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

যিনি যে পেশায় আছেন, যে কাজ করছেন—দেশের জন্যে সবাই তার অবদান রাখতে পারেন। সেই অবদানটা হতে হবে নিঃস্বার্থ। তখন সেটা শুধু দেশের জন্যে হয়, স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্যে হয়। আর যখন খ্যাতির জন্যে, অর্থের জন্যে, স্বার্থের জন্যে কোনো কাজ করা হয়, তখন সেটা দেশের কল্যাণের জন্যে হয় না, স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্যে হয় না।

মানুষের লেখা ইতিহাসে এই শিশুটির নাম হয়তো কোনোদিন লেখা হবে না। কিন্তু আল্লাহর যে ইতিহাস, তিনি যে আমলনামা লেখার জন্যে ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন, সেখানে তার এই অবদান লেখা থাকবে। আখেরাতে এই আমলনামা পেশ করা হবে এবং এর ওসিলায়ই হয়তো আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন, তাকে সম্মানিত করতে পারেন।

আপনি আল্লাহর ইবাদত করতে গাফেলতি করলেন, আল্লাহ মাফ করে দিতে পারেন। কিন্তু কোনো মানুষের ওপর যদি অন্যায় করেন, সেটা আল্লাহ মাফ করবেন না, অন্যায়ের শিকার সেই ব্যক্তি মাফ না করা পর্যন্ত। আবার একজন মানুষ যখন কারো উপকার করে, যার উপকার হলো কৃতজ্ঞতা ছাড়া তার হয়তো দেয়ার মতন আর কিছু থাকে না। কিন্তু উপকারকারীকে আল্লাহ বহুগুণ পুরস্কৃত করেন ইহকালে এবং পরকালে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় বহু দৃশ্য দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। আমি দেখেছি যে, সাধারণ মানুষ কত ত্যাগ করতে পারে! যারা যুদ্ধ করেছেন তারা নিঃসন্দেহে ত্যাগী। তাদের জন্যে যারা সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছেন, তার মূল্যও কোনো অংশে কম নয়। এই সম্মিলিত ত্যাগই আমাদেরকে এত অল্প সময়ে স্বাধীন করেছে। আসলে বড় কল্যাণের জন্যে, বড় উপকারের জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে ত্যাগ। ত্যাগ ছাড়া জুলুমের অবসান হয় না। ত্যাগ ছাড়া বঞ্চনার অবসান হয় না। এই ত্যাগ ছাড়া মুক্তি অর্জন করা যায় না।

হিন্দু পুরাণে দুটি গ্রুপের কথা বলা হয়েছে, যারা পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। একদলকে অসুর বলা হতো, আরেকদলকে বলা হতো দেবতা।

অসুরদের প্রবল প্রতাপশালী রাজা বৃত্রাসুর ব্রহ্মার বর লাভ করলেন; যে, মানুষ বা দেবতাদের কোনো প্রচলিত অস্ত্রে তার মৃত্যু হবে না। যখন বৃত্রাসুর এই বর লাভ করলেন, তিনি তাণ্ডব চালিয়ে গেলেন এবং দেবতাদের স্বর্গ থেকেই বের করে দিলেন। স্বর্গের অধিশ্বর হয়ে গেলেন বৃত্রাসুর।

তখন দেবরাজ ইন্দ্র অন্যান্য দেবতাদের নিয়ে বিষ্ণুর কাছে হাজির হলেন। বিষ্ণু ইন্দ্রকে বললেন, এই মহাসংকটের সময় একমাত্র ত্যাগই পারে এর যোগ্য প্রতিকার করতে। কোনো নিঃস্বার্থ ত্যাগীর কাছেই আছে এর যোগ্য প্রতিকার এবং জগতের মুক্তি।

বিষ্ণু তাদেরকে তিরস্কার করে বললেন, তোমাদের চরিত্রে দেবতার অহমিকা থাকলেও ত্যাগের সেই মহিমা নেই। এমনকি ত্যাগের কোনো চিহ্নও নেই। অতএব তোমরা নৈমিষারণ্যে দধীচি মুনির কাছে যাও। এই দধীচি মুনি ত্যাগী এবং সর্বোপরি জগতের মঙ্গল কামনায় তার জীবন নিয়োজিত।

দেবতারা দধীচি মুনির কাছে গেলেন। দধীচি মুনি তাদের দেখে বুঝলেন যে, কী উদ্দেশ্যে এসেছেন দেবতারা। তিনি হেসে বললেন, আমি জানি আপনারা কেন এসেছেন। আমার এই নশ্বর দেহ তো একদিন নষ্ট হবেই। আমার সামান্য নশ্বর দেহের এই অস্থি দিয়ে যদি জগতের কল্যাণ হয়, আমি অবশ্যই দেহত্যাগ করব।

যারা সনাতন সাধক, মুনি-ঋষি—তারা ইচ্ছা-মৃত্যু বরণ করতে পারেন। অর্থাৎ মৃত্যুটা তাদের ইচ্ছাধীন হয়ে যায়। দধীচি মুনি যোগবলে দেহত্যাগ করলেন। তার শরীরের হাড় দিয়ে নতুন অস্ত্র তৈরি হলো—বজ্রাস্ত্র। সে অস্ত্রে দেবতারা বৃত্রাসুরকে বধ করলেন।

এভাবে আত্মবিসর্জন দিয়ে দধীচি মুনি অমর হয়ে গেলেন।

বৃহৎ কল্যাণের জন্যে, উপকারের জন্যে, মুক্তির জন্যে, জুলুম-শোষণের অবসানে বৃহৎ ত্যাগ খুব গুরুত্বপূর্ণ। যে মানুষ বা যে জাতি ত্যাগ করতে পারে সে মুক্ত হয়, যেভাবে আমরা মুক্ত হয়েছিলাম একাত্তরে। এজন্যেই যুগে যুগে মুনি-ঋষি মহামানব নবী-রসুলেরা ত্যাগ করেছেন, কষ্টস্বীকার করেছেন, নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন বঞ্চিত ও সাধারণ মানুষের জন্যে।

নবীজীর (স) জীবন দেখুন—মানুষের মুক্তির জন্যে, মানুষের কল্যাণে, তার ইহকালীন এবং পরকালীন পরিত্রাণের জন্যে এমন কোনো কষ্ট নেই, এমন কোনো ত্যাগ নেই, যা তিনি স্বীকার করেন নি। সেই কারণেই তখনকার অবহেলিত, বঞ্চিত মানুষেরা একসময় পৃথিবীকে জ্ঞানে বিজ্ঞানে সভ্যতায় আলোকিত করতে পেরেছিল।

যীশু তার জীবদ্দশায় সবসময়ই ধর্মান্ধ মূর্খদের গালি নিন্দা সমালোচনা সহ্য করেছেন, নির্যাতন সহ্য করেছেন। কিন্তু তিনি সত্যের আলো প্রচারের জন্যে নিরলস পরিশ্রম করেছেন। যে কারণে পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে যীশুর জ্ঞান, তাঁর আলো, তাঁর মহিমা, তাঁর মানবপ্রেমের বাণী ছড়িয়ে পড়েছিল।

মহামতি বুদ্ধের জীবন দেখুন। তিনি রাজপ্রাসাদ, বিলাসব্যসন ত্যাগ করে একবস্ত্রে অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে আশ্রয় গ্রহণ করলেন!

ভোগী মানুষের পক্ষে বিলাসব্যসন ত্যাগ করা কঠিন। চাওয়ার আগেই যিনি সবকিছু পেয়ে যান, তিনি একবস্ত্রে বিলাসী জীবন ত্যাগ করলেন! এই বস্ত্র ভিজে গেলে কী পরবেন, কী খাবেন, কোথায় খাবেন, কে খাওয়াবে—কোনো চিন্তা নেই। তিনি বোধি লাভ করলেন মানুষের ত্রাণকর্তা হিসেবে। শতাব্দীর পর শতাব্দী তার জ্ঞান, তার শিক্ষা মানুষকে দুঃখ থেকে মুক্তি দিতে থাকল। দুঃখমুক্তির যে সূত্র তিনি বলেছিলেন ২,৭০০ বছর আগে, সেই সূত্র এখনো বলবৎ; যে, দুঃখের কারণ কী? দুঃখের কারণ হচ্ছে আসক্তি। সেটা অর্থের আসক্তি হোক, মদ ও মাদকের আসক্তি হোক, জুয়ার আসক্তি হোক, অন্যায়ের আসক্তি হোক; এই আসক্তি থেকে মুক্তির জন্যে তিনি মানুষকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করেছিলেন।

এখন থেকে শতবর্ষ আগে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছে নরেন্দ্রনাথ দত্ত নামের এক তরুণ গেলেন। তিনি যখন ধর্মের স্বাদ পেলেন, সমর্পণের স্বাদ পেলেন, তা ছিল তার কাছে এক অপার আনন্দ। নরেন্দ্র তখন বললেন, আমি এই অপার আনন্দের মধ্যে, ধর্মের মধ্যে, সমর্পণের মধ্যে ডুবে থাকতে চাই। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাকে ধিক্কার দিয়ে বললেন, 'তোকে তো আমি একটা বিশাল বটবৃক্ষ ভেবেছিলাম। হাজার মানুষের আশ্রয় হবি তুই। আর তুই নিজেই নিজের মধ্যে ডুবে থাকবি? হবে না! মানুষের দুঃখ দূর করার প্রয়াস চালানো ছাড়া তোর নিস্তার নাই, পরিত্রাণ নাই।'

গুরুর কাছ থেকে দেশ ও মানুষকে নিয়ে ভাবার দীক্ষা পেয়ে নরেন্দ্রনাথ দত্ত হয়ে উঠলেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্থাপন করলেন রামকৃষ্ণ মিশন, যা এখনো মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি উপাসনা-আরাধনায় যে আনন্দ পেয়েছিলেন, সমর্পণে যে আনন্দ পেয়েছিলেন, সেই আনন্দে ডুবে থাকতে চেয়েছিলেন—একা। তার গুরু পরমহংসদেব বললেন—মানুষের কল্যাণে নিবেদিত হও। তাহলেই তুমি পরিত্রাণ পাবে। তোমাকে বটবৃক্ষ হতে হবে। একা একা উপাসনা-আরাধনা নয়, মানুষের সেবা করা এবং মানুষকে আলোকিত করার মধ্য দিয়ে জাগিয়ে তুলতে হবে তার ভেতরের শক্তিকে।

কোয়ান্টামে আমরা কিন্তু সেটাই করছি। শুধু নিজেরা অথবা সমাজের গুটি কয়েকজনকে আলোকিত করা নয়, এ আলো আমরা ছড়িয়ে দিচ্ছি শ্রেণি-পেশা, জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সবার মধ্যে।

মানুষের পরিত্রাণের জন্যে অনেক বড় যোগ্যতার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন শুধু একটা অন্তর। এই অন্তর, অর্থাৎ একটা সুন্দর মন যদি থাকে, পরিত্রাণের জন্যে যা যা দরকার, তার সবকিছু জড়ো হতে থাকে তার কাছে।

আমাদের সবার শ্রদ্ধেয় জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান। যিনি এই কোয়ান্টামমে দু-বার এসেছিলেন। তিনি কোয়ান্টাম মাস্টার এবং আমাদের উপদেষ্টা ছিলেন। তো তিনি যখন প্রথম ডাক্তার হলেন, তিনি সাতক্ষীরায় চলে গেলেন। বললেন, আমি গ্রামের রোগীদের সেবা করব।

একদিনের ঘটনা। ৮ মাইল দূরে সাইকেল চালিয়ে এক রোগীকে দেখতে গেলেন ডা. এম আর খান। দীর্ঘসময় রোগীর পাশে তাকে থাকতে হলো। ফেরার সময় রোগী দুই টাকা ফি দিতে চাইল। রোগীর দুরবস্থা দেখে তিনি দুই টাকাও ফেরত দিয়ে দিলেন।

এই মমতাই তাকে কিংবদন্তী 'শিশুবন্ধু' করেছিল। সম্ভবত এখানেও দু-চারজন থাকতে পারেন, যাদের মা শিশু অবস্থায় তাদেরকে এম আর খান স্যারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ তিন প্রজন্ম। দাদা-দাদির চিকিৎসা করেছেন তিনি। মায়ের চিকিৎসা করেছেন, তারপরে মেয়ের চিকিৎসা। অর্থাৎ তিন প্রজন্মের চিকিৎসক তিনি। তিন প্রজন্ম কেন, আমার মনে হয় চার প্রজন্মের চিকিৎসক ছিলেন তিনি।

আলোকিত মানুষ গড়ার অগ্রপথিক অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যার বাটারফ্লাই ইফেক্ট খুব সহজভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, বাটারফ্লাই ইফেক্ট হচ্ছে—একটা প্রজাপতি তার এতটুকু ছোট ছোট পাখা ঝাপটালো, বাতাসে একটু কম্পন সৃষ্টি হলো। এই বাতাস কিছুদূর যেতে যেতে আরো কিছু বাতাসকে নাড়াচাড়া করতে লাগল। এভাবে যেতে যেতে বহূদূরে সমুদ্রে গিয়ে তার প্রভাব পড়ল এবং ঘূর্ণিঝড়ে রূপান্তরিত হলো। চিন্তা, বিশ্বাস, কাজ—সবকিছুর ওপরে এভাবেই প্রভাব বিস্তার করে বাটারফ্লাই ইফেক্ট। প্রজাপতির পাখার মতো। করোনাকালে আমরা শুধু নিজেরা বিশ্বাসী থাকি নি, শুধু নিজেরা আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হই নি, আমাদের বিশ্বাসের প্রভাব, বাটারফ্লাই ইফেক্ট হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল সমাজের চারপাশে।

আমরা প্রজাপতির মতো ছোট ছোট পাখা ঝাপটেছিলাম—বিশ্বাসের এবং আত্মবিশ্বাসের। ১৮ মার্চ আমরা বলেছিলাম—করোনা বিদেশি ভাইরাস,

আমাদের দেশে সুবিধা করতে পারবে না। আমরা বলেছিলাম, আমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে সতর্কতা এবং নিজের যত্ন। আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের বাণী প্রথমে আমরা অনুসরণ করেছি। এখন পুরো জাতি আত্মপ্রত্যয়ী। করোনা আমাদের দেশে খুব বেশি কিছু করতে পারবে না। সর্দি-কাশি যে-রকম আছে, করোনাও থাকবে। এ নিয়েই আমরা আমাদের কাজ করে যাব। নিজের জন্যে কাজ করব, পরিবারের জন্যে কাজ করব, দেশের জন্যে কাজ করব।

কখন আপনি করতে পারবেন? একজন মানুষ যখন শুধু নিজে শান্তি পেয়ে নিজের মধ্যে ডুবে যায়, সে আত্মকেন্দ্রিক। সে আসলে সত্যিকারের সুখ কখনো পায় না। কারণ আত্মকেন্দ্রিক মানুষ সুখী হয় না। যখন সে তার এই জ্ঞান, এই আলোকে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়, তখন সে সত্যিকারের সুখী হয়।

আমরা আমাদের দেশকে ভালবাসি। ভালবাসার প্রকাশ হিসেবে ৫০ তম বিজয় দিবস উদযাপনের এই সাদাকায়নে আমরা কয়েকটি বিষয় নিজেদের জীবনে গেঁথে নিতে পারি। সবসময় মনে রাখবেন, যখন আপনি একটা বিষয় আন্তরিকতার সাথে অনুসরণ করবেন, আজ হোক, কাল হোক, পরশু হোক—এটার প্রভাব চারপাশে পড়বেই।

এক. আজ থেকে দেশের নামে কোনো নেতিবাচক কথা কেউ বলবেন না। অন্য কেউ যদি বলেন, প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে ফেলবেন। নেতিবাচক কথা বললে বা হতাশা প্রকাশ করলে বলবেন, ঠিক আছে, আসুন, আমরা দেশের জন্যে দোয়া করি। দেশের জন্যে কাজ করি। একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমি আপনাদের বলতে পারি—আজ পর্যন্ত দেশ সম্পর্কে কোনো নেতিবাচক কথা আমি বলি নি। দেশ নিয়ে কখনো হতাশ হই নি। সবসময় দেশের জন্যে দোয়া করেছি। যখন দেশ সম্পর্কে ভালো কোনো কথা কেউ বলতেন না, দেশের যে ভবিষ্যৎ আছে তা বলতেন না, সেই সময়ে আমরা 'মনছবি বাংলাদেশ' করেছিলাম। আমাদের দেশ ধাপে ধাপে সে মনছবির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

দুই. *শুদ্ধাচার* বই সম্ভব হলে সবসময় সাথে রাখবেন। ঘরে রাখবেন। অফিসে রাখবেন। দূরে কোথাও গেলে সাথে রাখবেন—যাত্রাপথে যেন আপনি বইটির পাতা উল্টে-পাল্টে দেখতে পারেন, পড়তে পারেন। যে সূত্রগুলো, যে বিষয়গুলো বইটিতে দেয়া আছে, ধীরে ধীরে নিজে চর্চা করবেন, পরিবার এবং আত্মীয়-বন্ধুদের শুদ্ধাচার চর্চার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করবেন। আমরা বিশ্বাস করি—বাংলাদেশের মতো শান্তিপ্রিয় দেশ, অসাম্প্রদায়িক দেশ, উদারমনা

মানুষের দেশ সারা পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। শান্তিপ্রিয়তা, অসাম্প্রদায়িকতা এবং উদার মানবিকতার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত যদি পৃথিবীর কোনো দেশ হয়, তাহলে সেই দেশ হচ্ছে আমাদের দেশ—বাংলাদেশ।

আমরা যদি শুদ্ধাচারী হতে পারি, তাহলে আমাদের নৈতিক শক্তির পুনর্জাগরণ ঘটবে, যা অতীতে আমাদের বৈশিষ্ট্য ছিল। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলায় যখন এসেছিলেন, নিজ দেশে ফিরে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন আমাদের সম্পর্কে—'এই জাতি মিথ্যা বলে না। কারো সাথে প্রতারণা করে না।' কিন্তু ইংরেজরা আমাদেরকে মিথ্যুক এবং প্রতারক বানানোর চেষ্টার কোনো ত্রুটি করে নি। পরাধীনতা থেকে অর্থাৎ ইংরেজদের থেকে আমরা মুক্ত হয়েছি। স্বাধীন হয়েছি। অতীতে আমাদের যে নৈতিক শক্তি ছিল, সেই শক্তির পুনর্জাগরণ এখন আমাদের ঘটাতে হবে। যে সৎ গুণগুলো আমরা হারিয়ে ফেলছিলাম ইংরেজ শোষণের ফলে, সেই সৎ গুণগুলো ফিরে পাওয়ার জন্যেই এই *শুদ্ধাচার* বই।

আমাদের অর্থনৈতিক সাফল্য আসতে শুরু করেছে। এর সাথে নৈতিক পুনর্জাগরণ ঘটলে শুধু যে অল্প কিছু মানুষ ভালো থাকবে তা নয়, অর্থনৈতিক অগ্রগতির সুফল তখন দেশের প্রতিটি মানুষ পাবে। দেশের মানুষ ভালো থাকবে। আমরা যে মনছবি, যে স্বপ্ন দেখেছি এখন থেকে ২৫ বছর আগে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে।

পরম করুণাময় আমাদের কবুল করুন। আমরা যাতে শুদ্ধাচারী এবং ত্যাগী হতে পারি। দেশের জন্যে মুক্তিযোদ্ধারা যেভাবে ত্যাগ করেছেন, সেই প্রজন্মে তাদের সহায়তাকারীরা, সহযোগীরা যেভাবে ত্যাগ করেছেন, আমরাও দেশের জন্যে সেভাবেই ত্যাগ করতে চাই যাতে আমাদের পরের প্রজন্ম সফল প্রজন্ম হিসেবে পৃথিবীতে তার পরিচয় সৃষ্টি করতে পারে।

আপনারা ভালো থাকুন এবং নিয়মিত মেডিটেশন করুন। সবসময় শোকরগোজার থাকুন। নিজের জীবনে, পারিবারিক জীবনে শুদ্ধাচার চর্চার মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মকে শুদ্ধাচারী হিসেবে গড়ে তুলুন।

সাদাকায়ন : ১৮ ডিসেম্বর ২০২০; কোয়ান্টামম

সার্থক তাদের জীবন যারা দানশীল

আপনাদের সবার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। সবাইকে বড়দিনের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজ এমন এক মহামানবের জন্মদিন, যার জীবন সার্থক ছিল। যার জীবনের সবটাই ছিল দান। তিনি নিজের জীবনটাকেই দান করে গেছেন মানুষের মুক্তির জন্যে, মানুষের পরিত্রাণের জন্যে, মানুষের ইহকালীন এবং পরকালীন সাফল্যের জন্যে। আজকের সাদাকায়নের বিষয়টি খুব সুন্দর। আমার খুব ভালো লাগছে। আলোচনার বিষয় হচ্ছে, *সার্থক তাদের জীবন যারা দানশীল*।

যীশুর মতো দানশীল খুব কম মহাপুরুষই ছিলেন। আমরা কেউ তাকে যীশু বলি, কেউ বলি ঈসা (আ)। ঈসা (আ) এবং যীশু একই ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আজকের সাদাকায়ন তাঁর স্মরণে উৎসর্গ করছি। তিনি মানবপ্রেমের বাণীপ্রচার করেছেন, জীবে দয়া করার কথা বলেছেন, মানুষকে ভালবাসার কথা, ক্ষমার কথা বলেছেন। বিনিময়ে নির্যাতনের কষ্টস্বীকার করেছেন। আমরা যেন তার মতো ভালবাসা প্রেম দয়া মমতার প্রতিফলন আমাদের জীবনে ঘটাতে পারি—পরম করুণাময়ের কাছে সেই সৌভাগ্য কামনা করছি।

পবিত্র বাইবেলের একটি বাণী দিয়ে আমরা আলোচনার সূত্রপাত করতে পারি। মথি লিখিত সুসমাচারে বলা হয়েছে—'সার্থক তাদের জীবন যারা দানশীল, কারণ তারা ঈশ্বরের দয়া পাবে। সার্থক তাদের জীবন যাদের অন্তর নির্মল, কারণ তারা ঈশ্বরের দর্শন পাবে।' *[মথি ৫:৬-৮]*

মহামতি বুদ্ধও একই কথা বলেছেন—'প্রকৃত নিরন্ন মানুষকে যে অন্ন দান করে, সে পরলোকে স্বর্গে গমন করবে।' *[ইতিবুত্তক : ২৬]*

পবিত্র ঋগ্‌বেদে বলা হয়েছে, 'এসো প্রভুর সেবক হই। গরিব ও অভাবীদের দান করি।' *[ঋগ্‌বেদ : ১.১৫.৮]*

নবীজী (স) বলেছেন—'আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! কল্যাণার্থে দান করো। তোমাকেও সেভাবেই দেয়া হবে।' *[আবু হুরায়রা (রা); বোখারী]*

নবীজী (স) আরো বলেছেন, 'মহাবিচার দিবসে মহামহিম আল্লাহ অনুযোগ করবেন, 'হে আদমসন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম। তুমি আমাকে দেখতে যাও নি।' অভিযুক্ত তখন আরজ করবে, 'প্রভু হে! তুমি তো মহাবিশ্বের প্রতিপালক। (তুমি কীভাবে অসুস্থ হতে পারো?) আমি কোথায় তোমাকে দেখতে যাব?' আল্লাহ বলবেন, 'তুমি কি জানতে না যে, অমুক অসুস্থ ছিল? তুমি তাকে দেখতে যাও নি। তুমি কি জানতে না যে, তাকে দেখতে গেলে সেখানেই আমাকে পেতে?'

আল্লাহ বলবেন, 'হে আদমসন্তান! আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম। তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে খাবার দাও নি।' অভিযুক্ত তখন আরজ করবে, 'হে মহান অন্নদাতা! তুমি যেখানে সবার অন্নের ব্যবস্থা করো, সেখানে আমি তোমাকে কীভাবে খাওয়াব?' আল্লাহ বলবেন, 'অমুক তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল কিন্তু তুমি তাকে খাবার দাও নি। তুমি কি জানতে না যে, তখন যদি তুমি তাকে খাবার দিতে, তাহলে তার পুরস্কার আমার কাছ থেকে পেতে?'

আল্লাহ বলবেন, 'হে আদমসন্তান! আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম। তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে পানি দাও নি।' অভিযুক্ত তখন আরজ করবে, 'হে মহান তৃষ্ণা নিবারণকারী! তুমি যেখানে মহাবিশ্বের সবার তৃষ্ণা নিবারণ করো, সেখানে আমি তোমাকে কীভাবে পানি পান করাব?' আল্লাহ বলবেন, 'অমুক তৃষ্ণার্ত তোমার কাছে পানি চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে পানি পান করাও নি। তুমি কি জানতে না যে, তখন তুমি তাকে পানি পান করালে এখন আমার কাছ থেকে এর পুরস্কার পেতে?' *[আবু হুরায়রা (রা); মুসলিম]*

তার মানেটা কী? যখন আপনি তৃষিতকে পানি তুলে দিচ্ছেন, তখন আসলে আপনি প্রভুকেই পানি দিচ্ছেন। যখন আপনি ক্ষুধার্তকে খাবার দিচ্ছেন, তখন আপনি প্রভুকেই খাবার দিচ্ছেন। যখন আপনি অসুস্থের সেবা করছেন, তখন প্রভুরই সেবা করছেন। অর্থাৎ এই যে সেবা করা, এটা অন্য যে-কোনো ইবাদতের চেয়ে উত্তম ইবাদত, ভালো ইবাদত।

রসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, 'বিধবা ও এতিম অসহায় মানুষের কল্যাণে

নিরলস পরিশ্রমকারীর মর্যাদা আল্লাহর পথে জেহাদরত মুজাহিদের মতো। তার মর্যাদা সারারাত অবিরাম নামাজ আদায়কারী এবং সারাদিন রোজা পালনকারীর সমতুল্য।' *[আবু হুরায়রা (রা); বোখারী, মুসলিম]*

যে কারণে আমরা কোয়ান্টামে বলি, সেবা উত্তম ইবাদত।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'জীবে দয়া করে যে জন, সে জন সেবিছে ঈশ্বর।' জীবে দয়া করা কী? একটা পাখি বা প্রাণী বা নিরন্ন মানুষকে খাবার দেয়া, তাকে নিরাপদ রাখা, তাকে স্বাধীনভাবে তার মতো বাঁচতে দেয়া।

একবার লামায় এসে শুনলাম যে, অমুক বৃদ্ধকে দেখাশোনা করার কেউ নেই, আমরা দায়িত্ব নিলাম। তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করানো, গোসল করানো, খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হলো। আমাদের যে কর্মীরা, যে সেবকরা এ কাজটি করেছে আমি তাদের জন্যে প্রাণভরে দোয়া করলাম যে, তারা উত্তম কাজ করেছে।

কোয়ান্টামমের আশেপাশে ১৫ জন প্রবীণ, যাদের দেখার কেউ নেই—আমাদের সেবকেরা, খেদমতায়ন কর্মীরা, কোয়ান্টিয়ার ও অর্গানিয়াররা তাদের গোসল করানো থেকে শুরু করে, গায়ে তেল মেখে দেয়া, খাবার খাওয়ানোর কাজ করছেন। যারাই এ কাজগুলো করছেন, তাদের জন্যে আমি দোয়া করি। তারা অনেক বড় ইবাদত করছে।

কত বড় ইবাদত? সুফিদের একটা ঘটনা। এরকম পাহাড়ি এলাকায় এক দরবেশ খানকা স্থাপন করলেন। আগে মুনি-ঋষিরা যে-রকম আশ্রম করতেন, সুফিরাও আশ্রম করতেন। সুফিদের আশ্রমকে বলা হয় খানকা। মুনি-ঋষিদের আস্তানাকে বলা হয় আশ্রম। যেমন : আমাদের এই ধ্যানতীর্থ কোয়ান্টামম। এটা একটা খানকা বা আশ্রম। যেখানে ধ্যানের জন্যে, সেবার জন্যে আমরা আসি। যে-কেউ এখানে সেবা গ্রহণ করতে পারে। এখানে সবাই নিরাপদ।

কতটা নিরাপদ? আপনারা দেখবেন, দরবারানের সামনে যে খেজুর গাছ, সেখানে বাবুই পাখি প্রচুর বাসা বানিয়েছে। পাখিরাও অনুভব করছে যে, এরা জীবে দয়া করে। এরা জীব দেখলেই গুলতি মারে না।

সেই দরবেশের কিছু শিষ্য আছে। শিষ্যরা সেখানে সাধনা করত। তারা খেয়াল করল যে, প্রতি শুক্রবার রাতে এশার নামাজের পর তাদের ওস্তাদ টিলা পার হয়ে জঙ্গলের মধ্যে চলে যান। সবার কৌতূহল হলো যে, ওস্তাদজী আসলে গোপনে কী করেন? নিশ্চয়ই বড় কোনো আমল করেন। এমন বিশেষ আমল যে, তিনি তার শিষ্যদের সামনে করছেন না। শিষ্যরাও তো একটা

গ্রুপ। তারা একজনকে স্পাই বানাল যে, তুমি আজ ওস্তাদজীর পেছন পেছন যাবে। দেখবে, এত রাতে তিনি জঙ্গলে গিয়ে আকাশে উড়ে যান, না অন্যকিছু করেন? অন্যান্য শুক্রবারের মতো ওস্তাদজী যখন তার বিশেষ পোশাক আলখেল্লা পরে পাহাড়ের দিকে উঠতে লাগলেন, সেই স্পাইও তার পেছনে আস্তে আস্তে উঠল।

অনেক সময় শিষ্যদের কৌতূহল বেশি থাকে। একবার হলো, এক যোগী যোগ সাধনা করছেন। পদ্মাসনে বসে আছেন তার আশ্রমে। তো একজন কৌতূহলী, শিষ্য হয় নি তখনো। শিষ্য হওয়ার জন্যে সে যোগীর কাছে যাচ্ছে। শুনেছে, উনি অনেক বড় যোগী। গিয়ে দেখে যে, উনি শূন্যে পদ্মাসনে বসে ধ্যান করছেন। নিচে কোনোকিছু নেই।

তার সন্দেহ হলো যে, উনি আসলেই গুরু, না কোনো ভক্কিচক্কি আছে?

আশেপাশে কেউ নেই। উনি একা পদ্মাসনে বসে আছেন। সে ভাবল যে, ঠিক আছে, আমি আগে গিয়ে দেখে নিই নিচে কোনোকিছু আছে কিনা, যেটার ওপরে তিনি বসে আছেন।

সে আস্তে আস্তে গিয়ে আসনের নিচে হাত দিয়ে দেখে যে, কিচ্ছু নেই। সে পেয়ে গেল ভয়। তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে দরজার সামনে সে অপেক্ষা করছে। অনেকক্ষণ পর যখন যোগীর ধ্যান ভাঙল, আস্তে আস্তে তিনি নেমে এলেন। স্বাভাবিকভাবে তিনি তার নতুন শিষ্যের দিকে তাকালেন। শিষ্যের তো অবস্থা খারাপ। সে অনুমতি চাইল যে, গুরুদেব! আমি কি ভেতরে প্রবেশ করতে পারি? তিনি হেসে বললেন, প্রথমবার তো তুমি আমার অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন বোধ করো নি। এখন আবার অনুমতি চাচ্ছ কেন?

বুঝতে পারছেন, শিষ্যের কী অবস্থা!

এরকম সন্দেহবাতিক থাকে কিছু কিছু শিষ্যের। তারা আবার গুরুকে নিয়েও সন্দেহ করে—আসল কিনা একটু যাচাই করে দেখি তো! কেউ কেউ থাকে এরকম। থাকাটা অস্বাভাবিক নয়।

অনেক ডালের মধ্যে কিছু কী থাকে? হিন্দিতে বলে, 'ডালমে কুছ কালা'! বাংলার চেয়ে হিন্দি আপনারা ভালো জানেন দেখছি। ডালমে কুছ কালা হ্যায়! আমি ভাবতাম যে, আমিই শুধু উর্দু, হিন্দি একটু একটু জানি। দেখি যে, না, আপনারা সবাই জানেন। সবাই সমঝদার না হলে তো আলোচনা করে মজা পাওয়া যায় না। আলোচনা করলাম কিন্তু কেউ বুঝল না, তাহলে কী হলো?

শিষ্য খুব সন্তর্পণে দরবেশের পেছন পেছন যাচ্ছে। দরবেশ পাহাড়ের

উঁচুতে উঠে আলখেল্লা খুলে ফেললেন। কৃষক যে-রকম পোশাক পরে, সে-রকম পোশাক পরলেন। আস্তে আস্তে টিলা থেকে নামলেন। নেমে ওই পাড়ে যে গ্রাম আছে, সেই গ্রামে ঢুকলেন। শিষ্যও পেছন পেছন একেবারে জেমস বন্ড বা ফেলুদা অথবা মাসুদ রানার মতো যাচ্ছে।

গিয়ে দেখে যে, গ্রামে ঢোকার পথে এক কোণায় একটা জীর্ণশীর্ণ কুটির। কোনোরকম একটু ছাউনি। সেই কুটিরে এক বৃদ্ধা। একা, বিধবা। বয়সের ভারে একেবারে ন্যুব্জ হয়ে আছে। এই যে ইয়ং ম্যানদের (কোয়ান্টাদের উদ্দেশ্যে) সিনা টান টান দেখলে আমার খুব ভালো লাগে। আমি ভাবি যে, আমারও বয়স এরকম। কিন্তু আপনাদের মা-জী আমাকে সবসময় স্মরণ করিয়ে দেন—খবরদার! তুমি ভাববে না যে, তোমার বয়স ১৮ বছর।

বৃদ্ধা চলৎশক্তিহীন। চলাফেরা করার ক্ষমতা নেই। জাতে মেথর, মানে অচ্ছুৎ। কেউ তাকে দেখতে আসে না। দরবেশ ওখানে গেলেন। তার বিছানা পরিষ্কার করে দিলেন। তার ময়লা কাপড়চোপড় ধুয়ে দিলেন। সাথে করে খাবার নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই খাবার রান্না করলেন। গরম গরম খাবার তার মুখে তুলে দিলেন। বৃদ্ধা প্রাণভরে তাকে দোয়া করলেন।

দরবেশ সব শেষ করে রাত থাকতে থাকতেই আবার ফিরলেন। শিষ্যও ফিরেছে পেছন পেছন। তার সন্দেহ—শুধু এটুকুর জন্যে উনি আসেন এখানে, না আরো কিছু আছে? দেখলেন যে, না, শুধু এটুকু করার জন্যে প্রত্যেক শুক্রবার রাতের অন্ধকারে তিনি যান এবং ফিরে আসেন।

স্পাই অর্থাৎ শিষ্য ফিরে আসার পরে অন্যরা উৎসুক হয়ে বলল, কী দেখে এলে? আমাদের ওস্তাদ কি আকাশে উঠে গিয়েছিলেন? শিষ্য এতদিনে বুঝতে পারল যে, আসল ইবাদত কী! শিষ্য বলল যে, না। তিনি যে-কাজ করেন, এই কাজ তাকে আকাশের চেয়েও উঁচুতে নিয়ে যায়। ইবাদতের মধ্যে সেরা ইবাদত হচ্ছে সেবা। তিনি মানুষের সেবা করতে যান।

আমরা যত মহামানবের জীবন পাই, যত ভালো মানুষের জীবন পাই, তারা সবসময় অকাতরে মানুষের সেবা করে গেছেন। সেবা করে গেছেন বলেই তারা স্মরণীয় হয়ে আছেন। আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি যে, আমরাও সেবা করার সুযোগ পেয়েছি। আমরা সেবা করি জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে। আসলে সেবাগ্রহীতার কোনো জাত নেই, পাত নেই, কোনো ধর্ম নেই, কোনো বর্ণ নেই। সেবাগ্রহীতার একটাই পরিচয় যে, সে মানুষ। শুধু মানুষ নয়, সকল জীবের সেবা করা আমাদের কর্তব্য।

সেবা সবসময়ই করবেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে। যে-রকম কোয়ান্টাম। আমরা এখানে এই সেবার জন্যেই এসেছি। আমাদের নিয়ে কথাবার্তার কিন্তু কোনো অভাব নেই। কত রকম কথা! প্রথম যখন আসি ঢাকা থেকে—গুরুজী এই পাহাড়ে-জঙ্গলে যাচ্ছেন? কত রকম কৌতূহল!

১৯৯৮ সালে আমরা এসেছি। আজ ২০২০। একটানা সেবা করতে করতে আমরা আজ এই জায়গায় এসেছি। সামনে এত নাতি-নাতনি দেখছি, এত সহকর্মী, এত মানুষ দেখছি, সবাই আমার সহযোদ্ধা।

সেবা সবসময় স্বতঃস্ফূর্তভাবে করতে হয়, কোনো বিরক্তি না নিয়ে। যখন যে-কাজ করবেন, আনন্দ নিয়ে করবেন। আনন্দ নিয়ে করলে বরকত পাবেন। যে-রকম বরকত আমি আমার জীবনে দেখেছি। আমি বলতে পারি যে, আমার কোনোকিছুর কোনো অভাব হয় নি। শুধু ইচ্ছা করেছি, আল্লাহ সহজ করে দিয়েছেন। কারণ আমরা সবসময়ই চেয়েছি মানুষের কল্যাণ।

করোনাকালে যখন সবকিছু বন্ধ হয়ে গেছে, আমরা কিন্তু আমাদের কাজ বন্ধ করতে চাই নি। পরিস্থিতি আমাদেরকে বাধ্য করেছে। এই যে আমার নাতি-নাতনিরা এখানে ছিল না, আমি খুব কষ্টে ছিলাম। আমি সংযোগায়নের কর্মীদের বলেছি, তোমরা খোঁজখবর নাও। ওরা কী খাচ্ছে, কী পরছে, ওদের যত্ন ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা খোঁজ নাও। তারা চেষ্টা করেছে খোঁজ নিতে। যখনই সরকার আমাদের অনুমতি দিয়েছে, সেদিন প্রথম সুযোগেই আমরা সবাইকে খবর দিয়েছি—আমার নাতি-নাতনিরা, দাদুরা, তোমরা সবাই চলে আসো। তোমরা আমাকে ছেড়ে থাকবে না, আমার কাছে থাকবে।

সবসময় কাজ করবেন আনন্দ নিয়ে। সেবা করবেন, দান করবেন আনন্দ নিয়ে। অনেক সময় আমরা ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেই বিরক্তি নিয়ে। অ্যাই, যা, যা! এভাবে কখনো না! বিরক্তি সহকারে কখনো দেবেন না। যদি আনন্দিত চিত্তে না দিতে পারেন, দেবেন না। কিন্তু যখন দেবেন, আনন্দ নিয়ে দেবেন। তাহলে আল্লাহ দয়া করবেন, রহম করবেন। আর আপনি দাতা হবেন।

আমাদের কী করতে হবে? দিন শুরু করতে হবে দান করে। নবীজী (স) বলেছেন, 'সকালে দুজন ফেরেশতা মনিটরিং করে যে, কে কী করছে! যিনি দান করেন, একজন ফেরেশতা তার জন্যে দোয়া করে—হে আল্লাহ! দাতাকে সর্বোত্তম পুরস্কার দান করো। আর প্রতিদিন সকালে যে দান করে না, অপর ফেরেশতা দোয়া করে—হে আল্লাহ! কৃপণের ধন বিনষ্ট করো।' *[আবু হুরায়রা (রা); বোখারী, মুসলিম]*

প্রত্যেকটা ভালো কাজ হচ্ছে দান। একটা হাসি দিলেন ভাইকে দেখে, বোনকে দেখে, মাকে দেখে; 'আসসালামু আলাইকুম' বা 'আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক' বললেন—এটা দান। বাসায় ছোট্ট একটা কাজ করে দিলেন। যেমন : মাকে প্রয়োজনীয় কোনোকিছু এগিয়ে দিলেন—এটা দান। অন্যের যে-কোনো প্রয়োজনীয় বা কল্যাণকর কাজে সহযোগিতা করা হচ্ছে দান। অতএব আমরা দিন শুরু করব দান করে। পরিবারে ও কর্মক্ষেত্রে পরস্পরকে ছোট ছোট সহযোগিতা করে।

দান করবেন আনুপাতিক হারে। অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমিয়ে দান করবেন। আমাকে অনেকে বলে, আপনি এত টাকা দিয়ে কী করেন? আমি বলি, টাকা বেশি হলে মানুষ কী করে? অনেকে টাকা বিদেশে পাচার করে। আমিও পাচার করি। তারা বলে, আপনি কোথায় পাচার করেন? আমি বলি, আমি পরকালে পাচার করি। কারণ যা আপনি ব্যয় করছেন, এটা ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। আর যা আপনি দান করছেন, সেটা হচ্ছে আপনার সঞ্চয়।

কী করবেন? অপচয় কমিয়ে, ফালতু খরচ কমিয়ে, অর্থাৎ যে খরচটা না করলে হয়—এটা দান করেন। আসলে এটা আপনি দান করলেন না, এটা পরকালে পাঠালেন। আরো সহজ করে বলা যায়, এটা পাচার হয়ে গেল পরকালে। কারণ দান ছাড়া ওখানে পাঠানোর আর কোনো উপায় নেই।

সন্তানকে দান করতে উৎসাহিত করবেন। সে ছোট হোক, তাকে একটা মাটির ব্যাংক উপহার দেবেন। প্রতিদিন সকালবেলা বলবেন, এই এক টাকা, দুই টাকা, পাঁচ টাকা তুমি মাটির ব্যাংকে রাখো। ছোটবেলা থেকে তাকে দান করতে শেখাবেন। আর সামর্থ্য থাকলে দায়িত্ব নেবেন একজন দুস্থ মানুষের, একজন এতিম বা অনাথের।

দান করবেন সঙ্ঘবদ্ধভাবে। একা নয়। একা দান করা হচ্ছে মরুভূমিতে এক বালতি পানি ফেলার মতো। একটু পরে যা শুকিয়ে যাবে। আর সঙ্ঘবদ্ধ দান হচ্ছে ঝর্নার মতো, যা প্রবাহিত হয়ে নদী থেকে সমুদ্রে পৌঁছে যাবে। কারণ সঙ্ঘবদ্ধ দানে বড় কাজ হয় এবং কাজ অব্যাহত থাকে। সঙ্ঘবদ্ধ দান হচ্ছে সদকায়ে জারিয়া। অর্থাৎ যা দান করলেন, এরপর ২০ বা ৩০ বছর, ৫০ বছর, একশ বছর ... এই প্রতিষ্ঠান যতদিন থাকবে, যত মানুষ দান করবে, সমস্ত দানের সওয়াব, লভ্যাংশ আপনিও পেতে থাকবেন, যা আপনার পরকালের হিসাবে বাড়তেই থাকবে।

বলবেন—আমার তো দান করার সে-রকম সুযোগ নেই। দানে উদ্বুদ্ধ করবেন আরেকজনকে যে, তুমি দান করো। ধরুন, আপনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে একজন পাঁচ টাকা দিলো, পাঁচ শত টাকা দিলো, পাঁচ হাজার টাকা দিলো। এই দানের সওয়াব তো সে পাবেই। কিন্তু আপনি যে তাকে দানে উদ্বুদ্ধ করলেন, এই পুরো দানের সওয়াব আপনিও পাবেন। অতএব দানে উদ্বুদ্ধ করবেন। আর ডিসেম্বর মাস তো আমাদের করসেবা। করসেবার এ মাসে যেখানে যত মাটির ব্যাংক আছে, দাতা আছেন, তাদের কাছ থেকে দান সংগ্রহ করে জমা দেবেন। পরিচিত প্রত্যেকের মাটির ব্যাংক তুলে এনে জমা দেবেন। এর মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের সেবামূলক কাজকে আরো গতিশীল করতে পারব।

করোনাকালে আমরা কিন্তু আমাদের কাজ বন্ধ রাখি নি। মানুষের এই দুর্যোগ মুহূর্তে, যখন সবাই আতঙ্কিত ছিল, আমরা সাহস নিয়ে দাঁড়িয়েছি। বলেছি—আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। সতর্কতা প্রয়োজন এবং এখনো আমরা সেটাই বলছি। আপনারা করোনা এবং চর্মরোগ থেকে বাঁচার জন্যে প্রতিদিন পাঁচটা করে নিমপাতা খাবেন। সকালবেলা পাঁচটা নিমপাতা পানি দিয়ে ধুয়ে চিবিয়ে খাবেন। করোনা আপনাকে দেখলে স্যালুট করবে। বলবে—ওরে বাপরে বাপ! ধরুন, কেউ প্রতিপক্ষকে যদি শক্ত দেখে তখন কী করে? সে স্যালুট করে—ওরে বাবা! না না! আমি ভুল করে চলে এসেছি, স্যার।

লামার কোয়ান্টামমে যারা নিমপাতা খেয়েছেন, তাদের অন্য রোগ হতে পারে কিন্তু গত ২২ বছরে ম্যালেরিয়া হয় নি। যারা নিমপাতা খেয়েছেন, তাদের করোনাও হয় নি। আপনারাও নিমপাতা কালোজিরা রসুন খেয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ! করোনা আপনাদের দেখলেই বলে, রসুন পার্টি আসছে। যাওয়া যাবে না। পিটিয়ে একেবারে তক্তা বানিয়ে ফেলবে!

এখন সবাই নিমপাতা পার্টি হয়ে যাবেন। মশাবাহিত যত রোগ আছে, ডেঙ্গু থেকে শুরু করে ম্যালেরিয়া, চিকনগুনিয়া—ধরাশায়ী হয়ে যাবে নিমপাতার দাপটে। আপনি সুস্থ থাকবেন।

অতএব নিমপাতা খাবেন এবং সবসময় দোয়া করবেন, নিজের জন্যে ও অন্যের জন্যে। অন্যের মঙ্গল কামনা করা, দোয়া করা, অন্যের জন্যে প্রার্থনা করাও কিন্তু সেবা। একজনের অসুখ শুনলেন, আপনি দেখা করতে যেতে পারছেন না সঙ্গত কারণে। তার সেবা করবেন কী করে? দোয়া করে। যে, প্রভু! আমার মা-বাবাকে ভালো করে দাও, সুস্থ রাখো, আমার খালাকে ভালো

করে দাও, আমার বন্ধুকে ভালো করে দাও ... এটাও সেবা।

যারা দান করেন, দান সংগ্রহ করেন এবং বিতরণ করেন, তারা সমান পুণ্যের অধিকারী। কারণ দান সংগৃহীত হলো কিন্তু বিতরণ হলো না, সে দান অর্থহীন হয়ে গেল। দাতা, দান সংগ্রহকারী এবং দান বিতরণকারী—সমান পুণ্যের, সমান মর্যাদার অধিকারী। ফাউন্ডেশনের সবকিছুই হচ্ছে মানুষের স্বেচ্ছাদানের টাকায়। দানের অর্থ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত যারা, এই দানের টাকা যখন তারা মিতব্যয় করছেন, যখন এখান থেকে একটা টাকাও তারা বাঁচালেন, তারা দাতার মতো সমান কল্যাণ, সমান পুণ্যের অধিকারী হলেন। আর সবসময় মনে রাখবেন, যার-ই সেবা করার সুযোগ পাবেন, সে পথচারী হোক, বন্ধু হোক, আপনজন হোক, পর হোক ... তার সেবা করবেন।

সবাইকে বর্ষায়নের আগাম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এবার কোয়ান্টামমে বর্ষায়ন ইনশাআল্লাহ খুব সুন্দরভাবে উদযাপন করা হবে। বর্ষায়নে মেলা হবে, যা এর আগে কখনো হয় নি। আরোগ্যশালার দোয়ার পর্বে সবাই থাকবেন। সারাদিনব্যাপী যে মেলা হবে, মেলাতে সবাই অংশগ্রহণ করবেন।

নতুন বছর। কোয়ান্টাম বর্ষ ২৯। আমরা ২০২০ সালকে বলেছিলাম—বিশে বিশ। আর ২০২১ সালকে আমরা বলছি—বিশে একুশ। এক পয়েন্ট অতিরিক্ত আমরা অর্জন করতে চাই। বিশে যা আমরা অর্জন করতে পারি নি, একুশে সেগুলো অর্জন করতে চাই। ২০২১-এ আমাদের শুভেচ্ছা বাণী হচ্ছে : শুদ্ধাচার! শুদ্ধাচার! কোয়ান্টাম! কোয়ান্টাম! পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে সবাই ভালো থাকুন।

খোদা হাফেজ।

আসসালামু আলাইকুম।

সাদাকায়ন : ২৫ ডিসেম্বর ২০২০; কোয়ান্টামম

পরিশিষ্ট

১. আলোচনার শুরুতে সালাম ও কুশল বিনিময় এবং শেষে বিদায় সম্ভাষণ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, কোথাও কোথাও উল্লেখ করা হয় নি।

২. পাঠের সুবিধার্থে কিছু আলোচনার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। কিছু আলোচনার শিরোনামে পরিবর্তন আনা হয়েছে।

৩. সাদাকায়নের তারিখ ও ভেন্যু বক্তব্য শেষে উল্লেখ আছে। করোনাকালে লকডাউনে অডিও আকারে প্রকাশিত সাদাকায়ন 'ঘরে ঘরে সাদাকায়ন' নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. *কাজ প্রেম দেশ* বইটিতে প্রকাশিত কিছু পরিভাষা—

কোয়ান্টামম : কোয়ান্টাম চেতনার লালনভূমি। কোয়ান্টাম ও মমতা—এই দুই শব্দের মিশেলে কোয়ান্টামম—বান্দরবান লামার সরই ইউনিয়নে অবস্থিত এক আলোকিত জনপদ।

কোয়ান্টা : কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের বলা হয় কোয়ান্টা।

মারহামান : কোয়ান্টামমের সুবিশাল প্রোগ্রাম হলটির নামকরণ করা হয়েছে মারহামান।

সাদাকায়ন : ভালো কাজে অর্থ মেধা শ্রম দেয়া হচ্ছে দান বা সাদাকা। আর এই সাদাকা থেকে সাদাকায়ন। প্রতি শুক্রবার সকাল ৯টা-১০টা আত্ম উন্নয়নমূলক উন্মুক্ত প্রোগ্রামটি দেশের দুই শতাধিক স্থানে একযোগে অনুষ্ঠিত হয়।

করসেবা : সৃষ্টির সেবামূলক কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে কায়িক শ্রম করা হয়, সেটাই করসেবা।

কোয়ান্টিয়ার : কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছাসেবকদের বলা হয় কোয়ান্টিয়ার, যা গঠিত হয়েছে কোয়ান্টাম ও ভলান্টিয়ার—এই দুই শব্দের মিশেলে।

আর্ডেন্টিয়ার : কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছাসেবী দায়িত্বশীলদের বলা হয় আর্ডেন্টিয়ার।

অটোসাজেশন : ছোট ছোট ইতিবাচক শব্দ বা কথার সম্মিলনে গঠিত বাক্য বা বাক্যমালা, যা বার বার উচ্চারণের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয় বিশ্বাস ও শক্তির এক অন্তঃ অনুরণন। অটোসাজেশন নিজেকে ভেতর থেকে বদলে দেয়, তৈরি করে সম্ভাবনাময় নতুন বাস্তবতা।

খতমে কামালি : দোয়ার বিশেষ প্রোগ্রাম।

কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআন : রমজান মাসের বিশেষ প্রোগ্রাম। প্রোগ্রামটিতে রমজানের সাত দিন মৌন থেকে আরবি ও বাংলা কোরআন শোনা ও অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়।

এতিমান কার্যক্রম : কোয়ান্টামম, লামার কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজে আড়াই হাজার শিশু লালিত-পালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের সদস্য বা শুভানুধ্যায়ীরা সামর্থ্য অনুযায়ী একটি শিশুর পেছনে ব্যয়ের পূর্ণ বা আংশিক দায়িত্ব নিতে পারেন।

মাতৃমঙ্গল কার্যক্রম : অসহায় প্রসূতি মায়েদের নিয়ে ফাউন্ডেশনের একটি কার্যক্রম। এর আওতায় প্রসূতি মায়েদের পুষ্টিচাহিদা মেটানো, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সেবাদান করা হয়।

প্রবীণসেবা : অসহায় প্রবীণদের লালনপালন ও তাদের আশ্রয় দেয়ার লক্ষ্যে পরিচালিত কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের একটি সেবা কার্যক্রম।

প্রিয় পাঠক,

এ বইয়ের কোনো বিষয় সম্পর্কে আপনার কোনো প্রশ্ন বা মতামত থাকলে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাতে পারেন :

মহাজাতক
যোগ ফাউন্ডেশন
৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক,
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
E-mail : info@quantummethod.org.bd

মহাজাতক

শহীদ আল বোখারী মহাজাতক বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক মেডিটেশন ও পজিটিভ লাইফস্টাইল চর্চার পথিকৃৎ। জীবনযাপনের বিজ্ঞান কোয়ান্টাম মেথডের উদ্ভাবক ও প্রশিক্ষক। পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে ৩৩ বছর ধরে একনাগাড়ে দেশজুড়ে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন।

মেডিটেশন চর্চার ইতিহাসে উদ্ভাবক কর্তৃক এককভাবে ক্লাস নিয়ে ৪৯৯+ কোর্স সম্পন্ন করা বিশ্বে এই প্রথম।

তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলা ভাষায় সর্বাধিক পঠিত নন-ফিকশন গ্রন্থ *কোয়ান্টাম মেথড*সহ তার রচিত সবগুলো বই ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। ২০১৪ সালে *আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী* এবং ২০২১ সালে *হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী* প্রকাশিত হওয়ার পর পেয়েছে বিপুল পাঠকপ্রিয়তা।

কোয়ান্টাম ভালো ভাবার, ভালো বলার,
ভালো করার, ভালো থাকার বিজ্ঞান।
আপাত অসম্ভবকে সম্ভব করার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া।

কী চান আপনি?
আত্মবিশ্বাস? অস্থিরতা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও
বিষণ্নতা থেকে মুক্তি? প্রশান্তি? সুস্বাস্থ্য? বর্ণিল জীবন?
উপচে-পড়া প্রাচুর্য? ঈর্ষণীয় অর্জন? সুখ?

চাওয়া যা-ই হোক, আসুন, মেডিটেশন চর্চা করুন।
মাইন্ড সেট করুন। আপনার মধ্যে বিশ্বাস ও
ইতিবাচক শক্তির স্ফুরণ ঘটবে।

আপনি অর্জন করবেন
নিজের কাজ সবচেয়ে ভালোভাবে করার সামর্থ্য।
চারপাশের মানুষ ভাবতে শুরু করবে—
আপনি সৌভাগ্যের বরপুত্র। আপনার আন্তরিক চাওয়া
স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিণত হবে পাওয়ায়।

লাখো মানুষের মতো আপনিও বলবেন—
ইনশাআল্লাহ সব সম্ভব!
আপনার কণ্ঠেও ধ্বনিত হবে—
ভালো মানুষ ভালো দেশ! স্বর্গভূমি বাংলাদেশ!

quantummethod.org.bd

978-984-36-0812-3

978-984-36-0812-3